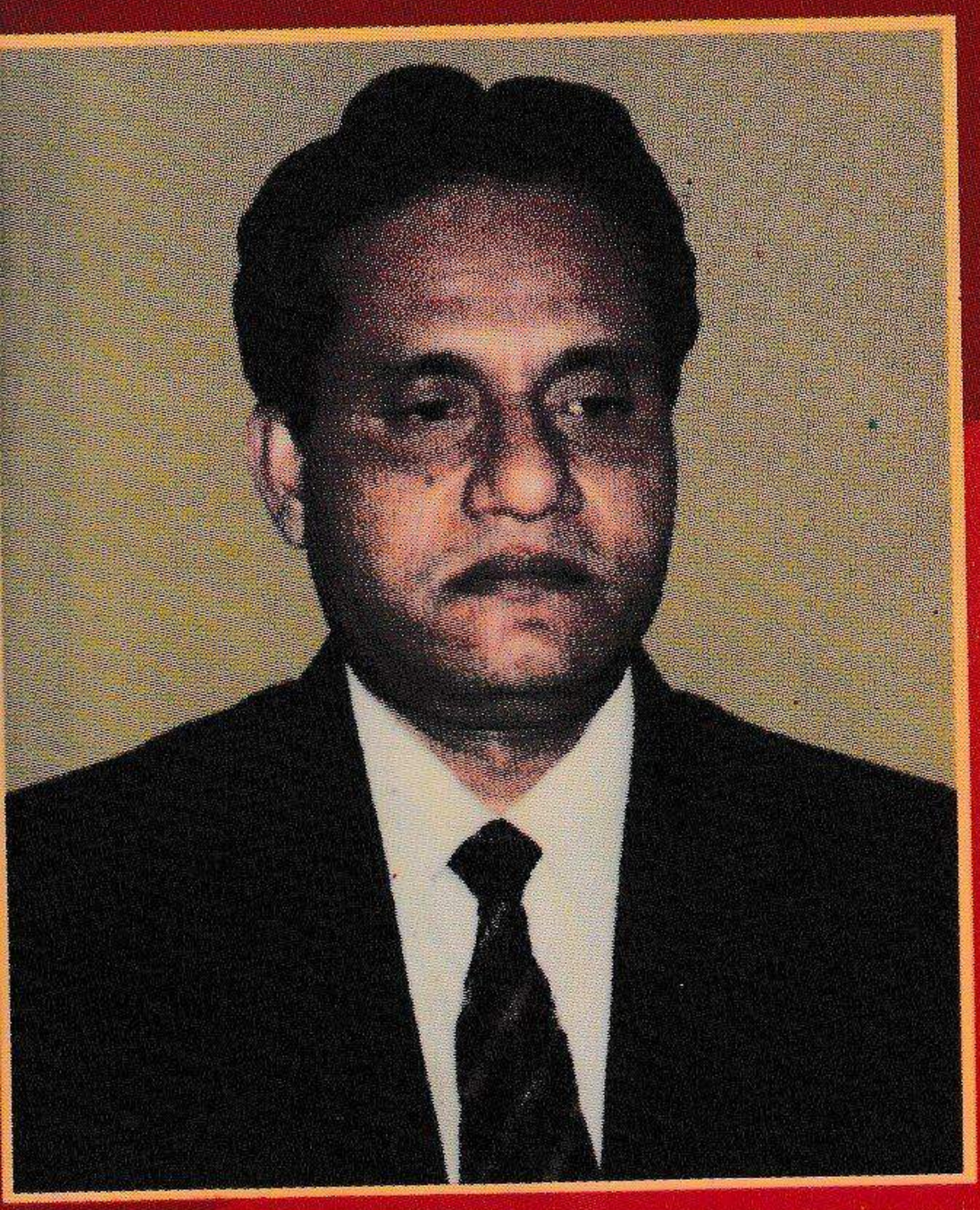
ইসলাম সাম্যবাদ ও বাঙালিত্বের আলোকে

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন

আবীর আহাদ





একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের একজন দুঃসাহসী বীর মুক্তিযোদ্ধা আবীর আহাদ। দেশমাতৃকার স্বাধীনতা অর্জনের সেই বৈপ্লবিক চেতনা নিয়ে তিনি দেশের রাজনীতি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও চিন্তাধারা, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস-ঐতিহ্য, অঙ্গীকার-স্বপ্ন-চেতনা ও মূল্যবোধকে ব্যাপক মানুষের সার্বিক মুক্তি ও কল্যাণে নিয়োজিত করতে দীর্ঘকাল যাবত নিরন্তর সংগ্রামে লিপ্ত। এ ব্যতীত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের মূলধারায় একত্রিত করে রাষ্ট্র পরিচালনায় তাদের অংশগ্রহণসহ মুক্তিযুদ্ধোত্তর প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গড়ে তোলার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। পাশাপাশি স্বাধীনতাবিরোধী ধর্মান্ধ অপশক্তিকে উৎখাতের আন্দোলন এবং সমাজ-রাষ্ট্র ও ধর্ম বিষয়ে নিজস্ব প্রগতিশীল চিন্তাধারা দিয়ে ব্যাপক মানুষের মন-মননে নবতর চেতনা জাগ্রত করে চলেছেন। তিনি বলেন ও লেখেন নির্ভীক ও খোলামনে বৈপ্লবিক বাক্যশৈলী দিয়ে। ফলে তিনি দেশ সমাজ ও প্রগতিবিরোধী অপশক্তির চক্ষুশূলে নিপতিত হয়েছেন।

বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের একজন বিশ্বস্ত ও শক্তিশালী রাজনৈতিক লেখক-গবেষক হিসেবে ব্যাপক পরিচিত আবীর আহাদ ১৯৫৩ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলার প্রখ্যাত পারুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আবীর আহাদ অতি বাল্যকাল থেকেই ছিলেন ডানপিটে ও দুঃসাহসী। মুক্তিযুদ্ধের

ইসলাম সাম্যবাদ ও বাঙালিত্বের আলোকে
বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন

ইসলাম সাম্যবাদ ও বাঙালিত্বের আলোকে

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন

আবীর আহাদ

জনতা প্রকাশ

প্রকাশক
রফিকুজ্জামান হুমায়ুন
জনতা প্রকাশ
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৮০৭৭৯, ০১৭১৮০১১২৮৭, ০১৫৫২৪০৯১৯১
E-mail : janataprakash@gmail.com
www.rokomari.com/janataprokash

© লেখক

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ২০০৯
দ্বিতীয় মুদ্রণ
আগস্ট ২০১৬

প্রচ্ছদ
মঈনুল আলম মুক্তো
(শিল্পী হাশেম খানের আঁকা স্কেচ অবলম্বনে)

পরিবেশক
মুক্তপ্রকাশ
৩৮ বাংলাবাজার (দ্বিতীয় তলা)
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ
সংগীতা লিমিটেড
২২ ব্রিক লেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য

মুদ্রণ
ঢাকা প্রিন্টার্স
৩৬ শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৩০০ টাকা

ISBN : 984-70264-0033-6

Islam Samyabad O Bangalitter Aloke Bangabandhur Rajnaitik Darshan : *by Abir Ahad. Published by Rafiquzzaman Humayun, Janata Prokash, 38/2Ka Banglabazar, Dhaka, Bangladesh. Price : Taka Three hundred only.*

মুক্তিযুদ্ধোত্তর প্রজন্ম ও
মুক্তচিন্তার মানুষদের
উদ্দেশে

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

১. বঙ্গবন্ধু : পাকিস্তান ও বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ
২. বঙ্গবন্ধু : দ্বিতীয় বিপ্লবের রাজনৈতিক দর্শন
৩. বঙ্গবন্ধুবিরোধী মিথ্যাচার : বাংলাদেশের রাজনীতি
৪. বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে
৫. বঙ্গবন্ধু : কারাজীবন সংগ্রাম স্বাধীনতা
৬. বঙ্গবন্ধু জয়বাংলা বাঙালি
৭. বিভীষিকাময় রক্তাক্ত রাতগুলো
৮. বাংলাদেশ : জেনারেল জিয়ার রাজনীতি
৯. প্রাত্যহিক মুখ (কাব্যগ্রন্থ)
১০. আমি মুক্তিযোদ্ধা বলছি

পূর্বকথা

মহানবীর ইসলামী দর্শন ও মনীষী কার্ল মার্কসের সাম্যবাদী মতবাদের শিক্ষা আমরা পেয়েছি ইতিহাস থেকে। অপরদিকে বঙ্গবন্ধুর চিন্তাধারা প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে, কারণ তিনি আমাদেরই যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন; আমাদের জন্যেই তিনি তাঁর আদর্শ রচনা করেছিলেন আমাদেরই সামনে। ব্যক্তিগতভাবে আমি বঙ্গবন্ধুর গভীর সান্নিধ্যে যেতে পেরেছিলাম। তাঁর মন-মনন, চিন্তা-চেতনা, আদর্শ-উদ্দেশ্য সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা আমার মনে জন্ম নিয়েছিল। সেগুলোকে নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে আমি একটা সমাধানে উপনীত হয়েছি যে, বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শন গড়ে উঠেছে বাঙালিত্বের শাশ্বত মূল্যবোধকে ভিত্তি করে এবং দার্শনিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা গড়ে উঠেছে মহানবীর ইসলামী দর্শন ও মার্কসের সাম্যবাদী মতবাদের আলোকছটায়। আলোচ্য গ্রন্থখানি রচিত হয়েছে সেই প্রেক্ষাপটে। সেই সাথে বঙ্গবন্ধুর শাসন, দেশী-বিদেশী স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধুবিরোধী সামরিক-বেসামরিক আমলা, কতিপয় রাজনীতিকদের ক্রিয়াকলাপসহ কীভাবে তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল, সেসব বিষয়ের ওপরও কতিপয় অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর সাথে আমার সর্বপ্রথম পরিচয় ঘটে ১৯৬২ সালের জুলাই মাসে। আমি তখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি। সেই সময় তিনি আমার গ্রাম গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলার পারুলিয়া গ্রামে একটি জনসভায় যোগদান করতে গিয়েছিলেন। আমার আব্বার সাথে বঙ্গবন্ধুর মধুর সম্পর্ক ছিল। জনসভা শেষে রাতে খানা খাওয়ার সময় আব্বা আমাকে বিপ্লবী মুজিব ভাইয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। আজো মনে আছে, মুজিবভাই আমাকে ভীষণ আদর করেছিলেন। চিরসজীবপ্রাণ, খুশিতে হাসিতে উচ্ছল, চিরনবীন, চিরকচি, কৌতুকপ্রিয় বঙ্গবন্ধুর সেই সময়ের স্মৃতি চিরকাল আমার মনে থাকবে। সেই থেকে ১৯৭৫ সাল। বিশেষ করে ১৯৭০ সাল থেকেই তাঁর সান্নিধ্যে আসি। ১৯৭৪ সালে তা আরো গভীরতর হয়। এই স্বল্পপরিসর সময়ের ভেতর তাঁকে পুরোপুরি চিনে উঠতে না পারলেও তাঁর নিকট থেকে যা জেনেছি শুনেছি শিখেছি এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ও বিজ্ঞজনদের নিকট

থেকে যা জেনেছি– তাই আমার সম্বল। এসব থেকেই এ গ্রন্থখানি রচনা করতে চেষ্টা করেছি।

আমার এ পরিকল্পনা বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের বহু পূর্ব থেকে। এ পরিকল্পনার কথা আমি ১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধুকে অবহিত করি। তারপর থেকে যখনি সময় পেয়েছি, ছুটে গিয়েছি তাঁর কাছে। আমি অতি নগণ্য হলেও তিনি আমাকে অবহেলা করেননি। হাজারো কাজে ব্যস্ত থেকেও তিনি আমাকে সময় দিয়েছেন, আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এবং তাঁর চিন্তাধারা ও কর্মসূচি ব্যাখ্যা করেছেন। আমি সেসব লিখে রেখেছিলাম। মানবসভ্যতার ইতিহাস, বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থা, ধর্ম, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদ এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলীর যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন– তাতে বার বার তাঁর মনীষা প্রজ্ঞা জ্ঞান শিক্ষা ও দূরদর্শিতার পরিচয় পেয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছি। আমার বারবার মনে হতো, আমি যেনো কোনো এক মহাপ্রতিভাধর মহাজ্ঞানী মহামানবের সাগরের উপলখণ্ডে দাঁড়িয়ে তাঁর সীমাহীন ঢেউ গণে চলেছি! যে প্রসঙ্গের অবতারণা করতেন, তার আদি-অন্ত অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ দিয়ে সহজ-সরল-প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দিতেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও তাঁর বক্তব্যের ভেতর নতুন নতুন শব্দাবলী সংযোজন করতেন। কথায় কথায় কবিগুরু থেকে উদ্ধৃতি দিতেন। তখন মনে হতো, আমি একজন মহাকাব্যিক ব্যক্তিত্বের সামনে বসে বসে তাঁর সীমাহীন কাব্যসম্ভারের মধ্যে অবগাহন করছি।

এ ব্যতীত বিভিন্ন ধর্ম, পবিত্র কোরআন, বাইবেল, মহাভারত, বৌদ্ধবাদ, মার্কসবাদ, পৃথিবীর আদি ইতিহাস, দর্শনশাস্ত্র, বাংলার আদি ইতিহাস ও অন্যান্য বিষয়ে তাঁর মনীষার যে পরিচয় পেয়েছি– সেসব বিষয়ে আজ যখন নীরবে-নিভৃতে চিন্তাভাবনা করি তখন মনে হয় কী এবং কাকে আমরা হারালাম! বঙ্গবন্ধুর মতো সর্ববিধ পণ্ডিত ব্যক্তির পরিচয় আজ পর্যন্ত অন্তত আমি খুঁজে পাইনি আমার জানা জগতের মধ্যে। এত বড় উদার হৃদয়ের লোক যে এই হতভাগ্য বাংলাদেশে জন্মেছিলেন তা ভাবলে অবাক হতে হয়। মহাসমুদ্রের মতো খোলা ছিল তাঁর মনপ্রাণ। ক্ষমাশীলতা ও যাবতীয় মানবিক গুণে গুণান্বিত একটি মহান পুরুষ আমাদের দেশেই জন্মে ছিলেন– যিনি হাজারো দুঃখ-বেদনা, হতাশা-নিরাশা, শোক-সন্তাপের মধ্যে থেকেও প্রাণ খুলে হাসতে পারতেন। প্রায়শই বলতেন, 'বাঙালি নাকি হাসতে জানে না, জানে নাকি শুধু কাঁদতে? এই দ্যাখো, আমি হাসতে জানি, জাহান্নামের আগুনের মধ্যেও আমি হাসতে পারবো, ফাঁসিতে ঝুলানোর সময়, অথবা

যেকোনভাবে হত্যা করা হলেও আমি হাসতে পারবো। হাসির নামই তো জীবন। আমি বাঙালির মুখে হাসি ফুটাতে চাই, এ জন্যেই আমি হাসিকে রপ্ত করেছি। সুতরাং পৃথিবীতে এমন বাঙালির জন্ম হয়নি, ভবিষ্যতে তাঁর মতো বাঙালি ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটবে কিনা সন্দেহ।

একজন বিখ্যাত বিদেশী সাংবাদিক তাই বঙ্গবন্ধুকে দেখে, তাঁর সাথে আলাপ করে মন্তব্য করেছিলেন যে, 'শেখ মুজিব চলনে-বলনে, আচার-ব্যবহারে, গায়ে-গতরে, পোশাক-পরিচ্ছদে পা থেকে মাথা পর্যন্ত একজন খাঁটি বাঙালি।' এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী শিক্ষাবিদ ডক্টর আব্দুল মতিন চৌধুরীর উদ্ধৃতিটি আরো অর্থবহ। তিনি বলেছেন, 'শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্বের সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি।'

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হন। এরই মাত্র সাতদিন পূর্বে তাঁর সাথে আমার সর্বশেষ সাক্ষাৎ ঘটে। সেই সাক্ষাতের সময় তিনি আমার কতিপয় প্রশ্নের উত্তর দেন। কথা ছিল আমরা ২০ আগস্ট আবার বসবো। কিন্তু সবই ভাগ্যের নির্মম পরিহাস। তাঁর পূর্বেই তাঁকে মর্মান্তিকভাবে বিদায় নিতে হলো! যে কুটিলদানবীয় রাহুচক্র বঙ্গবন্ধুর রক্ত নিয়ে নিষ্ঠুর পৈশাচিক হোলিখেলায় মেতে উঠলো– তারা একে একে বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের ওপর খড়গকৃপাণ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো। উল্লাসে মেতে উঠলো স্বাধীনতাবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিবিপ্লবী শক্তি এবং তাদের বশংবদ আল-বদর রাজাকার দালালগোষ্ঠী। কতিপয় পাকিস্তানি দালালদের ঘৃণ্য চক্রান্তের শিকার হয়ে আমাকেও গা-ঢাকা দিতে হয়। প্রায় ৯/১০ মাস পর আবার ঢাকায় ফিরে আসি। সেই পরিকল্পনা নিয়ে আবার চিন্তাভাবনা শুরু করি।

বঙ্গবন্ধুর চিন্তাধারা সম্পর্কে তাঁর কতিপয় ঘনিষ্ঠ সহচর অনুসারী নেতা ও কর্মীদের সাথে মিশেছি, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস আলাপ-আলোচনা করেছি, তথ্য সংগ্রহ করেছি। সেসবের সাথে বঙ্গবন্ধুর দেয় তত্ত্ব ও তথ্য মিলিয়েছি। এতো কিছুর পরও বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চিন্তাধারা, গৃহীত কর্মসূচি ও মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাস সম্পর্কে যাঁর সান্নিধ্যে ও সাহচর্যে যেয়ে এ গ্রন্থখানি দাঁড় করতে সক্ষম হয়েছি– তিনি হলেন বঙ্গবন্ধুর ভগ্নিপতি, বেয়াই (১৫ আগস্টের শহীদ বেগম রোজী জামালের পিতা) ও বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব এবং বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্য, আমার চাচাত ভাই মরহুম

এ.টি.এম. সৈয়দ হোসেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিভিন্ন বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর ব্যাখ্যার সাথে সৈয়দ হোসেনের ব্যাখ্যার অপূর্ব মিল লক্ষ্য করেছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর বোস্ প্রফেসর প্রখ্যাত বিজ্ঞানী শিক্ষাবিদ ডক্টর আব্দুল মতিন চৌধুরী এ গ্রন্থখানি রচনা করতে আমাকে বিপুলভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। এ ব্যতীত বিশিষ্ট প্রবীণ সাহিত্যিক অধ্যাপক আবুল ফজল, বিশিষ্ট সাহিত্যিক-সাংবাদিক আবুজাফর শামসুদ্দিন, খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডক্টর মোশাররফ হোসেন, অগ্রজপ্রতিম সাহিত্যিক সিদ্দিকুর রহমান, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আকরাম হোসেন, লেখক অধ্যাপক ডা. এএসএম বদরুদ্দোজা, লেখক-সাংবাদিক জয়শ্রী জামান প্রমুখ ব্যক্তিত্বের কাছে আমি বিভিন্নভাবে ঋণী। ভীষণভাবে ঋণী আমার স্ত্রী নিলুফার ইয়াসমীন পাপিয়া, ছেলে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার সানিয়াত রাসেল ও কন্যা মুনিয়া মৌসুমীর কাছে যে, লেখালেখিতে নিমগ্ন থাকায় তাদের প্রতি সঠিক দায়িত্ব পালন করতে পারি না।

গ্রন্থখানি পাঠকসমাজের কাছে সমাদৃত হলে আমার শ্রম ও সাধনা সফল হয়েছে বলে মনে প্রেরণা পাবো এবং ভবিষ্যতে আরো বেশি বেশি এসব কার্যক্রমে আত্মনিয়োগ করবো। সবাইকে ধন্যবাদ।

আগস্ট, ২০০৯

আবীর আহাদ
গ্রন্থকার

সূচিপত্র

বঙ্গবন্ধুর একটি বিশেষ সাক্ষাৎকার ১৩

ইসলাম মার্কসবাদ ও মুজিববাদ ২৩

বাঙালি সাম্যবাদী সমাজ ৮৬

সাম্যবাদের বৈশিষ্ট্য বা ভিত্তি ৮৯

শ্রেণীসংগ্রাম ১২৫

স্বাধীন বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় বঙ্গবন্ধু :
দেশী-বিদেশী স্বাধীনতাবিরোধীদের ষড়যন্ত্র ১৩৮

বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধবিরোধী সামরিক-বেসামরিক
আমলাচক্রের কার্যকলাপ ১৫৬

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের চার কুচক্রী ও অন্যান্য সহযোগী ১৬৬

বঙ্গবন্ধু হত্যা-পূর্ব দেশী-বিদেশী রাজনৈতিক ও সামরিক চক্রান্ত ১৮৪

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের রাজনৈতিক ও সামরিক চক্রান্তের সমন্বয় ১৮৯

খুনীচক্রের শলাপরামর্শ ১৯১

বিভীষিকাময় ১৫ আগস্ট : বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড ১৯৫

বঙ্গবন্ধুর একটি বিশেষ সাক্ষাৎকার

[১৯৭৫ সালের জানুয়ারি থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে আমি বঙ্গবন্ধুর কাছে হাজির হতাম। তিনি বলতেন আর আমি তা নোট করতাম। ১৯৭৫ সালের ৭ আগস্ট বিকেল ৪ টায় গণভবনে বঙ্গবন্ধুর সাথে আমার সর্বশেষ সাক্ষাৎ ঘটে। উক্ত সাক্ষাৎকারে আমি তাঁর কাছে আরো কতিপয় প্রশ্ন করি। সেইসব প্রশ্নমালা ও বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য নিচে প্রদত্ত হলো।– লেখক।]

১. বঙ্গবন্ধু, আপনার রাজনৈতিক চিন্তাধারার মূলনীতি ও লক্ষ্য কি?

উত্তর ঃ আমার রাজনৈতিক চিন্তাচেতনা ধ্যান ও ধারণার উৎস বা মূলনীতিমালা হলো গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা। এই চার মূল নীতিমালার সমন্বিত কার্যপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি শোষণহীন সমাজ তথা আমার দেশের দীন-দুখী শোষিত বঞ্চিত শ্রমজীবী মেহনতী মানবগোষ্ঠীর মৌলিক মানবাধিকার ও তাদের সমষ্টিগত প্রকৃত 'গণতান্ত্রিক একনায়কতান্ত্রিক' শাসন প্রতিষ্ঠাকরণই আমার রাজনৈতিক চিন্তাধারার একমাত্র লক্ষ্য।

২. বঙ্গবন্ধু, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র কি একযোগে বা পাশাপাশি চলতে পারে?

উত্তর ঃ যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে– তাকে সংখ্যালঘু ধনিক শোষকদের গণতন্ত্র বলাই শ্রেয়। এর সাথে সমাজতন্ত্রের বিরোধ দেখা দেয় বৈকি। তবে 'গণতন্ত্র' চিনতে ও বুঝতে আমরা ভুল করি। কারণও অবশ্য আছে। আর তাহলো, শোষকসমাজ গণতন্ত্র পূর্ণভাবে বিকাশলাভ করুক তা চায় না। এবং গণতন্ত্রকে কীভাবে নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার হাতিয়ারে পরিণত করা যায়, এখানে চলে তারই উদ্যোগ-আয়োজন। এভাবেই প্রকৃত গণতন্ত্রকে ধামাচাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। সাধারণ অজ্ঞ জনগণই শুধু নয়, তথাকথিত শিক্ষিত সচেতন মানুষও প্রচলিত অর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় 'গণতন্ত্র' সঠিকভাবে বুঝতে অক্ষম। এরা ভাবে যে, ভোটাভুটিই হলো গণতন্ত্র। একটু তলিয়ে দেখে না, প্রাপ্তবয়স্ক মোট জনসংখ্যার কত পার্সেন্ট লোক ভোট দিল, কোন শ্রেণীর লোকেরা নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলো, কারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় গেল,

ক্ষমতাশীলরা কোন পদ্ধতিতে তাদের শাসন করছে– সাধারণ জনগণ কতটুকু কী পাচ্ছে! সুতরাং আমি আমার অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি, প্রচলিত গণতন্ত্রের বদৌলতে সমাজের মাত্র ৫% লোকের বা প্রভাবশালী ধনিকশ্রেণীর স্বৈরাচারী শাসন ও বল্গাহীন শোষণকার্য পরিচালনার পথই প্রশস্ত হচ্ছে। অর্থাৎ প্রচলিত গণতন্ত্রের মারপ্যাচে সমাজের নিম্নতম সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর শাসন ও প্রভাবপ্রতিপত্তি– সর্বপ্রকার দুর্নীতি শোষণ অবিচার অত্যাচার ও প্রতারণায় সমাজের সর্ববৃহত্তম অজ্ঞ দুর্বল মেহনতি কৃষক-শ্রমিক সাধারণ মানবগোষ্ঠীর (শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগ) মৌলিক মানবাধিকার ও তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব হচ্ছে। তারা বঞ্চিত হচ্ছে। .....'প্রকৃত গণতন্ত্র' বলতে আমি এমন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বুঝি– যে ব্যবস্থায় জনগণের বৃহত্তম সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের বৃহত্তর কল্যাণের নিমিত্তে তাদের জন্যে, তাদের দ্বারা এবং তাদের স্বশ্রেণীভুক্ত নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দিয়ে গঠিত সরকার প্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়ে তাদেরই প্রকৃত শাসন ও আর্থসামাজিক মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত হয়। কিন্তু প্রচলিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে চলে অর্থসম্পদের অবাধ ও মুক্ত প্রতিযোগিতা। এক্ষেত্রে দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে এ জাতীয় আর্থপ্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া কোনোপ্রকারেই সম্ভব নয়। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিই এদেরকে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের কার্যকরী নিশ্চয়তা দিতে পারে– তাদের আর্থসামাজিক মৌলিক মানবাধিকার ও তাদের প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এজন্যে আমি মনে করি, প্রকৃত গণতন্ত্রের আরেক নাম সমাজতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের মধ্যেই প্রকৃত গণতন্ত্র নিহিত। তবে জনগণের গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ হতেই সমাজতন্ত্রের উত্তরণ ঘটে। এজন্যেই আমি গণতান্ত্রিক উপায়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলেছি। আমি মনে করি প্রকৃত গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের ভেতর কোনো বিরোধ নেই।

৩. বঙ্গবন্ধু, আপনার চার মূলনীতিমালার উৎস কি? অনেকে বলে থাকেন, আপনার গৃহীত চারটি মূলনীতি নাকি পশ্চিমা ধনতান্ত্রিক বিশ্বের ইতিহাস সভ্যতা ও ঐতিহ্য থেকে উত্থিত। তবে এগুলো আপনার মূলনীতি হয় কী করে, একটু খুলে বলবেন কি?

উত্তর ঃ এ জাতীয় প্রশ্নই আমি আশা করেছিলাম। আমার গৃহীত চারটি মূলনীতি ইতিহাস সভ্যতা ও ঐতিহ্যের ফসল বৈকি। এগুলো আমার নিজসৃষ্ট দর্শন নয়। তবে এগুলো পশ্চিমা ধনতান্ত্রিক বিশ্ব থেকে উত্থিত তা যেমন

সত্য নয়, তেমনি ওগুলোর আবিষ্কারক বা সৃষ্টিকর্তা বলতে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিমানুষের একক কোনো কৃতিত্বও নেই। নানান ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এগুলো সমাজের বুকে উঠে এসেছে তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে। তবে ব্যক্তির দ্বারাই এসব তত্ত্ব সমাজে প্রয়োগ হয়ে থাকে সমাজের বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপটে বলে আমি মনে করি। এ প্রেক্ষিতে মরগান থেকে তোমাকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি : 'Objective conditions govern the thinking process of man.' – অর্থাৎ সমাজের বাস্তব অবস্থাই মানুষের চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে থাকে। ..... আদিকালে প্রাকৃতিক নৈসর্গিক প্রতিকূল অবস্থা ও বিরাটকায় হিংস্র জীবজন্তুর আক্রমণ থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলবদ্ধ মানবগোষ্ঠী নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার তাগিদে সংঘবদ্ধভাবে চলাফেরা, আহার-বিহার ও বসবাস করতে বাধ্য হয়। তৎকালীন প্রাকৃতিক সামাজিক পরিবেশে একার পক্ষে বিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্তিসত্তা ও ব্যক্তিস্বাধীনতা নিয়ে জীবন নির্বাহ করা একেবারেই সম্ভব ছিল না। ফলে ব্যক্তিচিন্তা ব্যক্তিস্বার্থ বা ব্যক্তিসম্পদের ভোগদখল বা ব্যক্তিলোভ-লালসার কোনো অবকাশ ছিল না। প্রাকৃতিক পরিবেশগত সামাজিক কারণেই তারা সমষ্টিগত বা যৌথভাবে তাদের প্রাত্যহিক কার্যপ্রণালী সম্পাদন করতো। এই সব প্রাকৃতিক বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে তাদের মধ্যে এ সামাজিক স্তরে তাই শ্রেণীসত্তার উদ্ভবও ঘটেনি। খাদ্য ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক জীবননির্বাহের সামগ্রীর পরিমাণ এতই নগণ্য ছিল যে, তা দিয়ে জীবন রক্ষা করা ছিল দুরূহ। ফলশ্রুতিতে বাড়তি বা উদ্বৃত্তসম্পদ বলতে কিছুই ছিল না। কারণ ব্যক্তিমালিকানাই (যে ব্যক্তিমালিকানাকে হাতিয়ার করে শোষণের পথ রচিত হয়) হলো সকল প্রকার দুর্নীতি ও শোষণের প্রধানতম উপায়– সেই ব্যক্তিমালিকানাই ছিল এ স্তরে অজানা।..... খাদ্য সংগ্রহ করার লক্ষ্যে ও নানান প্রতিকূল পরিবেশ থেকে নিজেদেরকে নিরাপদ রাখার লক্ষ্যে তারা যাযাবর জীবনযাপন করতো। তাই তাদের নির্দিষ্ট আবাসভূমি বা রাষ্ট্র ছিল না। ..... এ স্তরে তাদের মনে আল্লাহ বা ধর্ম বলতে কিছুই ছিল না। অর্থাৎ আদিমকালে মানুষের মধ্যে কোনো শ্রেণী স্তর শোষণ রাষ্ট্র ও ধর্ম ছিল অজানা–অজ্ঞাত। এই যে সামাজিক স্তর, এটাকেই ইতিহাসে ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 'আদিম সাম্যবাদী সমাজ' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ..... কালক্রমে মানবগোষ্ঠী বেঁচে থাকার তাগিদে সীমাহীন কঠোর প্রচেষ্টা চালিয়ে নানান কলাকৌশল ও হাতিয়ারের সাহায্যে প্রাকৃতিক প্রতিকূল পরিবেশ ও হিংস্র জীবজন্তুকে প্রতিহত করার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হতে থাকে এবং খাদ্যসহ অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ ও উৎপাদন করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার

সাথে সাথে মানবগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নত হতে থাকে। সেই সাথে অবাধ ও মুক্ত প্রেমলীলার ফলে জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং বাড়তি জনসংখ্যা উৎপাদনকার্যে নিয়োজিত হওয়ার ফলশ্রুতিতে এ স্তরে প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ সৃষ্টির পরিবেশ গড়ে ওঠে। ... এ সামাজিক পরিবেশে বাড়তি সম্পদকে কেন্দ্র করে ও প্রত্যক্ষ রক্তের সম্পর্ককে ভিত্তি করে 'আদিম সাম্যবাদী সমাজ' কালক্রমে 'উপজাতীয় সমাজে' প্রবেশ করে। তবে এ সামাজিক স্তরে আদিম সাম্যবাদী সমাজের সবই গৃহীত হতে দেখা যায়। তবে এ স্তরে তাদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনাবোধের উন্মেষ ঘটে। উপজাতীয় পারিবারিক সমাজ পরিচালনার জন্যে উপজাতীয় বয়োজ্যেষ্ঠ বা শক্তিশালী বা জ্ঞানী ব্যক্তিকে সর্বসম্মতিক্রমে 'উপজাতীয় প্রধান' হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। পরবর্তীকালে উপজাতীয় সমাজের বিস্তৃতি ঘটলে উপজাতীয় লাঠিয়াল বাহিনীপ্রধান বা সমরপ্রধান, উৎসবপ্রধান, শিকারপ্রধান, কৃষিপ্রধান ও অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিদের নির্বাচিত করা হয়। উপজাতীয় প্রধানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে সমাজের প্রতিটি সদস্য-সদস্যাদের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব সম-অধিকারের ভিত্তিতে সম্পাদন করা হতো। সকলের আয়-রোজগার 'উপজাতীয় তহবিলে' জমা হতো। এখানেও কেউ কাউকে শোষণ করতে পারতো না– সেই পরিবেশও তখনো পর্যন্ত সৃষ্টি হয়নি। যৌথ বা সমষ্টিগত চিন্তায় ছিল তারা আচ্ছন্ন। কিন্তু কালক্রমে উপজাতীয় প্রধান বা সমরপ্রধান, উৎসবপ্রধান ও অন্যান্য শক্তিশালী ব্যক্তিদের মনে উপজাতীয় সমষ্টিগত বাড়তি সম্পদের ভোগ-দখলকে কেন্দ্র করে লোভ-লালসা ও সমাজের বুকে প্রভাবপ্রতিপত্তি সংহত করার সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থ ব্যক্তিসত্তা ব্যক্তিচিন্তা ব্যক্তিসম্পদ ও ব্যক্তিস্বাধীনতার বীজ অঙ্কুরিত হতে থাকে এবং এভাবেই উপজাতীয় সাম্যবাদী সামাজিক কাঠামোয় প্রচণ্ড ধস নেমে আসে। কালক্রমে শক্তিশালী জ্ঞানী বা সমাজপ্রধানদের কৌশল, অত্যাচার, নির্যাতন, ফন্দিফিকির ও প্রতারণার শিকার হয়ে সমাজের বৃহত্তম অজ্ঞ দুর্বল মানবগোষ্ঠী তাদের অধীনে দাস হিসেবে পরিণত হতে থাকে। ..... এভাবেই মানবসমাজ দাসপ্রথার যুগে প্রবেশ করে। আর এই দাসপ্রথাভিত্তিক সমাজের গর্ভ হতেই অর্থাৎ প্রভুদের কারসাজিতেই মানবসমাজের বুকে প্রত্যক্ষ শ্রেণীসত্তা, অত্যাচার, উৎপীড়ন, শোষণ, বঞ্চনা, প্রতারণা, দুর্নীতি ইত্যাদি প্রথমবারের মতো আইনসম্মত হয়ে পড়ে এবং এগুলোকে আরো সাংগঠনিক উপায়ে কার্যকরি করার লক্ষ্যে ধর্ম, আইন-কানুন, রাষ্ট্র, পুলিশ বা নিরাপত্তা বাহিনী প্রভৃতির উদ্ভব ঘটে। ..... এ জাতীয় অসংগতি, শোষণ, দুর্নীতি, অত্যাচার, নির্যাতন, ব্যভিচার, বৈষম্য, অবিচার, রাষ্ট্রীয় স্বৈরাচার,

ধর্মীয় প্রতারণা, কুসংস্কার এবং এর ধারক-বাহক সামন্তবাদী ধনতান্ত্রিক সমাজের শাসক-শোষক্গোষ্ঠীর কবল থেকে মানবজাতির সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে মহানবী ও মনীষী কার্লমার্কস সাম্যবাদী সমাজ বিপ্লবের যে দিকদর্শন ও আহ্বান প্রদান করে গেছেন, তার মধ্যে নতুন তেমন কিছু নেই, তা আদিম অকৃত্রিম সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থারই বিবর্তনগত, গুণগত বা কাঠামোগত বৈজ্ঞানিক প্রতিফলন বৈ কিছু নয়। তেমনি আমিও সাম্যবাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং আমার দেশের মানুষ ও সমাজের প্রয়োজনে চিন্তাভাবনা করে দেখলাম, সাম্যবাদী সমাজ বিপ্লব ব্যতীত আমার দেশের সাধারণ মানুষের সার্বিক মুক্তি আসতে পারে না। আর সাম্যব্বাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হচ্ছে জনগণের গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ– যে চেতনাবোধ বস্তুতঃ নির্ভর করে ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাব, সাম্যবাদী আর্থসামাজিক পরিবেশ, জনগণের ইস্পাতকঠিন ঐক্য তথা জাতীয়তাবাদের ওপর। এ কারণেই আমি সমাজতন্ত্র গণতন্ত্র জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে চিহ্নিত করেছি।

৪. বঙ্গবন্ধু, অনেকে বলেন, 'বাকশাল' হলো একদলীয় বা আপনার স্বৈরতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার একটি অপকৌশল... এ সম্পর্কে আপনি পরিষ্কার মতামত দিন।

উত্তর ঃ সাম্রাজ্যবাদের অবশেষ পুঁজিবাদী সমাজ-সভ্যতা ও শোষক পরজীবীদের দৃষ্টিতে 'বাকশাল' তো একদলীয় শাসন ব্যবস্থা হবেই! কারণ বাকশাল কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আমি সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধি বহুজাতিক পুঁজিবাদী শোষক, তাদের সংস্থাসমূহের লগ্নিকারবার এবং তাদের এদেশীয় সেবাদাস, এজেন্ট, উঠতি ধনিকগোষ্ঠীর একচেটিয়া শোষণ ও অবৈধ প্রভাবপ্রতিপত্তি, দুর্নীতি-প্রতারণার সকল বিষদাঁত ভেঙে দেবার ব্যবস্থা করেছি। এজন্য তাঁদের আঁতে ঘা লাগছে, বাকশাল ও আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে বেড়াচ্ছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সৌদি শাসকরা এদেশে গোপনে অর্থ যোগান দিয়ে তাদের সেবাদাস ও এজেন্টদের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক কার্যক্রমকে বানচাল করতে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তাঁরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, সভা-সমিতি– এমনকি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমার সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লিপ্ত হয়েছে। কলকারখানা, অফিস-আদালত, শিল্প প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন থানায় তাদের ভাড়াটিয়া চরদের দিয়ে অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা চালাচ্ছে। বিভিন্ন স্থানে অগ্নিসংযোগ লুটতরাজ গণহত্যা অসামাজিক কার্যকলাপ ও সাম্প্রদায়িক তৎপরতা চালাচ্ছে। প্রতিদিন তাদের ষড়যন্ত্রের খবরা-খবর আমার কানে আসছে। ... প্রচলিত গণতান্ত্রিক বৈষম্য,

শোষণ, দুর্নীতিভিত্তিক সমাজকে– দেউলিয়া আর্থসামাজিক ব্যবস্থা, জরাজীর্ণ প্রশাসন ও অবিচারমূলক বিচার ব্যবস্থাকে সমূলে উৎপাটিত করে একটি শোষণহীন দুর্নীতিহীন বৈষম্যহীন ও প্রকৃত গণতান্ত্রিক সাম্যবাদী সমাজ বিপ্লবের পথা রচনা করেছি। এই সমাজ বিপ্লবে যাঁরা বিশ্বাসী নন তাঁরাই বাকশাল ব্যবস্থাকে একদলীয় স্বৈরশাসন ব্যবস্থা বলে অপপ্রচার করছেন। কিন্তু আমি এসকল বিরুদ্ধবাদীদের বলি, এতোকাল তোমরা মুষ্টিমেয় লোক আমার ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ দুখী মেহনতি মানুষকে শাসন ও শোষণ করে আসছো। তোমাদের বল্গাহীন স্বাধীনতা ও সীমাহীন দুর্নীতির মধ্য দিয়ে ব্যক্তিসম্পদের পাহাড় গড়ে তোলার অবাধ ও মুক্ত প্রতিযোগিতার হোলিখেলায় আমার দুখীমানুষের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-সাধ ধুলায় মিশে গেছে। বঞ্চিত মানবাত্মার ক্ষুধার জ্বালা, ব্যথা বেদনা হতাশা ক্রন্দন তোমাদের পাষাণ হৃদয়কে একটুও গলাতে পারেনি। বাংলার যে স্বাধীনতা তোমরা ভোগ করছো– এই স্বাধীনতা– এই দেশ– এই মাটি– ঐ আমার দুখী মেহনতি মানুষের সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা, আন্দোলন-সংগ্রাম এবং জীবন-মৃত্যুর বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে তোমাদের অবদান কতটুকু আছে, নিজেদের বুকে একবার হাত দিয়ে চিন্তা করে দেখো। বরং অনেক ক্ষেত্রে স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছো– বিদেশী শাসক-শোষকদের সহায়তা করেছো– নিজের ঘরে থেকে ভাইয়ের ঘর পুড়িয়েছো, মানুষকে হত্যা করেছো– মা-বোনদের লাঞ্ছিতা করেছো– আরো কি-না করেছো? এসব কিছু করেছো শুধুমাত্র ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের ঘৃণ্য লক্ষ্যে। .....আমার দেশের মাত্র ৫ পার্সেন্ট লোক ৯৫ পার্সেন্ট লোককে দাবিয়ে রাখছে, শাসন-শোষণ করছে। বাকশাল করে আমি ঐ ৯৫% ভাগ মানুষের স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক শাসন ও অর্থনৈতিক মুক্তির ব্যবস্থা করেছি। এতকাল ৫% ভাগ শাসন করেছে– এখন থেকে করবে ৯৫% ভাগ। ৯৫% ভাগ মানুষের সুখ-দুঃখের সাথে ৫% ভাগকে মিশতে হবে। আমি মেশাবোই। এজন্যে বাকশাল করেছি। এই ৯৫% ভাগ মানুষকে সংঘবদ্ধ করেছি তাদের পেশার নামে– তাদের বৃহত্তর কল্যাণে– তাদের একক দল 'বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক-আওয়ামী লীগ' বা বাকশালে। সুতরাং মূলত বাকশাল হচ্ছে বাঙালির সর্বশ্রেণী সর্বস্তরের গণমানুষের একক জাতীয় প্লাটফরম– রাজনৈতিক সংস্থা– একদল নয়। এখানে স্বৈরশাসনেরও কোনো সুযোগ নেই। কারণ বাঙালি জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত বা সমষ্টিগত শাসন ব্যবস্থায় কে কার ওপর স্বৈরশাসন চালাবে? প্রত্যেক পেশার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে শাসন পরিষদ গঠিত হবে। কোনো পেশা বা শ্রেণী অন্য পেশার লোকদের ওপর

খবরদারী করতে পারবে না। ... যে কেউ যিনি জনগণের সার্বিক কল্যাণের রাজনীতিতে, জাতীয় সমৃদ্ধির ও উৎপাদনের রাজনীতিতে তথা সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার রাজনীতিতে বিশ্বাসী তিনি এই জাতীয় দলে ভিড়তে পারবেন। ... যাঁরা বাকশালকে একদলীয় ব্যবস্থা বলেন, তাঁদের স্মরণ করতে বলি, ইসলামে ক'টি দল ছিল? ইসলামী ব্যবস্থায় একটি মাত্র দলের অস্তিত্ব ছিল, আর তা হলো 'খেলাফত' তথা খেলাফতে রাশেদীন। মার্কসবাদও একটি মাত্র দলের অনুমোদন দিয়েছে। চীন, সোভিয়েত রাশিয়া, কিউবা, ভিয়েতনাম ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে ক'টি করে দল আছে? সৌদি আরব ও অন্যান্য ইসলামী রাষ্ট্রে কতটি করে দল আছে? এইসব ইসলামী রাষ্ট্রসমূহ বাদ দাও– ওখানে মহানবীর ইসলাম নেই। বস্তুত প্রকৃত গণতন্ত্র বা সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বার্থেই একটি একক জাতীয় রাজনৈতিক সংস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। একটি জাতীয় কল্যাণের অভিন্ন আদর্শে– ব্যাপক মানুষের সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে একটি মাত্র রাজনৈতিক সংস্থার পতাকাতলে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু বহুদলীয় তথাকথিত গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতায় কোনোভাবেই জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব নয়– প্রকৃত গণতন্ত্র– জনগণের গণতন্ত্র– কল্যাণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়– সেখানে বহুদলে জনগণ বহুধা বিভক্ত হতে বাধ্য। আর বিচ্ছিন্ন বিভক্ত– পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক দলের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, হিংসা-বিদ্বেষ ও হানাহানির রাজনীতি দিয়ে জাতির বৃহত্তর কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কোনোভাবেই অর্জিত হতে পারে না। ইতিহাস সে-সাক্ষ্য দেয় না। আমার দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাও তাই বলে।

৫. বঙ্গবন্ধু, বাকশালের মূল লক্ষ্য বা এর কর্মসূচি সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর ঃ বাকশালের মূল লক্ষ্য তো আগেই বিশ্লেষণ করেছি। তবে এক কথায় আমি যা বুঝি তাহলো– একটি শোষণহীন দুর্নীতিমুক্ত সমাজ ও শোষিতের গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠাকরণ। ... বাকশাল কর্মসূচিকে আমি প্রধানত চারটি বিভাগে ভাগ করেছি। এক. রাজনৈতিক, দুই. আর্থসামাজিক, তিন. প্রশাসনিক, ৪. বিচার ব্যবস্থা।

এক. রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনায় প্রত্যেক পেশাভিত্তিক লোকদের জাতীয় দল 'বাকশালে' অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা রেখেছি। এবং পর্যায়ক্রমে জাতীয় সংসদে পেশাভিত্তিক জনপ্রতিনিধিদের আনয়নের কর্মসূচি নিয়েছি। সংসদ নির্বাচনে প্রত্যেকটি নির্বাচনী এলাকায় জাতীয় দলের একাধিক প্রার্থীকে মনোনয়ন দেয়া হবে। জনগণ তাঁদের মধ্য থেকে একজনকে নির্বাচিত

করবেন। প্রেসিডেন্ট জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবেন। জাতীয় দলের যে কেউ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন। প্রেসিডেন্ট পদাধিকার বলে জাতীয় দলের চেয়ারম্যান হবেন। প্রেসিডেন্ট জাতীয় সংসদের আস্থাভাজন একজনকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন। প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে মন্ত্রীদের নিয়োগ করবেন। সংসদ সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের অনাস্থায় প্রেসিডেন্টকে অপসারণ করতে পারবেন। মন্ত্রিসভা প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় সংসদের কাছে দায়ী থাকবেন। ... স্থানীয় থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের সর্বস্তরে জনগণের প্রতিনিধিত্ব প্রত্যক্ষভাবে বজায় থাকবে।...

দুই. আর্থসামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে 'বাধ্যতামূলক বহুমুখী গ্রাম-সমবায় প্রকল্প'। এর মাধ্যমে গ্রামীণ আর্থব্যবস্থার উন্নয়ন বা স্বনির্ভর-স্বাধীন গ্রামীণ ব্যবস্থা– বিশেষ করে ভূমিসংস্কারের প্রয়োজনীয় ও কার্যকরি ব্যবস্থার মাধ্যমে ভূমিহীন কৃষকদের পুনর্বাসন তথা কৃষকদের হাতে জমি হস্তান্তর, উৎপাদন বৃদ্ধি ও সাম্যভিত্তিক বণ্টন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।.... ভারী শিল্পকলকারখানা, পরিত্যক্ত সম্পত্তি, বৈদেশিক বাণিজ্য, ব্যাংক-বীমা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি জাতীয়করণ করে জনগণের সমষ্টিগত মালিকানায় ইতিমধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে। জনগণের যৌথ শেয়ার মূলধনে নতুন নতুন কৃষিজাত শিল্প ও অন্যান্য শিল্প-কলকারখানা ও সংস্থা প্রতিষ্ঠা।... সীমিত ব্যক্তিমালিকানাকে উৎসাহদানের ব্যবস্থা রয়েছে। তবে ব্যক্তিমালিকানাধীন সংস্থাসমূহ যাতে জনসাধারণ ও তাদের শ্রমিকদের শোষণ করতে না পারে তার ব্যবস্থা থাকবে।...

তিন. প্রশাসনিক কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, করপোরেশন ও বিভাগগুলোর পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠন তথা মাথাভারী প্রশাসনের উচ্ছেদসাধন। ... প্রশাসনিক ক্ষেত্রে 'জেলা গভর্নর ও থানা প্রশাসনিক প্রকল্প' হাতে নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে দেশের সকল মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করা হয়েছে। প্রশাসনিক জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রিতার কারণে ইউনিয়ন পরিষদ, মহকুমা ও বিভাগীয় প্রশাসনকে তুলে দেয়া হচ্ছে। জেলা ও থানাগুলো জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত হবে। গ্রাম সমবায় পরিষদ সদস্যদের ভোটে থানা পরিষদ গঠিত হবে। তবে থানা পরিষদের প্রশাসক/চেয়ারম্যান ও জেলা গভর্নররা জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। থানা প্রশাসক/চেয়ারম্যানরা এবং জেলা গভর্নররা জনগণ, স্ব-স্ব পরিষদ ও প্রেসিডেন্টের কাছে দায়ী থাকবেন। ... সরকারী কর্মচারীরা থানা প্রশাসক/চেয়ারম্যান এবং জেলা গভর্নরদের নিকট দায়ী থাকবেন। ... গ্রাম সমবায় পরিষদ থানা পরিষদের কাছে– থানা পরিষদ জেলা পরিষদের

কাছে দায়ী থাকবে। গ্রাম সমবায় পরিষদ, থানা পরিষদ, জেলা পরিষদ– এরপরেই থাকবে জাতীয় সরকার। এভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে জাতীয় সরকারের প্রশাসনিক ক্ষমতাকে বিপুলভাবে বিকেন্দ্রীকরণ করে প্রশাসনকে জনগণের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা নিয়েছি। প্রশাসনিক আমলাতন্ত্র, স্টিলফ্রেম বা গতানুগতিক বা টাইপড চরিত্রকে ভেঙে গুঁড়ো করে দেবার ব্যবস্থা নিয়েছি। সরকারী কর্মচারীরা এখন থেকে জনগণের সেবক।...

চার. বিচার বিভাগের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টকে রাজধানীতে বহাল রেখে হাইকোর্ট বিভাগকে আটটি আঞ্চলিক বিভাগে বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা নিয়েছি। তবে সুপ্রিম কোর্টের অধিবেধন বছরে অন্তত একবার করে প্রতিটি আঞ্চলিক বিভাগে (হাইকোর্ট বিভাগে) বসবে। .... জেলা আদালতসমূহ বহাল থাকবে। প্রতিটি থানাতে থাকবে একাধিক বিশেষ ট্রাইবুনাল। প্রত্যেক আদালতে যেকোন মামলা ৩ থেকে ৬ মাসের মধ্যে মীমাংসা করতে হবে। ... গ্রামে থাকবে একাধিক 'শালিস বোর্ড'। 'শালিশ বোর্ড' সদস্যরা থাকবেন বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদের দূরবর্তী বিভিন্ন ওয়ার্ডের বাসিন্দা। শালিস বোর্ড চেয়ারম্যান থাকবেন সরকার নিয়োজিত বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটরা। ... এভাবে সুষ্ঠু, ন্যায় ও দ্রুততর গণমুখী বিচারকার্য সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বিচার বিভাগের ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে।

৬. বঙ্গবন্ধু, অনেকে বলেন, আপনি নাকি কোনো একটি শক্তির চাপের মুখে বা তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাকশাল কর্মসূচি দিয়েছেন এবং এ ব্যবস্থা নাকি সাময়িককালের জন্য করেছেন– এ বিষয়ে আপনি অনুগ্রহ করে কিছু বলবেন কি?

উত্তর ঃ কারো প্রেসার বা প্রভাবের নিকট আত্মসমর্পণ বা মাথা নত করার অভ্যাস বা মানসিকতা আমার নেই। একথা যাঁরা বলেন, তাঁরাও তা ভালো করেই জানেন। তবে অপপ্রচার করে বেড়াবার বিরুদ্ধে কোনো আইন নেই, তাই উনারা এ কাজে আদাজল খেয়ে নেমেছেন। করুন অপপ্রচার। আমি স্বজ্ঞানে বিচার-বিশ্লেষণ করে, আমার অভিজ্ঞতার আলোকে– আমার দীনদুখী মেহনতি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে আমি বাকশাল কর্মসূচি দিয়েছি। আমি যা বলি, তা-ই করে ছাড়ি। যেখানে একবার হাত দেই সেখান থেকে হাত উঠাই না। ... বলেছিলাম, এদেশকে মুক্ত করে ছাড়বো, মুক্ত করেছি। বলেছি, শোষণহীন দুর্নীতিমুক্ত সমাজতান্ত্রিক বাংলা গড়বো, তা-ই করে ছাড়বো, ইনশাল্লাহ্। কোনো কিন্তুটিন্তু নাই। কোনোই আপোস নাই।

৭. বঙ্গবন্ধু, বাকশাল বিরোধীমহল– অর্থাৎ ঐ ৫% জন– ওরা সংখ্যায় অতি নগণ্য হলেও তাদেরই হাতে রয়েছে বিপুল সম্পদ। তাদের সাথে রয়েছে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদী শক্তির যোগসাজশ। তাদের পেইড এজেন্টরাই রয়েছে প্রশাসনিক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতার কেন্দ্রে। তাদের কায়েমী স্বার্থের ওপর আপনি আঘাত হানতে যাচ্ছেন। এ অবস্থায় তারা চোখ মেলে মুখ বুঁজে বসে থাকবে বলে কি আপনি মনে করেন? তারা তাদের অবস্থান নিরাপদ ও সংহত করার জন্যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে না?

উত্তর ঃ আমি জানি তারা বসে নাই। ষড়যন্ত্র চলছে। প্রতিদিনই ষড়যন্ত্রের উড়োখবর আমার কাছে আসে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার পদলেহীরা এসব ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। গোপন পথে অঢেল অর্থ একাজে লাগাবার জন্যে বাংলাদেশে আসছে।... সুকৌশলে আমাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ চলছে। অপপ্রচার চলছে।... আমি জাতির বৃহত্তর কল্যাণে নেমেছি। জনগণ সমর্থন দিচ্ছে। তাই ষড়যন্ত্র করে, বাধার সৃষ্টি করে, হুমকি দিয়ে আমাকে নিবৃত্ত করা যাবে না। আমার কাজ আমি করে যাবোই।... হয়তো শেষ পর্যন্ত ওরা আমাকে মেরে ফেলতে পারে। পরোয়া করি না। ও মৃত্যু আমার জীবনে অনেকবার এসেছে। এ্যাকসিডেন্টালি আজো আমি বেঁচে আছি। অবশ্যই আমাকে মরতে হবে। তাই মৃত্যুভয় আমার নেই।... জনগণ যদি বোঝে আমার আইডিয়া ভালো, তাহলে তারা তা গ্রহণ করবে। আমার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে। আমার একটা বড় সান্ত্বনা আছে, যুদ্ধের সময় আমি জনগণের সাথে থাকতে পারিনি। জনগণ আমারই আদর্শ ও নির্দেশে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে। আজকের এই শোষণমুক্ত সমাজতন্ত্র বা অর্থনৈতিক মুক্তির বিপ্লবে আমি যদি না-ও থাকি, তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার বাঙালিরা যেকোনো মূল্যে আমার রেখে যাওয়া আদর্শ ও লক্ষ্য একদিন বাংলার বুকে বাস্তবায়িত করে ছাড়বে, ইনশাল্লাহ। এ প্রসঙ্গে কবিগুরু থেকে তোমাকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ভয় নাই ওরে ভয় নাই
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।

ইসলাম মার্কসবাদ ও মুজিববাদ

মহানবীর ইসলামী সাম্যবাদ ও মনীষী কার্ল মার্কস প্রবর্তিত আধুনিক বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের রাজনৈতিক আর্থসামাজিক ও নৈতিক আদর্শ এবং শাশ্বত বাঙালিত্বের মূল্যবোধ থেকে অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত হয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারা প্রণয়ন করেছিলেন– এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সেই চিন্তাধারা ও মতাদর্শকে ভিত্তি করে তিনি বাংলাদেশের রাজনৈতিক আর্থসামাজিক প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার রূপরেখা ও দিকনির্দেশও প্রদান করেছিলেন এদেশের প্রাকৃতিক-নৈসর্গিক পরিবেশ, ভৌগোলিক অবস্থান ও বাঙালি জাতির চিরায়ত মন-মনন, আশা-আকাঙ্ক্ষার আলোকে, একটি শোষণহীন কল্যাণকর সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার মহান লক্ষ্যে। অর্থাৎ এদেশের চিরশোষিত চিরদরিদ্র নিপীড়িত অত্যাচারিত নির্যাতিত ভাগ্যাহত সর্বহারা অজ্ঞ দুর্বল শ্রমজীবী মেহনতি বাঙালি সাধারণের সার্বিক মৌলিক মানবাধিকার তথা অন্ন বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা চিকিৎসার নিশ্চয়তা ও তাদের 'প্রকৃত গণতান্ত্রিক একনায়কতান্ত্রিক শাসন' প্রতিষ্ঠাকরণের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু তাঁর বৈপ্লবিক রাজনৈতিক কর্মসূচি প্রণয়ন করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চিন্তাচেতনা ও ধ্যানধারণার সাথে ইসলাম ও মার্কসবাদের তাই কোনো বিরোধ নেই। বরং ইসলাম ও মার্কসবাদের রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক ব্যবস্থার তাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক কার্যক্রমের আলোকেই তিনি সমাজরাষ্ট্রীয় শাসনতান্ত্রিক কাঠামোকে চারটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সেই চারটি স্তম্ভই হচ্ছে গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা। পরবর্তীকালে এই মূল নীতিমালা চতুষ্টয়কে ব্যাপক পরিবর্ধিত একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক সাম্যবাদী সামাজিক রাজনৈতিক সাংগঠনিক একক জাতীয় রাজনৈতিক প্লাটফরম বা সংস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত করে সর্বস্তরের সর্বশ্রেণীর পেশাজীবী মানুষের প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন 'বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক-আওয়ামী লীগ' বা বাকশালের মাধ্যমে আর্থসামাজিক প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যবস্থার রূপকাঠামো প্রদান করেছিলেন।

এখানে গণতন্ত্র হলো বাঙালি জাতির সার্বিক জীবনের মূল্যবোধের সোপান। সমাজতন্ত্র হলো প্রতিটি বাঙালির আর্থবৈষয়িক সাম্য ও শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থায় সকলের প্রতিভা বিকাশের মৌলিক মানবাধিকারের রক্ষাকবচ। জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা হলো বাঙালি জাতির

সাম্য-মৈত্রী-ঐক্য-ভাতৃত্ববোধ ও সহমর্মিতাবোধের বন্ধনী। এই চারটি মূলনীতিমালার সমন্বয়ে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন ও সমাজরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার গতিপ্রকৃতি ও চরিত্র গড়ে উঠেছে। তাঁর চারটি মূলনীতির সুসমন্বয়ের ওপর নির্ভর করে আছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও সমৃদ্ধশীল জাতিরাষ্ট্রের চাবিকাঠি।

এক্ষণে আমাদের পর্যালোচনা করে দেখতে হবে যে, ইসলাম ও মার্কসবাদের মধ্যে রাজনৈতিকভাবে আদর্শগত কোনো বিরোধ নেই। বরং তাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে এ দুটি মতবাদ একই মহান লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথনির্দেশ প্রদান করেছে যা থেকে বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিকভাবে অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত হয়েছিলেন। তবে সামাজিক বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপটেই এ পর্যালোচনাকে মূল্যায়ন করতে হবে।

আমরা জানি যে, কারবালা মরুপ্রান্তরে ইমাম হোসেনের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ইসলামের ঐতিহ্যবাহী খেলাফতে রাশেদীনের গণতান্ত্রিক সাম্যবাদী সূর্য অস্তমিত হয়ে যায়। এরই ফলশ্রুতিতে ইসলামের অঙ্গনে ধর্মের আবরণে সুপ্তপ্রতিক্রিয়াশীল প্রতিবিপ্লবী স্বৈরতান্ত্রিক সামন্তবাদী শাসক-শোষক ও মোল্লা-পুরোহিতদের পুনরাবির্ভাব ঘটে। এরা তাদের কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সামাজিক সমষ্টিগত মানবকল্যাণের পরিবর্তে ধর্মের দোহাই দিয়ে সংকীর্ণ ব্যক্তিলোভ ব্যক্তিচিন্তা ব্যক্তিস্বার্থ ব্যক্তিশাসন ও ব্যক্তিভাগ্যোন্নয়নের উদগ্র লালসাকে চরিতার্থ করার লক্ষ্যে যাবতীয় শোষণ বঞ্চনা নির্যাতন অত্যাচার শঠতা প্রতারণা ও সীমাহীন দুর্নীতিকে 'জায়েজ' বা আইনসম্মত করে সমাজের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ অজ্ঞ দুর্বল মেহনতি জনসাধারণকে দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করে স্বৈরতান্ত্রিক সামন্তবাদী শাসন ও অমানবিক শোষণকার্য চালিয়ে যেতে থাকে। শুধু আরবভূমিতেই নয়– এ জাতীয় শক্তিকে সারা বিশ্বে একই পদ্ধতিতে শাসন ও শোষণকার্য চালিয়ে যেতেও আমরা দেখতে পাই। পৃথিবীর মানবগোষ্ঠীর মধ্যকার শ্রেণীসংগ্রাম ও দ্বন্দ্বমূলক রাজনৈতিক কার্যকলাপের ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট বিবর্তনবাদের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ঐ শক্তির গুণগত ও আকৃতিগত পরিবর্তন সাধিত হয়ে বিশ্বের বুকে আবির্ভূত হয়েছে আজকের সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশবাদ ধনতন্ত্রবাদ বা একচেটিয়া পুঁজিবাদ। এ শক্তিসমূহের কৌশলী শাসন ও একচেটিয়া শোষণ বঞ্চনার কবল থেকে মুক্তিকামী শোষিত নিষ্পেষিত সর্বহারা মেহনতী শ্রমজীবী মানবগোষ্ঠীকে মুক্ত করার লক্ষ্যে সমাজের শ্রেণীসংগ্রাম বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী কার্যকারণের প্রেক্ষাপটে নতুন করে সাম্যবাদের আবির্ভাব অনিবার্য হয়ে পড়ে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মাবিয়া-এজিদ গং কূটকৌশল ষড়যন্ত্র ও রক্তাক্ত প্রতিবিপ্লবী কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে ইসলাম তথা খেলাফতে রাশেদীনের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অগণতান্ত্রিক উত্তরাধিকারভিত্তিক সামন্তবাদী স্বৈরতান্ত্রিক রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করে খেলাফতের সমষ্টিগত মঙ্গলের সাম্যবাদী আর্থব্যবস্থাকে সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থ ও ব্যক্তিমালিকানায় পর্যবশিতকরণের যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে। তাঁরা পবিত্র কোরআনের বাণী 'আকাশে ও পৃথিবীতে যা কিছু সম্পদ রয়েছে তার মালিক একমাত্র আল্লাহ'-কে অস্বীকার করে বা অপবিত্র করে সম্পদে মানুষের ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠিত করে ধর্মের দোহাই দিয়ে। এসব লক্ষ্যে শাসক-শোষকগোষ্ঠী ইসলাম-পূর্ব ধর্মীয় গোঁড়ামি, কুসংস্কার ও শোষণবাদী সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণা সমাজের বুকে চাঙ্গা করে তোলে ইসলামের ছত্রছায়ায়। মহানবীর জন্মভূমি, ইসলামের উদয়ভূমি বর্তমান সৌদি আরবসহ অন্যান্য রাজতান্ত্রিক বা উত্তরাধিকারভিত্তিক রাষ্ট্রসমূহের বুকে যে শাসন ও আর্থসামাজিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তা মাবিয়া-এজিদদের প্রবর্তিত ব্যবস্থারই ঐতিহ্য। প্রকৃত ইসলামের হত্যাকারী মাবিয়া-এজিদচক্রের ঐতিহ্যকে ঐসব রাষ্ট্রে বহাল রাখা হয়েছে ইসলামেরই দোহাই দিয়ে। প্রকৃতপক্ষে অনৈসলামিক ব্যবস্থাকে ইসলামের নামে চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে ঐসব রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে।

সুতরাং ইসলাম তথা খেলাফতের সেই হারিয়ে যাওয়া গণতান্ত্রিক শাসন ও সাম্যভিত্তিক আর্থসামাজিক ব্যবস্থার ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যবাহী ধ্যান-ধারণার আলোকে– বর্তমান সমাজসভ্যতার বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী কার্যকারণের প্রেক্ষাপটে মনীষী কার্লমার্কস ও এঙ্গেল্‌স আধুনিক সাম্যবাদের দিকদর্শন রচনা করেছেন– সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। মহানবী প্রদর্শিত রাজনৈতিক আর্থবৈষয়িক ও সামাজিক সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা যা খেলাফতে রাশেদীন কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছিল তা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা আধুনিক সাম্যবাদের রাজনৈতিক দর্শন ও আর্থসামাজিক ব্যবস্থার নিকনির্দেশ প্রদান করেছেন– একথাটাও আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। আমাদের মহান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবও একইভাবে তা থেকে অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত হয়েছেন। সুতরাং ইসলাম ও আধুনিক সাম্যবাদের মধ্যে আদর্শগত কোনো কোন্দল নেই। যাঁরা কোন্দল খোঁজেন এবং 'ইসলাম গেল', 'ধর্ম গেল' বলে তারস্বরে চিৎকার করেন তাঁরা মূলতঃ মাবিয়া-এজিদী ব্যবস্থার প্রতি তাঁদের সমর্থন ব্যক্ত করে নিজেদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকেই উন্মোচিত করেন।

পবিত্র কোরআনের মহানবাণী 'আকাশে ও পৃথিবীতে যা কিছু সম্পদ রয়েছে তার একমাত্র মালিক আল্লাহ– আদমসন্তানেরা এর হেফাজতকারী মাত্র'– এর প্রেক্ষাপটে ইসলামের অঙ্গনে সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা ব্যবস্থাকে স্বীকার করা হয়নি। মহানবী থেকে শুরু করে খেলাফতে রাশেদীনের হযরত আলী পর্যন্ত শাসনব্যবস্থায় ভূমিসহ অন্যান্য উৎপাদন ব্যবস্থা ও সম্পদকে জাতীয়করণ করে সমষ্টিগত মানুষের হেফাজতে আল্লাহর মালিকানায় ন্যস্ত করা হয়েছিল। এ ব্যতীত যাবতীয় সম্পদ-সামগ্রীকে সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে 'বায়তুলমাল' বা জাতীয় অর্থভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল।

আল্লাহর বিধানে সকল মানুষ সমান। মানুষের কোনো গোষ্ঠী শ্রেণী বা সাম্প্রদায়িক পরিচয় নেই। এ প্রেক্ষিতে ইসলাম মানুষের মধ্যে বহুদল উপদল ইত্যাদি অনুমোদন করেনি। কারণ বহুদলীয় বা নানান উপদলীয় কোন্দলে মানুষের মধ্যে দলাদলি রেষারেষি দ্বন্দ্ব-সংঘাত প্রতিযোগিতা ও শ্রেণীবিভক্তি লাভ করে থাকে। তাই ইসলাম মানুষের ওপর মানুষের শাসন-শোষণের অবসানকল্পে সকল মানুষের ঐক্য সাম্য মৈত্রী সম্প্রীতি সহমর্মিতা শৃংখলা ও সৌভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠার বৈপ্লবিক লক্ষ্যে সকল মানুষের সাম্যভিত্তিক মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করার এবং গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রতিনিধিত্বমূলক একক জাতীয় রাজনৈতিক সংস্থার স্বীকৃতি দিয়েছে। এর প্রমাণসরূপ আমরা দেখতে পাই খেলাফতে রাশেদীনকে। উক্ত খেলাফতে রাশেদীন তৎকালীন সময়-যুগ বা পরিবেশগত সামাজিক ব্যবস্থার কারণে ছিল একটি প্রগতিশীল বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা যা বর্তমান গণতন্ত্র ও আর্থসামাজিক ব্যবস্থাকেও প্রভাবান্বিত করে থাকে।

এবার আমরা খেলাফতে রাশেদীনের গঠনপ্রণালী উদ্দেশ্য লক্ষ্য ইত্যাদি বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো, যাতে সত্যিকারার্থে আমরা সাম্যবাদকে হৃদয়াঙ্গম করতে পারি।

খেলাফতে রাশেদীন শাসনাধীন অঞ্চলের সামাজিক আর্থবৈষয়িক সাংস্কৃতিক ও নৈতিক ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়, যেমন ইহুদী খ্রিস্টান মুসলমান সেবিয়ান্স মেজিয়ান্স পলিথ্যিস্ট ও অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ের লোকদের সমমর্যাদায় সমানভাবে ঠাঁই দেয়া হয়েছিল। তবে একমাত্র মুসলমান ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোকদের খেলাফতের রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক ক্ষমতার কেন্দ্রে ঠাঁই দেয়া হয়নি। কারণ তারা ছিল ইসলাম-পূর্ব সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থা, নানান কুপ্রথা-কুসংস্কার, শোষণ, বর্ণবৈষম্য, ধর্মীয় অনাচার ও সুদের লগ্নিকারবার ব্যবস্থার প্রতি আসক্ত। এরা ইসলামের সাম্যবাদী গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদি ব্যবস্থাকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করতো। তাই রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার

কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত হয়ে যাতে তারা ইসলামের সাম্যবাদী বৈপ্লবিক সামাজিক গতিধারাকে উল্টোখাতে প্রবাহিত করতে না পারে সেজন্যে তাদেরকে রাজনৈতিকভাবে উচ্ছেদ করে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক অধিকার ও প্রতিনিধি নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া বা নির্বাচনে ভোটার হওয়া এবং প্রশাসনিক কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত হওয়ার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রদান করা হয়নি। এসবের পশ্চাতে ধর্মীয় কোনো কারণ ছিল না। বরং পূর্বতন সমাজের শোষক-প্রভু ও তাদের নিত্যসহচর তাবেদার মোল্লা-পুরোহিত-যাজকদের সামন্তবাদী শাসন-শোষণ কুসংস্কার ও কুপ্রথার শক্তিকে খর্ব করে নতুন সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থাকে সংহত করাই ছিল এসব কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। তবে একমাত্র রাজনৈতিক অধিকার ব্যতীত অন্যান্য সকল সামাজিক আর্থবৈষয়িক সাংস্কৃতিক ও মানবিক অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়নি বা তাদের ওপর বিরূপ আচরণ বা ধর্মীয় অধিকারের ওপর কোনো প্রকার বিধিনিষেধ খেলাফত কর্তৃক আরোপিত হয়নি। এমনকি মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকজনদের সাথে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী বা ভিন্নমতাবলম্বী লোকজনদের সামাজিক সাংস্কৃতিক আত্মিক বা বৈবাহিক সম্পর্কের ব্যাপারেও খেলাফত ও ইসলামের কোনো বাধা-নিষেধ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে খেলাফতের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ধর্মনিরপেক্ষতার চিন্তাধারায় সিক্ত। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনের বাণী প্রণিধানযোগ্য-- যথাঃ "যার যার ধর্ম তার তার কাছে'– 'ধর্মের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই'– '...কোন ধর্ম সঠিক, কোন ধর্ম বেঠিক তার নির্ণয়ের ভার একমাত্র আল্লাহর ওপর' এবং 'খ্রিস্টান মেজিয়ানস ইহুদী মুসলমান সেবিয়ানস পলিথ্যিস্ট স্ক্রীপচার্স বা অন্য যে কেউ– যিনি সৎপথে চলেন, এক আল্লাহ ও শেষ বিচারের দিনে বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাঁর কোনো ভয় নেই– নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁকে পুরস্কৃত করবেন।" এসব থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার শাশ্বতবাণী মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে।

খেলাফতের প্রধান বা খলিফা ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হতেন। খেলাফতের শাসন ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রিকরণ করার লক্ষ্যে খলিফা জনসাধারণের আস্থাভাজন ব্যক্তিদের অন্যান্য পদে নিযুক্ত করতেন। প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যকলাপ সম্পাদন করার পূর্বে খলিফা জনসাধারণ বা তাদের আস্থাশীল লোকজনের সাথে পরামর্শ করে নিতেন। এভাবেই জনগণের গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল।

সম্পদে ব্যক্তিমালিকানা ও মানুষের মধ্যে কোনো শ্রেণীবৈষম্য স্বীকৃত হয়নি বলে খেলাফতে রাশেদীনের আমলে শোষণ ছিল না। ছিল না দুর্নীতি, অবৈধ প্রভাব-প্রতিপত্তির অবকাশ। এসব ব্যাপারে খেলাফত কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল। নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী ও দুর্নীতিপরায়ণ

ব্যক্তিদের কঠোর হস্তে দমন করার প্রমাণও আমরা খুঁজে পাই। যিনি যতই ক্ষমতাশালী ছিলেন না কেনো– তিনি নিয়মকানুনের ঊর্ধ্বে ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে হযরত উমরের কথাই মনে পড়ে। নিজপুত্রের অপরাধ বা দুর্নীতি প্রমাণিত হওয়ার পর হযরত উমর নিজহাতে তাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করেছিলেন। মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যাপারে খেলাফত নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতো।

খেলাফতের শাসনাধীন অঞ্চলের ধর্মবর্ণনির্বিশেষে প্রতিটি সাবালক কর্মক্ষম নারী-পুরুষ যার যার যোগ্যতানুযায়ী কাজকর্ম করতো– তাদের শ্রমে অর্জিত সম্পদ স্থানীয় বায়তুলমালে জমা হতো এবং বায়তুলমাল থেকে রেশনিংপ্রথায় সমভাবে বণ্টন করা হতো। কর্মক্ষম ও কর্ম-অক্ষমদের মধ্যে সম্পদসামগ্রী বিলিবণ্টনের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার তারতম্য সৃষ্টি হতো না। স্বয়ং খলিফাও অন্যান্য সকলের মতো বায়তুলমাল থেকে খাদ্য-বস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী রেশনিংপ্রথায় পেতেন।

অপরদিকে খেলাফতের সার্বিক ঐক্য ও সংহতি সংহত করার লক্ষ্যে এবং সকল মানুষের সাম্য-মৈত্রী-ঐক্য-ভাতৃত্ব-সহমর্মিতা-সহযোগিতা-সম্প্রীতি ও পারস্পরিক শিক্ষা-জ্ঞান ও ভাবের আদান-প্রদানের লক্ষ্যে সাবেক সমাজের বা আদিম উপজাতীয় মেলা বা সম্মেলনের ঐতিহ্য থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে মহানবী এই নব্যসাম্যবাদী সমাজের সকল মানুষের বাৎসরিক একবার মহাসম্মেলনের লক্ষ্যে হজ্বপ্রথার প্রচলন বা সংস্কার করেছিলেন।

এ ব্যতীত খেলাফত ব্যবস্থাপনার মধ্যে 'রাষ্ট্র'কে খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন খেলাফত শাসনাধীন অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমারেখা ছিল না। রাষ্ট্রের আনুষঙ্গিক বৈশিষ্ট্য যেমন প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদ, সচিবালয়, স্থায়ী সামরিক বাহিনী, আমলা বাহিনী ইত্যাদি বলতে কিছুই ছিল না। খেলাফতের যাবতীয় শাসনকার্য স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে সম্পাদিত হতো। বেতনভুক কোনো স্থায়ী কর্মচারী ছিল না। খলিফা বা অন্যান্য ডেপুটিরা অতিরিক্ত বেতন ভাতা পেতেন না।

'দুনিয়ার মুসলমান ভাই ভাই'– এ প্রেক্ষাপটে ইসলামী জাতীয়তাবাদের কথা বলা হলেও মূলতঃ ইসলাম বা খেলাফতের ছিল আন্তর্জাতীয়তাবাদী একক জাতিরাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি– যার ফলে এর কোনো ভৌগোলিক সীমারেখা ছিল না।

অতএব আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোকে আমরা খেলাফতকে কার্যত শ্রেণীহীন শোষণহীন রাষ্ট্রহীন সামাজিক রাজনৈতিক আর্থবৈষয়িক একক জাতীয় সংস্থা হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি– যার মূল লক্ষ্য ও

আদর্শ ছিল গণতন্ত্র সাম্যবাদ ধর্মনিরপেক্ষতা ও আন্তর্জাতিক জাতীয়তাবাদ। আর বস্তুত শোষণহীন শ্রেণীহীন ব্যবস্থা এবং গণতন্ত্র জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদই হলো সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি বা বৈশিষ্ট্য।

তেমনি আধুনিক বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের প্রবক্তা মনীষী কার্ল মার্কস শোষণহীন শ্রেণীহীন রাষ্ট্রহীন ধর্মনিরপেক্ষতা গণতন্ত্র ও আন্তর্জাতীয়তাবাদের আলোকে সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক দিকদর্শন ও রূপরেখা প্রদান করেছেন। সুতরাং ইসলামী সাম্যবাদ এবং মার্কসীয় সাম্যবাদের মধ্যে আদর্শগত কোনো কোন্দল নেই। দুটি দর্শনই একই মহান লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথনির্দেশ প্রদান করেছে।

এক্ষণে আমরা ইসলাম তথা খেলাফতের আলোকে মার্কসীয় ব্যবস্থার ওপর কিছুটা দৃষ্টিপাত করতে চাই।

মনীষী কার্ল মার্কস মানবগোষ্ঠীর গণতান্ত্রিক একক রাজনৈতিক সংস্থার কথা বলেছেন, যেমন 'কমিউনিস্ট পার্টি'। আর্থবৈষয়িক সামাজিক ক্ষেত্রে সম্পদে ব্যক্তিমালিকানা স্বত্ব– যা খেলাফত কর্তৃক অপসারিত হয়ে সাধারণের সমষ্টিগত মালিকানায় পর্যবসিত হয়েছিল– তেমনি মার্কসবাদে সম্পদের ব্যক্তিমালিকানাকে উচ্ছেদ সাধনের মধ্য দিয়ে উৎপাদনের যাবতীয় উপকরণ ও উৎপাদন ব্যবস্থাকে জাতীয়করণ বা সামাজীকরণের মাধ্যমে সাধারণ সমষ্টিগত মেহনতি মানুষের মালিকানায় পর্যবশিতকরণের কথা বলা হয়েছে। মার্কসের মতে, প্রত্যেক মানুষ তার যোগ্যতানুযায়ী কাজ করবে এবং প্রত্যেকে তার জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় উপকরণ বা সম্পদসামগ্রী পাবে।

খেলাফতের মতো কমিউনিস্ট পার্টিও আন্তর্জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর গড়ে উঠেছে। এখানে রাষ্ট্র ব্যবস্থা গৌণ। 'দুনিয়ার মেহনতি মানুষ ভাই ভাই'– এ প্রেক্ষিতে কমিউনিজম বিশ্বকে একক সাম্যবাদী রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করার ইংগিত দিয়েছে। রাষ্ট্রীয় শোষণ– মানুষে মানুষে শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে কমিউনিজম কঠোর ব্যবস্থা আরোপ করেছে। উৎপাদনের যাবতীয় উপকরণ ও শোষণ-বঞ্চনা-প্রতারণা এবং সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থের হাতিয়ার 'ব্যক্তিমালিকানা স্বত্ব'কে কমিউনিজম ভেঙ্গে দেয়ার কথা বলেছে। এখানে বা এ ব্যবস্থায় মানুষের কোনো শ্রেণীপরিচয় নেই– রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রত্যেকে সম-অধিকার ভোগ করবে– প্রত্যেকে তার প্রতিভা বিকাশের পূর্ণ সুযোগ পাবে। অবৈধ প্রভাব-প্রতিপত্তি, স্বেচ্ছাচার, মানুষের ওপর মানুষের জুলুম, অত্যাচার, শোষণ ও অন্যান্য অসামাজিক-অমানবিক কার্যকলাপের মূলে কমিউনিজম কুঠার আঘাত হেনেছে। আইনের ঊর্ধ্বে কেউই নন। সবার জন্যে ন্যায় বিচারের

নিশ্চয়তাসহ সর্বপ্রকার মৌলিক মানবাধিকার যথাঃ অন্ন বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা ও চিকিৎসার নিশ্চয়তা আধুনিক সাম্যবাদ প্রদান করেছে। এক্ষেত্রেও খেলাফতের সাথে কমিউনিজমের হুবহু মিল রয়েছে।

খেলাফত ব্যবস্থার মতো আধুনিক সাম্যবাদী ব্যবস্থায় রাষ্ট্র এবং সমাজের প্রতিটি রাজনৈতিক-প্রশাসনিক স্তরে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নেতৃত্বে যাবতীয় ক্ষমতাকে বিপুলভাবে বিকেন্দ্রীকরণ করে জনগণের প্রকৃত গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করার দিকদর্শন প্রদান করেছে। সাম্যবাদী সমাজে গণতন্ত্রকে মুষ্টিমেয় সুবিধাবাদী শ্রেণী তাদের স্বার্থে ব্যবহার করার সুযোগ পায় না। কারণ মুষ্টিমেয় ধনিক-শোষক-পরজীবীশ্রেণীকে পূর্বাহ্নেই রাজনৈতিকভাবে উচ্ছেদ করা হয়। শোষিত-মেহনতি মানুষের 'গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব'কে জনসাধারণই সম্মিলিতভাবে সংহত করতে সুযোগ পায়। এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় পরিষদে সমাজের প্রত্যেকটি পেশাজীবী মানুষের প্রতিনিধিত্ব থাকার ফলে এক পেশার লোক অন্য কোনো পেশার লোকের ওপর খবরদারি শাসন শোষণ বঞ্চনা করার সুযোগ পায় না। ফলে এ সমাজে প্রত্যেকটি মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি আর্থবৈষয়িক অধিকারের নিশ্চয়তা পেয়ে থাকে। সুতরাং প্রকৃত গণতন্ত্রের অপর নামই হলো সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদ। এ জন্যে বঙ্গবন্ধুও গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।

এ ব্যতীত ইসলামের মহাসম্মেলন বা হজ্বপ্রথার মতো আধুনিক সাম্যবাদী ব্যবস্থায় 'কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল' বা 'আন্তর্জাতিক কংগ্রেস'-এর প্রচলন করা হয়েছে– সাম্যবাদী বিশ্বের একতা সাম্য মৈত্রী ভাতৃত্ব সহমর্মিতা সহযোগিতা শিক্ষা অভিজ্ঞতা জ্ঞান-বিজ্ঞান ভাবের আদান-প্রদান শান্তি নিরাপত্তা সমৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক সংহতির মাধ্যমে মানবজাতির সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে।

সুতরাং উপরোক্ত সাধারণ সংক্ষিপ্ত আলোচনা-পর্যালোচনায় ইসলাম ও মার্কসবাদ বা আধুনিক সাম্যবাদের মূল রাজনৈতিক আর্থসামাজিক ও নৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে কোনো প্রকার দ্বন্দ্ববিরোধ বা মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়নি। পর্যালোচনায় এটাই বেরিয়ে এসেছে যে, সমাজ যুগ সভ্যতার বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপটে সময়ের ব্যবধান থাকলেও মূলতঃ ইসলাম ও মার্কসবাদ একই শান্তিময় ভুবনের দিকদর্শন প্রদান করেছে। সুতরাং আজ যাঁরা ইসলাম ও মার্কসবাদের মধ্যে ধর্মের তন্ত্রমন্ত্র ও গোঁজামিল দিয়ে আদর্শগত বিরোধ বা কোন্দল খোঁজেন এবং মার্কসবাদকে নাস্তিকতাবাদে মণ্ডিত করে 'ধর্ম গেল', 'ইসলাম গেল' বলে তারস্বরে আসর সরগরম করে তোলেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ইসলাম ও মার্কসবাদের ঐতিহাসিক ও দার্শনিক পটভূমিকা না

জেনে– বিচার-বিশ্লেষণ না করে শুধুমাত্র গোঁয়ার্তুমি গোঁড়ামি ভণ্ডামি ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বার্থ হাসিল এবং শোষণবাদী সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে এ ধরনের অবৈজ্ঞানিক অবাস্তব অযৌক্তিক অপপ্রচারে লিপ্ত হন। এরা শান্তির প্রক্রিয়াকে ধর্মের তন্ত্রমন্ত্রে ও বিভেদের বিষাক্ত থাবায় নস্যাৎ করে দেয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত হন। ইসলামকে – শান্তিকে ধর্মের দোহাই দিয়ে ভ্রান্ত ধারায় প্রবাহিত করার কার্যক্রমে লিপ্ত হন স্বৈরাচারী গণবিরোধী শাসক ও শোষকদের সমর্থনে। যে-শাসক শোষকদের পশ্চাতে রয়েছে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী শক্তি। এবং তার পদলেহী অন্যান্য শাসক-শোষক শাসিত পুঁজিবাদী বিশ্ব। অবশ্য বিনিময়ে এঁরা তাদের নিকট থেকে মোটা অংকের নজরানা পেয়ে থাকেন। এঁদের কাজই হলো যখন যাঁরা ক্ষমতায় আসেন তখনই তাঁদের সেবায় নিজেদের লিপ্ত করেন– শাসকদের গুণকীর্তন করে থাকেন শুধুমাত্র আত্মস্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে। আর যাঁরা এই সব 'যখন যেমন তখন তেমন' স্তাবকদের এবং তাঁদের প্রভু স্বৈরাচারী শাসক-শোষকগোষ্ঠীর সমালোচনা করেন তখন তাঁরা (স্তাবকরা) তাঁদের (সমালোচনাকারীদের) সাথে যুক্তিতর্কে টিকতে না পেরে এবং নিজেদের খাছিলত ঢাকা দেয়ার জন্যে তাঁদেরকে 'নাস্তিক', 'ইসলামের শত্রু' ইত্যাদি খেতাবে ভূষিত করে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষের অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে নিজেরা দূরে বসে তামাশা দেখেন। গণমানুষের ন্যায্য দাবিকে নস্যাৎ করার হীনলক্ষ্যে শাসক-শোষকদের ইংগিতে দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধিয়ে দিয়ে শাসকগোষ্ঠীকে স্বৈরতন্ত্র চালাবার কাজে সহায়তা দিয়ে থাকেন। ইসলাম ও ধর্মকে হাতিয়ার করেই এঁরা নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করে থাকেন– মানুষের স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক মুক্তিকে খর্ব করার কাজে লিপ্ত হন। এর প্রমাণ আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে। এরাই হলেন আমাদের মতো সমাজের আলেম বা পুরোহিতশ্রেণীর একটি বিরাট অংশ, সাংবাদিক-সাহিত্যিক-শিক্ষক-রাজনীতিবিদ-অর্থনীতিবিদ প্রভৃতি শ্রেণীর একটি ক্ষুদ্র অংশ। এক কথায় এঁদেরকে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যেই গণ্য করা হয়ে থাকে।

এ প্রসঙ্গে আমরা বলতে চাই যে, 'ইসলাম' এবং 'ধর্ম' মূলত একটি একক বিষয় নয়। এ দুটি বিষয়ের মধ্যে রয়েছে আকাশ-পাতাল ব্যবধান, তেমনি এ দুটি শব্দের অর্থও ভিন্নতর। মুক্তমন নিয়ে এ বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করলে এর অন্তর্নিহিত ভাবধারা সহজেই অনুধাবন করা যেতে পারে।

'ইসলাম' হলো একটি শান্তিময় জীবনব্যবস্থার দিকদর্শন। এর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ও

আর্থবৈষয়িক জীবনের প্রেক্ষাপট। অর্থাৎ দৃশ্যমান বস্তুজগতের দ্বন্দ্বমূলক কার্যকরণের প্রেক্ষিতে মানুষের সহজাত রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সাংবিধানিক কার্যক্রমের মাধ্যমে মানুষের হইজাগতিক কল্যাণসাধনই ইসলামের মূল আদর্শ ও লক্ষ্য। এটাকে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক জীবনব্যবস্থার দিকদর্শনও বলা যেতে পারে। সুতরাং বস্তুবাদের দ্বন্দ্ববাদভিত্তিক মানবসমাজের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যেই ইসলাম আবির্ভূত হয়েছিল মহানবীর নেতৃত্বে ধর্মভিত্তিক বা আধ্যাত্মিকতাভিত্তিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ ব্যবস্থা তথা সামন্তবাদী স্বৈরতান্ত্রিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে একটা সর্বাত্মক বিপ্লব হিসেবে। এই ধর্ম ও শোষণভিত্তিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ ব্যবস্থাকেই 'আইয়্যামে জাহেলিয়াতে'র যুগসমাজ বলে ইসলামের ইতিহাসে উল্লেখিত হয়েছে।

আর 'ধর্ম' হলো আধ্যাত্মিক অতিপ্রাকৃতিক অদৃষ্টবাদী বিষয়। এই ধর্মভিত্তিক আধ্যাত্মিকতাবাদের ধূম্রজালে সৃষ্ট শোষণ ও কুসংস্কারের বিষবাষ্পে তদানীন্তন আরবীয় সমাজ ও এর মানবগোষ্ঠী অধঃপতনের শেষধাপে নেমে নানান অরাজকতা ও বীভৎসতার তিমিরে হাবুডুবু খাচ্ছিল বলেই এর বিরুদ্ধে বিপ্লব অনিবার্য হয়ে ওঠে। মহানবী 'ইসলাম'-এর নামে এই বিপ্লব ঘটান। তৎকালীন প্রচলিত ধর্মীয় রাজনৈতিক আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা এবং এর ধারক-বাহক-চালক সামন্তবাদী স্বৈরতান্ত্রিক শাসক-শোষক-ধর্মযাজক-পুরোহিত-মোল্লাদের অমানবিক স্বৈরাচার শোষণ প্রবঞ্চনা প্রতারণা শঠতা নিষ্ঠুরতা অত্যাচার উৎপীড়ন ও নির্যাতনের কবল থেকে শোষিত নিগৃহীত নির্যাতিত ব্যাপক দাসমানবগোষ্ঠীকে মুক্ত করার লক্ষ্যেই ইসলামী সাম্যবাদী বিপ্লব পরিচালিত হয়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কেতাবীধর্মের অনুসারী পরিবার থেকে আগমন করে সেই কেতাবীধর্ম ও এর বাহক-ধারক শাসক ও মোল্লাতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবে অবতীর্ণ হওয়ের জন্যে যে বৈপ্লবিক মানসিকতার পরিচয় মহানবী প্রদান করেছেন তা ভাবলে সত্যিই আশ্চর্য হতে হয়। তবে এ কথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, মহানবী তৎকালীন সামাজিক পারিপার্শ্বিক বাস্তব অবস্থা ও ধর্মীয় ভাববাদী চিন্তায় মোহাচ্ছন্ন মানুষের মানসগত প্রভাবকে সম্পূর্ণভাবে দ্রবীভূত করতে পারেননি বলেই তিনি তাঁর ধর্মমতের ভেতরে সাবেক সমাজ ও ধর্মের ভাববাদী বৈশিষ্ট্যসমূহকে যুগোপযোগী সংস্কারের মাধ্যমে সন্নিবেশিত করেছেন। এই ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার– এটাও একটা বৈপ্লবিক কার্যক্রমের অঙ্গ। যেমন বহু-ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর বা আল্লাহকে একেশ্বরবাদে রূপান্তরিত করেন। কাবাগৃহ থেকে মূর্তিগুলোকে অপসারিত

করেন। নামাজ রোজা যাকাত ও হজ্বের প্রচ্ছন্ন সংস্কার করেন, সমাজ থেকে সামন্ততান্ত্রিক শাসন-শোষণ উচ্ছেদ, যাবতীয় সম্পদে আল্লাহর মালিকানায় সমষ্টিগত মানুষের কল্যাণে আনার ব্যবস্থা করেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। এভাবেই সাবেক সমাজের শোষণমূলক ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যসমূহকে সংস্কার করে মহানবী তাঁর ধর্মমতকে সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার বিপ্লবে সহায়কশক্তি হিসেবে দাঁড় করিয়েছিলেন। তবে একথাও সত্য যে, তিনি তাঁর দর্শন জবরদস্তিমূলক মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেননি, বরং যারা তাঁর চিন্তাধারা গ্রহণ না করে নিজেদের পছন্দ মতো ধর্ম পালনে প্রবৃত্ত ছিল, তাদেরকে তা স্বাধীনভাবে পালনের অধিকার প্রদান করেছেন।

এ প্রসঙ্গে কোরআনের ঘোষণা প্রণিধানযোগ্য। বলা হয়েছে– 'যার যার ধর্ম তার তার কাছে'– 'ধর্মের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই'– 'কোন ধর্ম সঠিক, কোন ধর্ম বেঠিক তা নির্ণয়ের ভার আল্লাহর ওপর।' এ ব্যতীত পবিত্র কোরআনে আরো বলা হয়েছে– 'মুসলমান খ্রিস্টান ইহুদি সেবিয়ানস মেজিয়ানস পলিথ্যিস্ট এবং অন্য যে কেউ যিনি এক আল্লাহ ও শেষ বিচারের দিনে বিশ্বাস স্থাপন করেন, সৎপথে চলেন, তাদের কোনো ভয় নেই, অবশ্যই আল্লাহ তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন।' সুতরাং পবিত্র কোরানের এ জাতীয় ঘোষণার প্রেক্ষিতে কেউ কি বলতে পারেন, কোন ধর্ম সঠিক, কোন ধর্ম আল্লাহর প্রিয় বা আল্লাহর সৃষ্টি? তাই এ দৃষ্টিতে ধর্ম নিয়ে হইচই বাচ্সা বাড়াবাড়ি আর আসর সরগরম করার কোনোই অবকাশ নেই।

মহানবীর আবির্ভাবকালীন সময়ে মক্কা-মদিনা, তৎসন্নিকটাঞ্চল ও পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধর্মমত প্রচলিত ছিল। এসব ধর্মগুলোর কোনো কোনোটি একেশ্বরবাদ ও কোনো কোনোটি বহু-ঈশ্বরবাদ ভাবধারায় নানান দেব-দেবী বা 'টোটেম'প্রতীকে গড়ে উঠেছিল। এসব ধর্মসমূহের ধারক-বাহক-চালক পুরোহিত যাজক ও মোল্লারা আধ্যাত্মিকতাবাদের ধূম্রজালে সমাজের ব্যাপক অজ্ঞ দুর্বল মেহনতি দাসমানবগোষ্ঠীকে আচ্ছন্ন করে তাদের প্রভু-পৃষ্ঠপোষক সামন্তবাদী স্বৈরতান্ত্রিক শাসক-শোষকদের নিত্যনৈমিত্তিক কার্যকলাপকে নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে চালিয়ে যাওয়ার জন্যে নানান ধর্মীয় নীতিমালা ও ঈশ্বরের দোহাই পেড়ে ফতোয়া জারি করে নিজেদের সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করে আসছিল। যাঁরা এ ধর্ম ও শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং শোষিত মানুষের মুক্তির কথা বলতো তাঁদেরকে এসব ধর্মের ধারকদের সুপারিশে রাজা-বাদশা-সম্রাট-সামন্তপ্রভুরা নির্মমভাবে হত্যা করতো। অন্যান্যের মধ্যে হযরত ঈসাকেও ধর্মীয় পুরোহিতশ্রেণীর সুপারিশে তৎকালীন রাজার হুকুমে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়।

ধর্ম ও আল্লাহ বা ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে এসব ধর্মীয় ধারক-বাহকশ্রেণী সাধারণ অজ্ঞ দুর্বল মেহনতি দাসমানবগোষ্ঠীকে এভাবেই বুঝাতো যে, রাজা বাদশা সম্রাট প্রভু মনিবরাই আল্লাহর প্রতিনিধি, তাদের যা কিছু কার্যকলাপ তা আল্লাহর দিক থেকে জায়েজ, রাজা-প্রজা, প্রভু-দাস আল্লাহর সৃষ্টি, রাজা-প্রভুদের সেবা করার ভেতর দিয়েই আল্লাহকে সেবা করা হয়! রাজা-প্রভুদের প্রতি তাদের ফতোয়া : প্রজা-দাসদের সবকিছুই তোমার জন্যে হালাল, জায়েজ, তুমি তোমার ইচ্ছা পূরণ করো। এসবের প্রমাণ আমরা পাই মহাভারত থেকেও।

এভাবেই কেতাবীধর্মের ধারক-বাহক-চালক-পৃষ্ঠপোষক মোল্লা পুরোহিত যাজক এবং শাসক-শোষক-প্রভুদের কারসাজিতে সমাজ অধঃপতনের শেষ ধাপে নেমে নানান অরাজকতা বীভৎসতা ও পঙ্কিলতার তিমিরে নিমজ্জিত হয়েছিল, সমাজের সাধারণ অজ্ঞ দাসমানবগোষ্ঠী তাদের কবলে পতিত হয়ে শোষিত লাঞ্ছিত অত্যাচারিত নির্যাতিত প্রতারিত হচ্ছিলো এবং ধুকে ধুকে মরছিল। এক কথায় প্রচলিত ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার কাঠামোই ছিল নিষ্ঠুর স্বৈরাচার ও নির্মম শোষণের প্রধানতম হাতিয়ার।

এই ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থাকে চূর্ণবিচূর্ণ করার লক্ষ্যেই মহানবী এক বৈপ্লবিক ব্যবস্থার উত্তরণ ঘটালেন আরবীয় সমাজের বুকে। ঐ কেতাবী ধর্ম বা প্রচলিত ধর্মের মোল্লাতান্ত্রিক চক্র ও সামন্তবাদী স্বৈরতান্ত্রিক শাসক-প্রভু-শোষকদেরকে সমাজের বুক থেকে সমূলে উচ্ছেদ করে ব্যাপক শোষিত নিষ্পেষিত অত্যাচারিত অজ্ঞ মেহনতি দাসমানবগোষ্ঠীর সার্বিক মুক্তি-স্বাধীনতা সাম্য মৈত্রী কল্যাণ সমৃদ্ধি ও ভাগ্যোন্নয়নের মহান লক্ষ্যেই ইসলামের বিপ্লব তথা শোষণহীন সাম্যবাদী সমাজ বিপ্লবের আহ্বান মহানবীর বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল। এ বিপ্লব শুধু আরবের মানুষের জন্যে নয়, সমগ্র মানবজাতির মহাশান্তি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যেও। এ কারণেই ইসলামের অপর নাম 'শান্তি'। এ শান্তি জনগণাকাঙ্ক্ষিত সামাজিক সর্বাত্মক বিপ্লবের মাধ্যমে অর্জন করতে হয়....হয় শান্তিপূর্ণ উপায়ে অথবা রক্তপাতমূলক দুঃখজনক ঘটনার মাধ্যমে। কিন্তু গণবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শোষকসমাজ শান্তিপূর্ণ প্রক্রিয়ার পথে আসে না। তার প্রভাবপ্রতিপত্তি শাসন শোষণ তথা কায়েমী স্বার্থকে প্রবহমান ও টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে সে-ই প্রথম জবরদস্তি অত্যাচার নির্যাতন হিংসা ও রক্তপাতের আশ্রয় গ্রহণ করে। আর প্রকৃত বিপ্লবীরা শোষকসমাজের চাপিয়ে দেয়া জঘন্য কার্যকলাপকে প্রতিরোধ করতে চায়– আত্মরক্ষামূলক প্রত্যাঘাত হানে মাত্র। তবে শেষাবধি বিপ্লবীদেরও রক্তপাতমূলক পন্থায় অগ্রসর হতে হয়। এর

জন্যে যতটুকু রক্তপাতের প্রয়োজন ততটুকুই ঝরায়, যতটুকু ভাঙার প্রয়োজন ততটুকুই ভাঙে। এর বেশি নয়। এটাই প্রকৃত বিপ্লবের অন্যতম লক্ষ্য।

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে প্রকৃত বিপ্লবের কার্যকারণে অনিবার্যভাবেই মহানবীকে আমরা আত্মরক্ষামূলক রক্তাক্ত বিপ্লবের মধ্যে দেখতে পাই। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে বদর ওহুদ খন্দক প্রভৃতি রক্তাক্ত যুদ্ধ। তিনি প্রথমে আঘাত হানেননি। প্রতিক্রিয়াশীল শাসক-শোষকরা হিংসা ও রক্তপাতের হোলিখেলা চাপিয়ে দিয়েছিল বলেই তাঁকেও আত্মরক্ষামূলক রক্তপাতের আশ্রয় নিতে হয়েছিল ব্যাপক মানবগোষ্ঠীর সার্বিক মুক্তি, কল্যাণ, সমৃদ্ধি ও শান্তির লক্ষ্যে– একটি সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। মানবজাতির সামগ্রিক ইতিহাসে মহানবীর ইসলামী বিপ্লব হলো একটি সর্বপ্রথম সর্বাত্মক বিপ্লব। এই বিপ্লবের খরস্রোতে তৎকালীন সামন্তবাদী স্বৈরতান্ত্রিক শাসক-শোষক ও ধর্মব্যবসায়ীচক্র ভেসে যায়, প্রতিষ্ঠিত হয় মানবজাতির ইতিহাসে একটি বাস্তবভিত্তিক সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা। ইসলামের সফল বিপ্লবের পরে এ পর্যন্ত আরেকটি সফল সর্বাত্মক সাম্যবাদী সমাজ বিপ্লবকে আমরা প্রত্যক্ষ করি। সেটা হলো 'রুশ বিপ্লব', মহামতি লেনিনের নেতৃত্বে মার্কসীয় দর্শনকে ভিত্তি করে। এ কথাটা প্রখ্যাত মার্কিন গবেষক এইচ. জি. ওয়েলসও স্বীকার করেছেন বিপ্লবের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে।

ধর্ম যাতে সামাজিক সমষ্টিগত মানবজীবনে অনৈক্য সংঘাত হানাহানি ইত্যাদি সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্যে ইসলাম ধর্মকে ব্যক্তিজীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার পক্ষপাতি। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট আভাষ রয়েছে, যেমন 'লা একরা হা ফি দ্বীন'– 'লা কুম দ্বীনাকুম ওয়ালী এদ্বীন'। অর্থাৎ 'ধর্মের ব্যাপারে জবরদস্তি নেই'– 'যার যার ধর্ম তার তার কাছে'। অর্থাৎ ইসলাম সামাজিক রাজনৈতিক অঙ্গনে ধর্মকে নিরপেক্ষ রাখার কথা বলেছে। কারণ সামাজিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও পরিশ্রম ব্যতীত অন্য কোনো উপায়ে মানুষের গণতান্ত্রিক ও মৌলিক মানবাধিকার তথা মানুষের জাগতিক সুখ-শান্তি কল্যাণ সমৃদ্ধি ও ভাগ্যোন্নয়ন নিশ্চিত হতে পারেনি বা পারে না। এজন্যে পবিত্র কোরআনও সমষ্টিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানুষের ভাগ্য গড়ার কথা বলেছে, যেমন 'যে জাতি ভাগ্যোন্নয়নের জন্যে প্রচেষ্টা চালায় না– আল্লাহ সে-জাতির ভাগ্যোন্নয়ন করেন না।' এই যে জাতিগত ভাগ্যোন্নয়ন প্রচেষ্টার কথা– এর সাথে জড়িয়ে আছে মানুষের সংঘবদ্ধ সামাজিক রাজনৈতিক কার্যক্রমের প্রশ্ন এবং পরিশ্রম, ধর্ম নয়। এ ব্যতীত মানুষের আকৃতি-প্রকৃতি, তার জাগতিক অবস্থান এবং জীবনযাপনের প্রেক্ষাপট– সবকিছুর অন্তরালে রয়েছে প্রচেষ্টা সংগ্রাম ও পরিশ্রমের

ফলশ্রুতি। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনও বলেছে, 'We have created Man into toil and struggle.' অর্থাৎ আল্লাহ বলেছেন, 'আমি মানুষকে সংগ্রাম ও পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করেছি।' তাই সংগ্রাম ও পরিশ্রমই মানুষের অস্তিত্বের পূর্বশর্ত। এই সংগ্রাম প্রচেষ্টা পরিশ্রম তাই হতে হবে সমষ্টিগত সামাজিক রাজনৈতিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে, ভাগ্যের ওপর... তথাকথিত আধ্যাত্মিককর্মের ওপর নির্ভর করে নয়।

তাই ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে মানবসমাজের সার্বিক ভাগ্যোন্নয়ন কল্যাণ সমৃদ্ধি সুখ শান্তি ঐক্য সাম্য মৈত্রী ভাতৃত্বকে সুসংহত করার লক্ষ্যে সামাজিক রাজনৈতিক কার্যক্রমের ওপর ইসলাম গুরুত্বারোপ করেছে। 'ধর্ম' যেহেতু শোষণ বঞ্চনা প্রতারণার হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে, মানুষের ভাগ্যোন্নয়নকে 'নসীবে'র ওপর সমর্পণ করেছে এবং সমাজের বুকে সাম্প্রদায়িক শ্রেণীবিভেদের উদ্ভব ঘটিয়ে সমষ্টিগত মানুষের ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছে, সেহেতু ধর্মকে সামাজিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে কোনোপ্রকারেই টেনে আনা যাবে না এর ইতিহাস চরিত্র এবং কার্যকারণের প্রেক্ষিতে। ইসলামের তাৎপর্য পর্যালোচনা করলেই এ কথার প্রমাণ পাওয়া যাবে। ইসলাম মনে করে যে, ধর্ম মানুষের নিজস্ব ব্যাপার। কার্ল মার্কস ধর্মকে আফিমের সাথে তুলনা করেছেন। বঙ্গবন্ধু এই আফিম যাতে সামাজিক রাজনৈতিক আর্থবৈষয়িক সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে কলুষিত করতে না পারে, তজ্জন্যে ধর্মকে নিরপেক্ষ রাখার আইন করে দিয়েছিলেন।

সুতরাং উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনাদৃষ্টে প্রমাণিত হয়েছে যে 'ইসলাম' ও 'ধর্ম' একক কোনো বিষয় নয়। এর অর্থ ভিন্নতর এবং একের সাথে অপরের কার্যক্রমও সম্পূর্ণ আলাদা, অর্থাৎ দুটি পরস্পরবিরোধী বিষয়।

আরো একটি প্রসঙ্গ এখানে আলোচনা করা প্রয়োজন। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে 'যে জাতি তার ভাগ্যোন্নয়নের জন্যে প্রচেষ্টা চালায় না– আল্লাহও সে-জাতির ভাগ্যোন্নয়ন করেন না'– এ প্রেক্ষিতে মুসলমান ধর্মীয় অঙ্গনের একটি 'বিশেষ রাতে'র কথা বলা প্রয়োজন। ধর্মীয় মতে এই বিশেষ রাতকে 'ভাগ্য নির্ধারণের রাত' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ঐ বিশেষ রাতে মানুষ তাঁর মহাপ্রভুর কছে ভাগ্যোন্নয়নের প্রার্থনা করে থাকে। অথচ পবিত্র কোরআনের কোথাও 'শবে বরাত' বা ভাগ্যোন্নয়নের রাতের কোনো কথা নেই। পবিত্র কোরআনে যা বলা হয়েছে তার অর্থ হলো জাতিগতভাবে বা সম্মিলিতভাবে কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন সাধন। কারণ জাতীয় উন্নয়ন মানেই ব্যক্তিরও উন্নয়ন। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, আল্লাহর বিধানে মানুষের কোনো শ্রেণী বা গোষ্ঠী পরিচিত নেই। এখানে 'জাতি'

বলতে সমগ্র মানুষের কথা বলা হয়েছে। 'জাতি' বলতে কোনো ব্যক্তিবিশেষ, পরিবার, বিশেষ শ্রেণী বা গোষ্ঠীকে বুঝায় না। সুতরাং ব্যক্তিবিশেষের ভাগ্যোন্নয়নের কথা পবিত্র কোরআন বলেনি। একটি বিশেষ রাত বা দিন বা সময় জাতিগত ভাগ্যোন্নয়নের প্রচেষ্টার সাংগঠনিক বা নিয়ম-শৃঙ্খলা বা শপথ বা পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্যে প্রয়োজন রয়েছে। এ চিন্তাধারার সাথে প্রচলিত শবেবরাত বা ভাগ্যোন্নয়নের রাতের কোনোই সংগতি নেই। সামাাজিক রাজনৈতিক সাংগঠনিক প্রচেষ্টাকে বাদ দিয়ে অবাস্তব আধ্যাত্মিক নসীবীয় নিষ্ফল কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে সোনার হরিণ ধরার মহড়া আবিষ্কার করা হয়েছে 'শবেবরাত'কে কেন্দ্র করে। এই শবেবরাত মানুষকে তার ভাগ্যোন্নয়নের প্রচেষ্টার পথ থেকে সরিয়ে এনে নসীবের ওপর নির্ভরশীল করে মানুষকে কর্মবিমুখ পরনির্ভরশীল করে তোলে।

পবিত্র কোরআন মানুষকে সম্মিলিতভাবে কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের ভাগ্যোন্নয়নের কথা বলেছে। তাই এ প্রেক্ষিতে বলা অসংগত হবে না যে, আল্লাহ ব্যক্তিমানুষের ভাগ্যোন্নয়ন করেন না। আর ব্যক্তিমানুষের কাকুতি মিনতি প্রার্থনায়ও সাড়া দেন না, যে প্রক্রিয়ায় বক্তি নিজেকে আল্লাহর ওপর সমর্পণ করে থাকে।

আল্লাহতায়ালা যদি প্রকৃতই ব্যক্তিমানুষের বা ব্যক্তিবিশেষের ভাগ্যোন্নয়ন করে থাকেন এবং বুক ফাঁটা কান্নার কাকুতি মিনতিই যদি আল্লাহর রহমত বর্ষণের নিশ্চয়তা হয়ে থাকে, তাহলে শবেবরাতী কার্যপ্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে এতদিনে পৃথিবীতে একটি অভুক্ত দরিদ্র মানুষ খুঁজে পাওয়া যেত না; 'দারিদ্র্য' নামক ব্যাধিটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। ঐ বিশেষ রাতে এত যে মানুষ আল্লাহর দরবারে মাথা গুঁতিয়ে, করজোড় উঠিয়ে, অশ্রুজলে বুক ভাসিয়ে তার, তার পরিবারের সুখ শান্তি কল্যাণ সমৃদ্ধির প্রার্থনা করে, ক্ষুধা অভাব রোগ শোক দরিদ্রতা মোচনের প্রার্থনা যাঁচে– তাতে করে কি তার এবং তার পরিবারের সার্বিক ভাগ্যোন্নয়ন হয়ে 'দারিদ্র্য' নামক অভিশাপটি ঘুঁচেছে? খুঁচেনি। আল্লাহ এমনতর কর্মপ্রচেষ্টাহীন অনুৎপাদনশীল অবাস্তব প্রক্রিয়ার প্রতি নিজেই অনাস্থাশীল বলেই হয়তো পৃথিবীতে ভুখানাঙ্গা অভাবী দরিদ্রের সংখ্যা তথা দারিদ্র্যের অভিশাপটি মানব সমাজের বুকে অক্টোপাসের মতো বেঁধে আছে। দারিদ্র্যের বাঁধন দিনে দিনে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রায় ছয়শত কোটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে বেশির পক্ষে একশত কোটি মানুষকে স্বচ্ছল বলে ধরে নিলেও বাকি পাঁচশত কোটি মানুষ চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করে ক্ষুধা অপুষ্টি রোগশোক অভাব ও দরিদ্রতার অভিশাপে জর্জরিত হয়ে মানবেতর জীবনে ধুকে ধুকে মরছে।

তাদের আশা নেই, ভাষা নেই, স্বপ্ন নেই, সাধ নেই! সুতরাং এক্ষেত্রে শবেবরাতীর তাৎপর্য ও কার্যকারিতা কোথায়? কোথায় বুক ফাঁটা আর্তনাদ এবং অশ্রুসজল কান্নার কাকুতি মিনতির পুরস্কার? কেউ জবাব দেবেন কি? হয়তো কেউ কেউ বলবেন, দুনিয়াটা পাপে ভরে গেছে, মানুষ আল্লাহকে ভুলে গেছে, তাই এখানে আল্লাহর গজব নাযেল হয়েছে। সুন্দর মিষ্টি কথা। তবে কি যতো পাপ, যতো অন্যায়, আল্লাহকে ভুলে যাওয়া ইত্যাদি কার্যকলাপে এই পাঁচশত কোটি লোকই লিপ্ত রয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে এদের ওপর আল্লাহ নাখোশ হয়ে গজব নাযেল করেছেন? আর ঐ একশত কোটি লোক, তারা কি তিনধোয়া তেঁতুলের বিঁচি, পুণ্য করে চলেছেন, আল্লাহকে মেনে চলেছেন, ন্যায় ও সত্যের রাস্তায় রয়েছেন? সৎপথে, সৎশ্রমে এবং মানবিক নীতিতে নিজেদের পরিচালিত করছেন? এই যে একশত কোটি লোক– এদের মধ্যের একটি ক্ষুদ্র অংশ, এরা কারা? কী এদের পরিচয়? এদের কাজটা কী?

বঙ্গবন্ধু বলেন : "শোষকসমাজের তাবেদার কথাকথিত ধর্মীয় মোল্লা পুরোহিত যাজকশ্রেণী শোষকসমাজকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে আল্লাহর বাণী ও নির্দেশের অপব্যাখ্যা করে তারা তাদের সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সংহত করে চলেছে। এদের সাথে যোগ দিয়েছেন এক শ্রেণীর তথাকথিত বুদ্ধিজীবী– যারা শোষকসমাজকে রক্ষা করার জন্যে থিওরি-প্রদান করে থাকেন, বিনিময়ে শোষকদের নিকট থেকে তারাও নজরানা পেয়ে থাকেন। শোষকসমাজের তাবেদার এজেন্ট এসব চক্রদের শঠতা প্রতারণা মিথ্যাচার ও কূটকৌশলের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে সাধারণ অজ্ঞ দুর্বল শ্রমজীবী মেহনতি মানবগোষ্ঠী সম্মিলিতভাবে ভাগ্যোন্নয়নের কার্যকর কর্মপ্রচেষ্টা গ্রহণ করতে পারে না। কারণ সমাজের যাবতীয় উৎপাদন ব্যবস্থা ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় আইনের বেড়াজালে গুটিকতক মানুষের ব্যক্তিমালিকানায় ন্যস্ত হয়েছে, ফলে উৎপাদন ব্যবস্থা তাই এই গুটিকতক শক্তিশালী বিজ্ঞ শিক্ষিত ধনিক শাসক-শোষকগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হচ্ছে। আর উৎপাদনের অন্যতম প্রধান উপকরণ সমাজের ব্যাপক শ্রমজীবী মেহনতি অজ্ঞ দুর্বল সর্বহারা মানবগোষ্ঠী মালিকদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে, তাদের শ্রম শোষণ করে শোষকশ্রেণীর ভাগ্য গড়ে উঠেছে; সম্পদে বৈভবে সুখ শান্তি কল্যাণ সমৃদ্ধির আলোকে তারা আলোকিত হয়ে উঠেছে। যে ব্যক্তিমালিকানার বদৌলতে গুটিকতক মানুষের ভাগ্য ফুলেফেঁপে উঠেছে– সেই ব্যক্তিমালিকানাকে পবিত্র কোরআন না-জায়েজ করে দিয়েছে এই বলে যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু সম্পদ রয়েছে তার

সবকিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ। অবশ্য মানুষকে এসব সম্পদের হেফাজতকারীর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। এই 'হেফাজতকারী' শব্দটি 'মালিক'-এ রূপান্তরিত করা হয়েছে ধর্ম ও রাষ্ট্রীয় আইনের বদৌলতে। সুতরাং ব্যক্তিমালিকানার অনিবার্য পরিণতি শোষণ ও দুর্নীতিকেও একইভাবে প্রকারান্তরে জায়েজ করে নেয়া হয়েছে। মেহনতি অজ্ঞ দুর্বল মানবগোষ্ঠী এতসব দার্শনিক কথা বুঝতে সুযোগ পায় না। তাদের মাথার ভেতরে ধর্মের বাণী এমনভাবে গেঁথে গেছে যে, তারা এর বাইরে চিন্তা করার অবকাশ পায় না। যাঁরা এসব নিয়ে ভাবেন, চিন্তা করেন, প্রচার করেন– অমনি শোষকসমাজের তাবেদারগোষ্ঠী তাঁদেরকে নাস্তিক, ধর্মের শত্রু, আল্লাহর দুশমন, সমাজদ্রোহী, রাষ্ট্রদ্রোহী, বিদেশী রাষ্ট্রের এজেন্ট ইত্যাকার খেতাবে ভূষিত করে তাদের জীবনকে বিপন্ন করে তোলে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রাণে বধও করে ফেলা হয়। ফলে মেহনতি অজ্ঞ মানবগোষ্ঠী অতি সহজেই ধর্মীয় বাগাড়ম্বরের মধ্যে ডুবে যায়, তাদের যা কিছু চিন্তাধারা– সবকিছুকে ঈশ্বরের বা আল্লাহর লীলাখেলা বা কপালের লিখন বলে সান্ত্বনা খুঁজে নিতে চায়। তবে তাদের মনে তবুও একটা অব্যক্ত প্রশ্ন থেকে যায়।"

এই যে সাধারণ মেহনতি শ্রমজীবী অজ্ঞ শোষিত সর্বহারা মানুষ... তাদের প্রাত্যহিক জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অভাব-দারিদ্র্য-ক্ষুধা ইত্যাদি মোচন হয় না, এর জন্যে তারা সরাসরি আল্লাহকেই দায়ী করে থাকে, তাঁরই দরবারে তাদের ফরিয়াদ জানায়। এতো যে কঙ্কালসার ক্ষুধিত মানবাত্মার আর্তি কাকুতি-মিনতি-প্রার্থনা তাঁর দরবারে– তবুও তাদের ভাগ্যোন্নয়ন হচ্ছে না, তিনি তাদের ডাকে সাড়া দিচ্ছেন না। তখন প্রশ্ন জাগে, এতো দয়ালু, এতো মহানুভব, এতো যে মহাক্ষমতাধর, এতো যে মহান্তরযামী– যিনি পাহাড়কে সাগর করতে পারেন, সাগরকে মরুভূমি করতে পারেন ইত্যাদি ইত্যাদি সবকিছু করতে পারেন বলে ধর্ম তাঁর যে মাহাত্ম্য জাহির করেছে, কোথায় সেই তিনি, প্রকৃতই কী তিনি, কিসের এবং কার জন্যে তিনি? একজনকে হাসিয়ে, লক্ষজনকে কাঁদিয়ে কী সুখ পান তিনি? এ কেমনতর লীলাখেলা?

অনেক দুষ্ট লোকেরা (!) তাই প্রায়শই ঠাট্টাচ্ছলে বা নির্মম দরিদ্রতার কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে আক্ষেপ করে বলেন, 'ঐ রাতে আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাদের ডেকে প্রথমে পৃথিবীর রাজা বাদশা সম্রাট– হেনরি ফোর্ড, রকফেলার, ওনাসিস, আগাখান, আদমজী, দাউদ, ইস্পাহানী, হাবিব, বাওয়ানী, হারুন, টাটা, বিড়লা, অশোক ভাই, আগরওয়াল, সায়গল, জহিরুল ইসলাম প্রমুখ বৃহৎ ধনিক পরিবার বা ধনিক বণিক পুঁজিপতি ও

শিল্পপতিদের ভাগ্যোন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। ফেরেশতা সাহেব, হিসাবরক্ষক কেরানীরা খাতা-কলম নিয়ে হিসেব-নিকেশে বসে গেল। তাদের সম্পদ ও যোগাযোগের ফিরিস্তি এতোই ব্যাপক যে, তার সব কিছু সাজিয়ে যেতেই দেখা গেল রাত ফুরিয়ে যাচ্ছে। তখনো প্রায় ৯৫% ভাগ মানুষের ভাগ্য লিখতে বাকি। ফেরেশতারা তখন দৌড়ে গিয়ে আল্লাহকে বলেন, ইয়া আল্লাহ, রাজা বাদশা সম্রাট ও বৃহৎ ধনিকদের ভাগ্য লিখতেই যে বেলা উঠে গেল, এখনো যে ৯৫% ভাগের ভাগ্য লিখতে বাকি। আল্লাহ তখন তাঁর ধ্যান ভেঙে চমকে ওঠেন, তাই তো! এখন কী করি! তারপর মহাহুঙ্কার ছেড়ে বলে ওঠেন, ওহে ফেরেশতাগণ, তোমরা লিখে দাও, যারা গত বছর যে পজিশনে এবং যে হারে ধনিক ছিল তারা আরো সুদৃঢ় পজিশনে ও আরো ধনসম্পদের মালিক হবে, আর বাকিগুলোর ভাগ্যে লিখে দাও, গতবারে যা ছিল এবারেও তাই। তখন ফেরেশতা আমলা সাহেবরা ৯৫% ভাগের সম্পর্কে থার্ড্‌ব্রা কেটে লালকালিতে লিখলেন, 'যেমন ছিল তেমন।'

এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর ব্যাখ্যা : "এভাবেই শোষকসমাজ ও তার তাবেদার ধর্মব্যবসায়ী বুদ্ধিজীবীশ্রেণী আল্লাহর মহান বাণীকে অপবিত্র ও ভ্রান্তধারায় প্রবাহিত করে শোষণ ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে সীমাহীন ব্যক্তিসম্পদ ও ব্যক্তস্বার্থ চরিতার্থ করে চলেছে। তাঁর বাণী ও আদেশের অপব্যাখ্যা করে যাবতীয় অবিচার ও অসংগতি অত্যাচার নির্যাতন শোষণ বঞ্চনা শঠতা প্রতারণা ইত্যাদি কার্যকলাপকে ধর্মের নামে আল্লাহর দোহাই দিয়ে জায়েজ করা হয়েছে। এমনকি রক্তপাত, হত্যাকাণ্ড, ব্যভিচার, ধ্বংসযজ্ঞ ইত্যাদি কার্যকলাপকেও এ গোষ্ঠী সমর্থন করে থাকে। আর এই বকধার্মিক গোঁড়া সংস্কারবাদী– ধূর্ত কপট শঠ– এদের খপ্পরে পড়ে সমাজের অজ্ঞ দুর্বল নিরীহ মেহনতি শ্রমজীবী সহজ সরল সর্বহারা মানবগোষ্ঠী তাদের নিত্যজীবনের যাবতীয় দুর্বিপাক-দারিদ্র্য-অভাব ও ক্ষুধাকে ভাগ্যের লিখন বা পরিণতি বলে সান্ত্বনা খুঁজে নিয়ে প্রকারান্তরে আল্লাহকেই দোষারোপ করে চলেছে। আল্লাহ যে সমষ্টিগত সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে ভাগ্যোন্নয়নের সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, তা তারা বুঝতে পারে না তাদের সামাজিক আর্থবৈষয়িক জীবনের প্রভু বা নিয়ন্ত্রক এই শোষকসমাজ ও এর তাবেদারগোষ্ঠীর কূটকৌশলের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে।"

ধর্ম মূলতঃ মিথ্যাচার নিষ্ঠুরতা প্রতারণা শোষণ ও স্বৈরশাসনের একটি কার্যকরী হাতিয়ার। এ কারণেই দেখা যায় সমাজপতি, ধনবান, কুচক্রী অত্যাচারী শাসক-শোষকগোষ্ঠী ধর্মকে পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে। অপরদিকে এ অঙ্গনে তারাই আসে যারা মূলতঃ সমাজের প্রগতি ও সৃষ্টিশীল

কার্যক্রমে মেধা-মনীষা দিতে অক্ষম। অর্থাৎ মেধা-প্রতিভাহীন লোকগুলোই ধর্মীয় অঙ্গনে এসে থাকে। কারণ ধর্ম পালন-লালন ও সংগঠনের ক্ষেত্রে বিশেষ জ্ঞান ও শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। ধর্মগ্রন্থের কতিপয় বাক্য ও হুকুম-আদেশের কায়দা-কানুন মুখস্থ করে সেসবের ওপর নিত্যচর্চা করলেই হলো। ধর্মীয় এ গোষ্ঠীকে সমাজের জটিল ও নয়া নয়া কার্যক্রমে তথা অধ্যবসায় ও প্রযুক্তিগত কর্মকাণ্ডে কোনোই ভূমিকা পালন করতে হয় না। শাস্ত্রীয় বা ধর্মীয় কতকগুলো বৈশিষ্ট্য যেমন ধর্মগ্রন্থের অক্ষর শিক্ষা বা শুধু পড়ে যাওয়া (মানে না বুঝলেও ক্ষতি নাই), প্রার্থনার অঙ্গভঙ্গি শিক্ষা, মন্ত্র-দোয়া-দরুদ তোতাপাখির মতো শেখা, কতকগুলো আদব-কায়দা শেখা, লিঙ্গ বা অন্য কোনো অঙ্গ কর্তন বা অন্য কোনো চিহ্ন অঙ্কন, বউ গ্রহণ, বর্জন ও অন্যান্য কতকগুলো আচার-আচরণ শিক্ষার মাধ্যমেই ধর্মজীবন পালন করার মধ্যে আসলে মেধা-প্রতিভার প্রয়োজন হয় না। এজন্যেই প্রায়শই দেখা যায় যে, একটি সংসারের একজন পিতার ছেলেসন্তানদের মধ্যে যেটি গণ্ডমূর্খ, গোঁয়ার, স্কুল বা পড়ায় ফাঁকিবাজ, বেয়াদব-বেআক্কেল, বোকার হদ্দ, মেধাহীন সেটিকেই ধর্মীয় অঙ্গনে অথবা আনসার-পুলিশ-সেনাবাহিনীতে সেপাই পদে পাঠিয়ে দেয়। এসব অঙ্গনে প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান ও প্রতিভা বিকাশের তেমন প্রয়োজন হয় না। হরে কৃষ্ণ হরে রাম, হে ভগবান হে ঈশ্বর, আল্লাহুমা সল্লেআলা ও লেফ্‌ট-রাইটের মধ্যেই তাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। বিজ্ঞান প্রযুক্তি প্রগতি মানবতা তথা সমাজ-সভ্যতা ও মানুষের সার্বিক কল্যাণের বৃহত্তর কার্যক্রমে এরা একেবারেই অনুপস্থিত। শ্রম ও উৎপাদন সম্পর্কের সাথে তাদের যোগাযোগ নেই। অপরের পরিশ্রমে উৎপাদিত ফসল তারা ভোগ করে। এ কথাটা সমাজের শাসক-শোষক চক্রের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

বিশেষ করে ধর্মীয় অঙ্গনের ঐসব অশিক্ষিত মোল্লা-পুরোহিত-যাজক বিজ্ঞান প্রগতি ও মানবতাবাদী শিক্ষা থেকে দূরে অবস্থান করায় তারা হয়ে ওঠে নৃশংস-নিষ্ঠুর-হৃদয়হীন-পাষাণ। অপর দিকে ধনলোভী অত্যাচারী শাসক-শোষক-প্রতারকচক্রও শ্রমজীবী মেহনতি অশিক্ষিত মানুষের প্রতি-প্রগতিবাদী-মানবতাবাদী-জ্ঞানী-গুণীদের প্রতি অনুরূপ মননের অধিকারী। এ কারণেই ঐ ধর্মীয় নেতৃত্বের সাথে অত্যাচারী শাসক-শোষক-প্রতারকচক্রের সখ্যতা গড়ে ওঠে সহজেই। ধমীর্য় নেতৃত্ব ধর্মের ফতোয়া দিয়ে শাসক-শোষকগোষ্ঠীর কার্যক্রমকে হালাল করায়, বিনিময়ে তারাও ধর্মীয় নেতৃত্বকে নানানভাবে সাহায্য-সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে থাকে। ধর্ম ও শোষণ পরিচালনাকারী এ দুটি চক্রের মূল লক্ষ্যই হলো তাদের সংকীর্ণ

ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধার করা; ধর্মের ও প্রতারণামূলক আইন-কানুনের বেড়াজালে সমাজ-সভ্যতাকে কূপমণ্ডুকতা ও অজ্ঞানের অন্ধকারে নিক্ষেপ করে ব্যক্তিভোগ-লালসাকে চরিতার্থ করা। তাই ধর্মকে ঐ উভয় প্রতারকচক্র আঁকড়ে থাকে। বিজ্ঞান প্রযুক্তি প্রগতি ও মানবতার লেশমাত্র ধর্মের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। এ কারণেই বিজ্ঞানভিত্তিক সাম্যবাদী দর্শনে যেমন ধর্মকে স্বীকার করা হয়নি, তেমনি মোল্লা-পুরোহিত-যাজক ও শোষক-প্রতারকদেরও ঠাঁই নেই। ধর্ম ও তার ধারক-বাহক এ দুটি চক্র মূলত সকল প্রগতিবাদী সৃষ্টিশীলতার প্রধান বাধা।

ইসলামী ধর্ম দর্শনের মোল্লাসমাজ তাদের যাবতীয় কার্যকলাপের উৎস ও সমাধানে কোরআনকে শাসনতন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। অথচ আমরা জেনেছি যে মক্কা বিজয়ের পর মহানবী বহু বছর জীবিত ছিলেন, শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন, সেক্ষেত্রে তিনি কি কোরআনকে শাসনতন্ত্র হিসেবে গণ্য করতে অনুভব করেছিলেন? করলে তো তিনিই কোরআনকে লিপিবদ্ধ করে যেতেন। তাঁর মৃত্যুর অনেক বছর পর হযরত ওসমানের সময়ে তা লিপিবদ্ধ হয়। আমরা এও জেনেছি যে, কোরআনকে লিপিবদ্ধ করা নিয়েও নানান মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল। এ জাতীয় বিরোধে চারজন খলিফার মধ্যে তিনজনকে হত্যা করা হয়েছিল। সুতরাং এমন বিষয়টি নিয়েও চিন্তাশীল মানুষদের মনে নানান প্রশ্নের উদয় হওয়াই স্বাভাবিক। অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ও তাদের মহাগ্রন্থগুলোকে নিয়েও নানান প্রশ্ন রয়েছে। অতএব পৃথিবী ও মানবজাতির অগ্রগতিকে এগিয়ে নিতে হলে এসব বিভ্রান্তি থেকে পরিত্রাণ লাভ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

কেনো এই শোষক-তাবেদার শ্রেণীর নানান আইন-কানুনের সমাহার, কূটকৌশল ও ধর্মীয় ধূম্রজালের লীলাখেলা? এর কারণও সুস্পষ্ট। আর তা হলো, যাতে এই শোষিত প্রতারিত বঞ্চিত অত্যাচারিত মেহনতি শ্রমজীবী সর্বহারা মানবগোষ্ঠী তাদের অধিকার সম্পর্কে শিক্ষিত সচেতন ও একতাবদ্ধ হয়ে নিজেদের সার্বিক ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে সম্মিলিতভাবে কর্মপ্রচেষ্টা চালাতে না পরে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, শোষকগোষ্ঠী এই ব্যাপক শোষিত মানুষকে বিভক্ত করে রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, নানান সামাজিক সাংস্কৃতিক ধর্মীয় সংগঠন সৃষ্টি করে থাকে– এসব কাজে সরকার পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে শোষকসমাজের গুণকীর্তন করার লক্ষ্যে। মোট কথা শোষিত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে না দেয়াই হলো শোষকগোষ্ঠীর যাবতীয় ফন্দিফিকির। কারণ শোষিতের ঐক্যের মধ্যেই শোষক-তাবেদার শ্রেণী ও তাদের সমাজের মৃত্যুবাণ নিহিত। এজন্যে শোষক সমাজ ধর্ম,

আইন-কানুন ও আল্লাহর দোহাই দিয়ে সামাজিক রাজনৈতিক আর্থবৈষয়িক ক্ষেত্রে শোষিত মানবগোষ্ঠীকে বিভ্রান্ত করে দাবিয়ে রাখে এবং তাদের নানাভাবে বিভক্ত করে রাখে তাদের শাসন-শোষণ ও প্রভাবপ্রতিপত্তিকে টিকিয়ে রাখার হীনলক্ষ্যে। এক্ষেত্রে ধর্মব্যবসায়ী বুদ্ধিজীবীশ্রেণীই সবচে' বেশি কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে।

ধর্মব্যবসায়ী বুদ্ধিজীবীশ্রেণী শোষিত মেহনতি সর্বহারা মানুষকে এটাই বুঝাতে চায় যে, ধনী-গরিব আল্লাহরই সৃষ্টি– তিনিই ধন-দৌলত– রিজিক হায়াত-মউতের মালিক– তাঁর হুকুমে ও ইচ্ছায় সবকিছু ঘটে থাকে। তাঁর প্রশংসা করো, তাঁর কাছে প্রার্থনা করো, তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নাও। অর্থাৎ আল্লাহর ওপর সমস্ত দোষের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে শোষকসমাজ পার পেতে চায়। অথচ যা কিছু পার্থিব সম্পদসামগ্রী রয়েছে তার সবকিছুই রয়েছে শোষকসমাজের হাতে, তাদেরই প্রত্যক্ষ করায়ত্তে! আর ধর্মব্যবসায়ী বুদ্ধিজীবীশ্রেণী বলে কিনা তা চেয়ে নিতে হবে আল্লাহর কাছ থেকে! অথচ আল্লাহ বলেছেন– তিনিই সব সম্পদের মালিক, মানুষরা সেই সম্পদের হেফাজতকারী মাত্র। সেই মানুষের একটি কৌশলবাজ ধুরন্ধর ক্ষুদ্রগোষ্ঠী সম্পদে আল্লাহর মালিকানার বদলে নিজেদের মালিকানা সুসংহত করেছে আল্লাহর দোহাই দিয়ে। সুতরাং যে সম্পদ রয়েছে গুটিকতক মানুষের মালিকানার করায়ত্তে তা কিনা চেয়ে নিতে হবে আল্লাহর নিকট থেকে?

সত্যিই যদি মানুষের জীবনযাপনের যাবতীয় সম্পদসামগ্রী আল্লাহর প্রত্যক্ষ এখতিয়ারে থাকতো তাহলে মানুষ তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নিতে পারতো এবং চাওয়ার মধ্যেই যদি পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকে তাহলে তো তা পাওয়ার কথা ঐ মেহনতি সর্বহারা দরিদ্র মানবগোষ্ঠীর। কারণ তাদের মতো চাওয়ার অশ্রুসজল বুকভাঙ্গা করুণ কাকুতি-মিনতি তো শোষকসমাজ আল্লাহর দরবারে যাঁচে না। বরং তাদেরকে সর্বদাই দেখা যায় নানান কুৎসিত ব্যভিচার শোষণ অত্যাচার জোচ্চুরি না-ফরমানি বজ্জাতি– মদ, জুয়া, নারী নিয়ে মেতে থাকতে– প্রতারণা শঠতা দুর্নীতি ঘুষ কালোবাজারী চোরাকারবারী ইত্যাকার যাবতীয় মানবতাবিরোধী কার্যকলাপে স্বাধীনভাবে লিপ্ত থাকতে। এসব কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার মধ্যেই তারা আল্লাহ ও তাঁর বিধান মেনে চলেন, আর আল্লাহ তাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর রহমতের বন্যা তাদের প্রতি প্রবাহিত করে দেন.... এই কি তাহলে আমাদের বিশ্বাস করতে হবে? আমাদের কি বিশ্বাস করতে হবে যে, ঐ মেহনতি শ্রমজীবী সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ, যারা তাদের রক্ত জল করা শ্রম দিয়ে সমগ্র মানবজাতিকে বাঁচিয়ে রাখছে– যারা সীমাহীন দুঃখ দরিদ্রতার মধ্যে জীবনযাপন করেও

আল্লাহকে পৃথিবীতে টিকিয়ে রাখছে, যারা প্রতি দমেদমে আল্লাহতে বিশ্বাস রেখে তাঁকে স্মরণ করছে, তাঁর প্রশংসা করছে, যারা আল্লাহর মহানকীর্তি 'সৃষ্টি'র মধ্যে নিজেদেরকে অকাতরে বিলিয়ে দিচ্ছে, তাদের ওপরই আল্লাহ না-খোশ? আমাদের কি বিশ্বাস করতে হবে যে, সমাজের মুষ্টিমেয় শোষকদের হাতে আল্লাহই সব ধন-সম্পদ ও যাবতীয় খবরদারীর ভার তুলে দিয়েছেন শবেবরাতের মাধ্যমে? ধনদৌলত রিজিক বরকত মানসম্মান সবকিছু প্রদানের একমাত্র মালিক যদি আল্লাহই হয়ে থাকেন তাহলে এ ধরনের আরো অনেক দুঃখজনক প্রশ্ন আসা নিশ্চয়ই অমূলক নয়।

প্রকৃতপক্ষে ধর্মব্যবসায়ী বুদ্ধিজীবীশ্রেণী এ দিকেই ওকালতি করে থাকেন ধর্মের নামে আল্লাহর দোহাই দিয়ে– তাদের প্রভু শোষকসমাজের পক্ষে। তাদের ধর্মের ধূম্রজালে আবদ্ধ হয়ে সমাজের ব্যাপক অজ্ঞ মেহনতি মানুষ তাদের ভাগ্যোন্নয়নের ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারে না। আল্লাহ যে তাঁর সবকিছু মানুষের জন্যে, মানুষের কল্যাণে মানুষের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন– এ কথাগুলোকে ধর্মব্যবসায়ী বুদ্ধিজীবীশ্রেণী অন্য আবরণে-আভরণে মণ্ডিত করে ভুল পথে চালিয়ে দিয়েছে– ফলে সাধারণ মানুষ সঠিকভাবে কিছু বুঝতে পারে না। এভাবেই তাদের জীবনে নেমে এসেছে অমানিষার কালো মেঘ– অভাব ক্ষুধা হতাশা দারিদ্র্য। সুতরাং সাধারণ মানুষ যদি তাদের জীবনের দুর্বিপাকের অন্তরালরহস্য বুঝতে না পারে– উদঘাটন না করে– কার্যকরি পদক্ষেপ না নেয় তাহলে তাদেরকে চিরকাল এ দুর্বিপাকের বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে। কেউ এসে বা অবলীলাক্রমে তাদের ভাগ্যোন্নয়ন করে দিয়ে যাবে না, তাদেরকেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় তারা যে তিমিরে আছে– ক্রমান্বয়ে আরো ঘোর-তিমিরে ডুবে যেতে হবে।

পবিত্র কোরআনের বাণী পুনরুল্লেখ করতে হয় : 'পৃথিবীতে ও আকাশে যা কিছু সম্পদ রয়েছে তার একমাত্র মালিক আল্লাহ– আদমসন্তানেরা সেই সম্পদের হেফাজতকারী মাত্র।' এই যে 'হেফাজতকারী' শব্দটি– এর সুযোগ গ্রহণ করে ব্যাপক মানবগোষ্ঠীকে ধর্মের নামে বিভ্রান্ত প্রতারিত বঞ্চিত করে মুষ্টিমেয় শোষকগোষ্ঠী আল্লাহর সম্পদের একচ্ছত্র মালিক হতে চান। এবং এটা আজ নির্মম সত্য যে, মুষ্টিমেয় মানুষ সব সম্পদের মালিক সেজে বসেছেন। প্রচার করে থাকেন যে, ধন-দৌলত প্রদানের মালিক একমাত্র আল্লাহ। অথচ আল্লাহর উক্ত নির্দেশ বিশ্লেষণ করলে যা বুঝতে পারি– তা-ই আমরা দেখতে পাই মহানবীর ইসলামী সাম্যবাদ ও মার্কসীয় সাম্যবাদের সামাজিক রাজনৈতিক ও আর্থবৈষয়িক ব্যবস্থার মধ্যে। অর্থাৎ

আল্লাহর সম্পদের হেফাজতকারী বা রক্ষণাবেক্ষণকারী তাঁরই সৃষ্ট সকল মানুষ– যৌথ বা সম্মিলিত বা সমষ্টিগত হেফাজতী বা মালিকানায়– কোনো ব্যক্তিবিশেষের মালিকানা বা হেফাজতে নয়। মানুষ তাদের সকলের প্রয়োজনে সঠিকভাবে সেই সম্পদ হেফাজত করবে– ভোগ করবে। অথচ আমরা শোষকসমাজ বা ধর্মভিত্তিক সমাজে কী দেখতে পাই? এ বিষয়ে আমরা ওপরের অধ্যায়ে কিঞ্চিত আলোকপাত করেছি– পরবর্তীতে আরো আলোচনা করা হয়েছে।

'যে জাতি তার ভাগ্যোন্নয়নের জন্যে প্রচেষ্টা গ্রহণ করে না– আল্লাহও সে-জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না'– মহান এ বাণী ও পথনির্দেশকে সম্মুখে রেখে ইসলামের খেলাফতের শাসনাধীন অঞ্চলের ধর্মবর্ণগোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের আর্থবৈষয়িক শ্রীবৃদ্ধি তথা ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে শোষণের প্রধানতম অস্ত্র ব্যক্তিমালিকানাকে উচ্ছেদ করে ভূমিব্যবস্থা ও অন্যান্য উৎপাদনব্যবস্থাকে জাতীয়করণ করে বায়তুলমালের অধীনে ন্যস্ত করে সমষ্টিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। খেলাফতের সকল সাবালক নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কর্মক্ষম মানুষ নিজ নিজ সমর্থানুযায়ী কাজ করতো– তাদের সম্মিলিত শ্রমোপার্জিত সকল সম্পদ স্থানীয় বায়তুলমালে জমা হতো। সেখান থেকে রেশনিংপ্রথায় সকলে খাদ্য বস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রী পেতো– স্বয়ং খলিফাও রেশনিং প্রথায় তাঁর প্রাপ্য গ্রহণ করতেন। খেলাফতের যা কিছু প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক কাজ যৌথভাবে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে সম্পাদন করা হতো। এমনকি প্রয়োজনে বা জরুরী ভিত্তিতে শান্তি-শৃঙ্খলা ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ মোকাবিলার জন্যে যে স্বেচ্ছাসেবক বা সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলা হতো তা ছিল স্বতঃপ্রণোদিত ও বেতনবিহীন। অথচ সকল মানুষের জাতীয় ঐক্যের একক সংস্থা 'খেলাফতে রাশেদীনে'র নেতৃত্বে সকল মানুষের মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মহানবীর ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে পবিত্র কোরআনের নির্দেশিত পথে বিভিন্ন বাস্তব কর্মপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে তথাকথিত সভ্যসমাজের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একটি গণতান্ত্রিক সাম্যবাদী সমাজ গড়ে উঠেছিল।

কিন্তু ইসলামী সমাজে লুকায়িত প্রতিক্রিয়াশীল সামন্তবাদী শোষক এবং ধর্মব্যবসায়ীচক্রের ধুরন্ধর প্রতিনিধি মাবিয়া ও তৎপুত্র এজিদের উত্তরাধিকারভিত্তিক রাজতান্ত্রিক শাসন ও ব্যক্তিমালিকানাকেন্দ্রিক ব্যবস্থায় সাম্যবাদী সমাজের অপমৃত্যু ঘটে। মাবিয়া-এজিদের সময় থেকেই ইসলাম-পূর্ব ধর্মীয় কুসংস্কার, সুদ ও অন্যান্য শোষণভিত্তিক কার্যকলাপের প্রচলন ঘটে, সমাজের বুকে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা, ধর্মব্যবসা ইত্যাদির পুনরাবির্ভাব

ঘটে– যা মহানবী ও হযরত আলী পর্যন্ত– এই সময়ের মধ্যে এই শোষক প্রতিক্রিয়াশীলচক্র ও তাদের তাবেদার ধর্মব্যবসায়ী বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর কোনোই কার্যকলাপের অস্তিত্ব ছিল না। তবে মহানবীর অন্তর্ধানের পর খেলাফতের প্রারাম্ভকাল থেকে এই প্রতিক্রিয়াশীলচক্রটি পর্দার অন্তরাল হতেই খেলাফতের অভ্যন্তরে নানান বিশৃঙ্খলা ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যক্রম চালিয়ে আসছিল সাম্যবাদী ব্যবস্থাকে খর্ব করার হীনলক্ষ্যে। এবং তাঁদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে একে একে হযরত উমর, হযরত ওসমান, হযরত আলী, হযরত ইমাম হাসান, হযরত ইমাম হোসেন ও অন্যান্য অনেককেই নির্মমভাবে খুনীদের বলির পাঠায় প্রাণ দিতে হয়েছিল। এভাবেই প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিবিপ্লবী শক্তি তাদের হিংসা ও জিঘাংসা চরিতার্থ করে। অথচ এই প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিবিপ্লবী শোষক ও তাবেদারগোষ্ঠী ইসলামী সাম্যবাদী বিপ্লবের স্রোতধারাকে বহু প্রচেষ্টা চালিয়েও যখন প্রতিহত করতে সক্ষম হয়নি, তখন স্রেফ গা বাঁচাবার লক্ষ্যে ইসলামকে মেনে নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু সফল বিপ্লবের পরে স্রেফ মানবতার খাতিরে বিপ্লবের ফসল প্রতিহত করার এ প্রতিক্রিয়াশীলচক্রকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু পরাজিত প্রতিক্রিয়াশীলচক্র ইসলামকে মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেনি বলেই হৃতপ্রতিপত্তি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে অত্যন্ত সুকৌশলে, ষড়যন্ত্রের চোরাগলির পথ বেয়ে, হিংসা-রক্তপাত ও জিঘাংসার কার্যক্রম নিয়ে অবশেষে সমাজের গতিধারাকে নিজেদের কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে আসে এবং সাম্যবাদী ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়। ঠিক একই ঐতিহাসিক ও দার্শনিক প্রক্রিয়ায় বঙ্গবন্ধুর হত্যার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতাবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শোষক– সাম্রাজ্যবাদের সেবাদাস, পুঁজিবাদের প্রবক্তাচক্র ও ধর্মব্যবসায়ী বুদ্ধিজীবীশ্রেণী সমাজ ও রাষ্ট্রীয় প্রতিটি ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত হয়েছে এবং গণতান্ত্রিক সাম্যবাদী সমাজ ও শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার আদর্শ ও ব্যবস্থাসমূহকে বানচাল করার অপচেষ্টায় মেতে উঠেছে।

এক আলাপচারিতায় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন : ধুরন্ধর মাবিয়া-এজিদচক্রের শাসনামল থেকেই পর্দার অন্তরালে লুকায়িত প্রতিক্রিয়াশীল শোষক ও ধর্মব্যবসায়ী বুদ্ধিজীবীশ্রেণী একযোগে বেরিয়ে আসে। বিশেষ করে ধর্মব্যবসায়ী বুদ্ধিজীবীশ্রেণী সামন্তবাদী উত্তরাধিকারভিত্তিক রাজতন্ত্র, সম্পদে ব্যক্তিমালিকানা স্বত্ব, যাবতীয় শোষণ প্রতারণা শঠতা অত্যাচার নির্যাতন ও বঞ্চনার পক্ষে ধর্মের নামে, ইসলামের নামে, মহানবীর নামে এবং আল্লাহর নামে দোহাই দিয়ে নানান ফতোয়া জারি করে সমর্থন দিতে থাকে। এমনকি ইমাম হাসান, ইমাম হোসেন ও তাঁর পরিবার-পরিজনদের মর্মান্তিক ও

হৃদয়বিদারক হত্যাকাণ্ডকে ধর্মের ফতোয়া দিয়ে জায়েজ করে নেয় যে, এসবই আল্লাহর ইচ্ছা! অর্থাৎ এভাবে তারা ষড়যন্ত্রকারী খুনী এজিদচক্রকে সমস্ত অপবাদ থেকে উদ্ধার করতে চায়। ঐ হত্যাকাণ্ডকে মহানবী কর্তৃক ইংগিতকৃত এবং আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত বলতেও তারা কুণ্ঠিত হয়নি। সুতরাং মাবিয়া-এজিদচক্র নির্দোষ, ফুলের মতোই নির্মল পবিত্র– এটাই ধর্মব্যবসায়ীচক্র বলতে চেয়েছেন, তাই নয় কি?

অপরদিকে হযরত আলীর হত্যাকাণ্ড, ইমাম হাসানের হত্যাকাণ্ড, মাবিয়ার খেলাফতে আরোহণ ও এজিদকে তার উত্তরাধিকার মনোনয়ন এবং কারবালায় ইমাম হোসেনের হত্যাকাণ্ড এবং এসব কর্মকাণ্ডকে ধর্মমতে জায়েজ ও ইসলামসম্মত বলে ধর্মব্যবসায়ীদের ফতোয়াকে কেন্দ্র করে মুসলমান সমাজ শিয়া ও সুন্নী নামে প্রথমবারের মতো দুটি পরস্পরবিরোধী শিবিরে বা উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যারা হযরত আলীর সমর্থনে– ইমাম হাসান-হোসেনের পক্ষ নিয়েছিল এবং তাঁদের হত্যাকাণ্ডকে বিরোধিতা করে মাবিয়া-এজিদের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল তারা শিয়া এবং যারা এসব ঘটনাবলীকে আল্লাহর ইচ্ছা বলে মেনে নিয়েছিল বা নানা কারণে বিরোধিতা করতে পারেনি তারা সুন্নী নামে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ ব্যতীত ধর্ম, ইসলামী ব্যবস্থা, মহানবী ও তাঁর মছলা, পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যা, শাসন ব্যবস্থা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে মুসলমান সম্প্রদায় আশাশুনি ইসমাইলিয়া, কাদিয়ানী, কাদেবিয়া, ওহাবী, সোহরাওয়ার্দিয়া প্রভৃতি নানা উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তবে এসব উপদল বা সম্প্রদায়সমূহ আধ্যাত্মিকতাবাদ এবং সামন্তবাদী ধ্যানধারণাকেও পুঁজি করে গড়ে ওঠে। ঐসব উপদল বা মতবাদসমূহ বর্তমানেও প্রচলিত আছে এবং প্রত্যেকটি উপদল বা মতবাদের মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক মতবিরোধ দ্বন্দ্ব ও কলহ।

শাসক-শোষক এবং তাদের তাবেদার ধর্মব্যবসায়ী বুদ্ধিজীবীশ্রেণী ধর্মের বা আধ্যাত্মিকতাবাদের দোহাই দিয়ে কীভাবে আল্লাহ, পবিত্র কোরআন ও মহানবীকে অপমানিত করেছে, মিথ্যাচারে মণ্ডিত করেছে– সবকিছু ঘৃণ্য পন্থায় চালিয়ে দিয়েছে তা ভাবলে অবাক হতে হয়। বলা হয়েছে যে, আল্লাহর হুকুম ছাড়া গাছের পাতাও নড়ে না, শবেবরাতের রাতে আল্লাহ প্রতি এক বছরের জন্যে মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ড ভাগ্য– তার রুটি রুজি ধন-দৌলত হায়াত ময়ুত মানসম্মান ইত্যাদি নির্ধারণ করে থাকেন। ভাগ্যের ওপর মানুষের কোনোই হাত নেই– ভাগ্যের লিখন যা আছে তাই হয়ে থাকে। এগুলো খুবই গালভরা খোদাভক্তির কথা। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের প্রতি ক্ষণ-মুহূর্ত-সময় বা প্রাত্যহিক জীবনের যা কিছু বৈধ-অবৈধ, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় সবকিছুই আল্লাহ কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত! তাহলে

অবৈধ জন্ম, ব্যভিচার, বলাৎকার, হত্যাকাণ্ড, জবরদখল, শোষণ, প্রতারণা, অপহরণ, ডাকাতি, শঠতা, অত্যাচার, নির্যাতন, দুর্নীতি, মিথ্যাচার, ফাঁকি, বঞ্চনা, অপরের অধিকার খর্ব, চোরাকারবারী, চোরাচালানী, ফটকাবাজী, অসতোপায়ে অর্জিত ধনসম্পদ, মারামারি, হানাহানি, কাটাকাটি– মায় মনুষ্যজীবনের প্রতিটি কার্যক্রম আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত বলে এসবকিছুও হালাল কি? অর্থাৎ মানুষের জীবনে যা কিছু ঘটেছে, ঘটে, ঘটবে– হয়েছে, হচ্ছে, হবে বা না-হবে তা আল্লাহই নির্ধারণ করেন, সেহেতু এ প্রতিটি কাজই জায়েজ বা ধর্মসম্মত, তাই নয় কি? অর্থাৎ মনুষ্য জীবনে ও সমাজের মধ্যে যা কিছু কর্মকাণ্ড সাধিত হচ্ছে প্রতি ক্ষণ-কাল-সময়ের ভেতরে– এসব কর্মকা॥২০৭ণ্ডর পশ্চাতে রয়েছে আল্লাহর শান বা নির্দেশ বা ঘুঁটি চালানোর লীলাখেলা– এসব চিন্তাধারাকেই কি আমাদের মেনে নিতে হবে? তাহলে আমাদের ভাবা নিশ্চয়ই অযৌক্তিক হবে না যে, আল্লাহতায়ালা মানুষের প্রতিটি বৈধ-অবৈধ কাজের নেপথ্যনায়ক। তিনি সকল কাজের উৎস, আমরা মানুষেরা তার হাতের পুতুল; তিনি আমাদের নাচান আর আমরা অবলীলাক্রমে ঘুরঘুর করে নাচি! অর্থাৎ তিনি আমাদের দিয়ে সব– সব– সবকিছু করান। আর আমরা মানুষেরা সম্পূর্ণ নির্দোষ নিরপরাধ– তিনধোয়া তেঁতুলের বিঁচি! এসবই হলো ধর্ম ও মোল্লাতন্ত্রের মাজেজা, এটাই হলো নিরেট আধ্যাত্মিকতাবাদের শিক্ষা। এই আধ্যাত্মিকতাবাদের প্রকাশ মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে এই বহুলশ্রুত সংগীতে ঃ

এই যে দুনিয়া কিসের লাগিয়া
এতো যত্নে গড়িয়াছে সাঈ॥
তুমি বেহেস্ত তুমি দোজখ
তুমি ভালো মন্দ
তুমি ফুল তুমি ফল
তুমি তাতে গন্ধ
আমার মনে এই আনন্দ
তুমি খাওয়াইলে আমি খাই॥
তুমি হাকিম হয়ে হুকুম করো
পুলিশ হয়ে ধরো।
সর্প হয়ে দংশন করো
ওঁঝা হয়ে ঝাঁড়ো....

আমরা আমাদের মূল আলোচনায় ফিরে আসি।

আরো আশ্চর্য হলেও সত্য যে, মহানবী কর্তৃক যা-কিছু বাস্তবায়িত হয়েছিল সেই ব্যবস্থাসমূহকে সমূলে উৎপাটিত করে মাবিয়া-এজিদ যে

স্বৈরতান্ত্রিক অগণতান্ত্রিক সামন্তবাদী উত্তরাধিকারভিত্তিক রাজতন্ত্রীয় শাসন ও ব্যক্তিমালিকানাভিত্তিক শোষণবাদী আর্থসামাজিক ব্যবস্থার পুনঃপ্রচলন ঘটিয়ে ইসলামের আদর্শের মৃত্যুকে ডেকে এনেছিল– সেই মাবিয়া-এজিদদের শাসন-শোষণ ব্যবস্থার ঐতিহ্যকে আজো আষ্ট্রেপৃষ্ঠে লালন-পালন করে' চলেছে মহানবীরই পবিত্র জন্মভূমি সৌদি আরবসহ অন্যান্য আরব রাষ্ট্রসমূহের রাজা বাদশা শেখ আমীর প্রভৃতি শাসকবৃন্দ।

এ প্রসঙ্গে মহানবীর অন্তিমবাণীর কথা বলতে হয়। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে প্রিয় সাহাবাগণ যখন বললেন : ইয়া রাছুল, আপনার পরে কে আমাদের পরিচালনা করবেন... তখন মহানবী বললেন : তোমরাই বেছে নিয়ো। মহানবীর এ কথার মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিকবোধের কথা উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি জনগণের নেতা নির্বাচন করার ভার জনগণের ওপরই ছেড়ে দিয়েছেন। ইচ্ছে করলে তিনি তাঁর সন্তান বা যে কাউকে তাঁর উত্তরাধিকার মনোনীত করে যেতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা-না করে এ দায়িত্ব জনগণের ওপর অর্পণ করে গেছেন। কিন্তু মহানবীর জন্মভূমি, তাঁর চিরশায়িতভূমি সৌদি আরবসহ অন্যান্য উত্তরাধিকারভিত্তিক শাহীতান্ত্রিক আরব রাষ্ট্রসমূহে জনগণের কোনো মতামত নেই, গণতন্ত্র নেই। ইসলামী আর্থব্যবস্থা নেই। যা কিছু আছে– তা হলো ইসলামের মহাদুশমন মাবিয়া-এজিদদের প্রবর্তিত রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক ব্যবস্থার আকৃতিগত ও গুণগত ঐতিহ্যেরই ছবি বা কাঠামো।

অথচ বেদনাদায়ক হলেও সত্য যে, মাবিয়া-এজিদদের ঐতিহ্যের ধারক-বাহক সোদি রাজপরিবারই আবার বর্তমান মুসলিম বিশ্বের পরম ইসলামী মোড়ল সেজে বসেছে, দেশে দেশে ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণের কার্যকলাপে পৃষ্ঠপোষকতা করে চলেছে। তাই প্রশ্ন জাগে, এই যে ইসলামী শিক্ষার অভিযান চলছে– তা কোন ইসলামের শিক্ষা? মহানবী, নাকি মাবিয়া-এজিদী ইসলামের শিক্ষা?

এজিদী ঐতিহ্যের শাসকরা আজ বিশ্বে ইসলামের প্রধানতম সেবক ও নেতৃত্ব বলে নিজেদের মহিমা জাহির করে বেড়াচ্ছে পেট্রোডলারের বদৌলতে এবং তাঁদের অঢেল অর্থসম্পদ ইউরোপ-আমেরিকা তথা পুঁজিবাদী বিশ্বের বড় বড় ব্যাংক ও অন্যান্য অর্থকরী সংস্থায় লগ্নি খাটিয়ে একদিকে যেমন বিপুল সুদ ও সম্পদে নিজেরা বৈভবে ফুলেফেঁপে উঠছে, অপরদিকে পুঁজিবাদী বিশ্ব বা নেতৃত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে বিশ্বব্যাপী তার সাম্রাজ্যবাদী খবরদারী ও শোষণকার্য চালিয়ে যেতে ইন্ধন যুগিয়ে চলেছে এবং পাশাপাশি বিশ্বের নির্যাতিত শোষিত মুক্তিকামী মানুষের

গণতান্ত্রিক অধিকার, জাতীয় স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক মুক্তিসংগ্রাম নস্যাৎ করার কার্যক্রমে ও কমিউনিজম বা সাম্যবাদকে প্রতিহত করার ঘৃণ্য অপচেষ্টা ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তে মেতে উঠেছে। এমন কি যে আরবীয় নির্যাতিত ফিলিস্তিনীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার এবং ইসলামের অন্যতম পীঠস্থান 'আল-আকছা' ইসরাইল কর্তৃক পদদলিত ও ভুলুণ্ঠিত হয়ে চলেছে, সেই ইসরাইলের অভিভাবক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথেই রয়েছে তাদের গভীর সখ্যতা ও মিতালী। এবং এ কথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তথা পুঁজিবাদী বিশ্বের শাসকগোষ্ঠী কীভাবে ইসলামের নামগন্ধ দুনিয়া থেকে মুছে ফেলা যায় তার জন্যে যা-কিছু করণীয় তা অত্যন্ত সুচারুভাবে সম্পাদন করে চলেছে, আর তাদেরকে অর্থ দিয়ে সহযোগিতা দিয়ে চাঙ্গা করে চলেছে ইসলামেরই পীঠস্থান আরব রাষ্ট্রসমূহের শাসক-শোষকগোষ্ঠী।

মুসলিম বিশ্বের (আরব বিশ্ব ব্যতীত) প্রতিক্রিয়াশীল শাসক-শোষক–ধর্মব্যবসায়ী বুদ্ধিজীবীশ্রেণী আরব রাষ্ট্র ও এর রাজা বাদশা শেখ আমীরদের নাম শুনলেই শ্রদ্ধাভক্তি ও ভালোবাসায় গদগদ হয়ে যান এবং আরবীয় পোশাক-আশাক, সংস্কৃতি ও ভাষাকে ইসলামী পোশাক-সংস্কৃতি ও ভাষা বলে চালিয়ে নিজেদের দৈন্যতা প্রকাশ করে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে এগুলো সমাজের বুকে আইন করে বা জোরপূর্বক চালাতে গিয়ে সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার নির্যাতন চালান– রক্ত ঝরান। এভাবেই তারা তাদের প্রভুদের সন্তুষ্ট রাখতে চান, নিজেদের ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখার হীন লক্ষ্যে।

সত্যই ভাবতে অবাক লাগে, প্রতিক্রিয়াশীল শাসক-শোষক ধর্মব্যবসায়ী বুদ্ধিজীবীশ্রেণী ধর্মের ধূম্রজালিক কার্যক্রমের বেড়াজালে ব্যাপক সাধারণ অজ্ঞ মেহনতি মানবগোষ্ঠীকে কীভাবে গহীনতিমিরে রেখে দিয়েছে। এ ব্যতীত আরো অনেক কথাই বলা যায় এইসব ভণ্ডজ্ঞানপাপীদের সম্পর্কে। কিন্তু আমাদের মূল লক্ষ্য ওটা নয়। আমরা শুধু বলতে চাই আল্লাহ, মহানবী, পবিত্র কোরআন ও ইসলামকে কীভাবে ধর্মের নামে তারা যত্রতত্র ব্যবহার করে থাকে।

আদিম মানুষের ব্রতচার, সংস্কৃতি, নানান অনুষ্ঠান ইত্যাদি থেকেই পরবর্তীকালে ধর্মের উৎপত্তি ঘটেছে। 'ধর্ম' অর্থ : নিয়ম-নীতি। এই ধর্মকে নানান অতিপ্রাকৃতিক ঐশ্বরিক ও আধ্যাত্মিকবাদে মণ্ডিত আভরিত ও আবরিত করেছে মনুষ্যসমাজেরই একটি অতিক্ষুদ্রশ্রেণী– যারা সমাজের শোষকশ্রেণীর তাবেদারী করে চলে এবং পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে থাকে। তাই সমাজে এই উভয় শ্রেণীর শাসন-শোষণ প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ঠাঁট-ডাট প্রতিষ্ঠিত করার এবং তা অব্যাহতগতিতে প্রবহমান রাখার লক্ষ্যেই ধর্মকে

ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ ধর্ম হলো এই অনুৎপাদকশ্রেণীর (শোষক ও ধর্মব্যবসায়ী বুদ্ধিজীবীশ্রেণী) সীমাহীন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি– শাসন-শোষণ, প্রভাবপ্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার একটি সহজতম কার্যকরী হাতিয়ার। আর এসবের যোগান দিয়ে থাকে, তথা তাদের সম্পদ ও সুখের যোগান দিয়ে থাকে সমাজের ব্যাপক অজ্ঞ মেহনতি শ্রমজীবী মানুষ তাদের রক্ত জল শ্রম দিয়ে, ত্যাগ-তিতিক্ষা দিয়ে, জীবন দিয়ে, রক্ত দিয়ে।

আল্লাহ মানুষকেই তাঁর সকল সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে তাঁরই প্রতিনিধি করে পৃথিবীতে সীমাহীন ধনসম্পদ ও অন্যান্য সকল কিছু দিয়ে পাঠিয়েছেন। মানুষকে তিনি শক্তি সাহস জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক চিন্তা ধ্যান ধারণা ইত্যাদি সবকিছু দিয়ে পাঠিয়েছেন। কিসে ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, সুখ-শান্তি-অশান্তি, মঙ্গল-অমঙ্গল– কিসে দুঃখ ব্যথা বেদনা হতাশা নিরাশা ইত্যাদি যা কিছু আছে তা বুঝবার যাবতীয় ক্ষমতা-জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক তিনি মানুষকে প্রদান করেছেন, মানুষেরই সার্বিক কল্যাণ ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে। মানুষ তার প্রয়োজনে সৃষ্টি উদ্ভব বিকাশ, পরিবর্তন পরিবর্ধন বিবর্তন রূপান্তর, ধ্বংস ক্ষয় বিন্যাস করতে পারে। এই চরম ও পরম সত্যকে ঐ স্বার্থান্বেষীচক্র উল্টোখাতে– তা আবার আল্লাহর দোহাই দিয়ে ধর্মের ধূম্রজাল সৃষ্টি করে নানান প্রতারণার শঠতা মিথ্যাচার কূটকৌশল ছলনা ও আধ্যাত্মিকতাবাদে প্রবাহিত করে নিজেদের সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার কার্যক্রমে লিপ্ত হয়েছে। তারা জেনে দেখে শুনে বুঝেও স্বীকার করতে চায়না যে, এই পার্থিবজগতে মনুষ্যসমাজে যা কিছু বৈধ-অবৈধ-ন্যায়-অন্যায়, ঘটনা-দুর্ঘটনা, সুনাম-দুর্নাম, কাজ-অকাজ– এসবকিছুর জন্যে মানুষই দায়ী এবং মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলাফল মানুষকেই ভোগ করতে হয়– এজন্যে আল্লাহ দায়ী নন। আল্লাহ বৈধ-অবৈধ কাজের নিয়ন্ত্রক বা পরিচালক নন। মানুষের বিবেচনার ওপর যাবতীয় কাজের ভার তিনি অর্পণ করে দিয়ে সৃষ্টির মধ্যে মিশে আছেন। শোষক-মোল্লাতন্ত্রের ধর্মের সাথে, তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের সাথে, তাদের বর্ণিত আল্লাহর সাথে এই আল্লাহর কোনো সংশ্রব ও সম্পর্ক থাকতে পারে না। তার সত্যই যদি শোষক-মোল্লাতন্ত্রের আল্লাহই প্রকৃত আল্লাহ হয়ে থাকেন, তাহলে সেই আল্লাহ সম্পর্কে আমাদের ভাবতে হবে বৈকি! কারণ আল্লাহ তাঁরই স্বার্থে আমাদের সৃষ্টি করেছেন, আমরা কেউই বলিনি যে আমাদের সৃষ্টি করুন! এ প্রেক্ষিতে আমাদের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব তাঁরই ওপর বর্তায়।

ধর্ম যেহেতু শোষণের হাতিয়ার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে শোষক ও মোল্লাতন্ত্রের হাতে– সেহেতু সাম্যবাদী দর্শনে ধর্ম ও এর ধারক-বাহকদের

অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না বা কোনো অতিপ্রাকৃতিক বা আধ্যাত্মিকতাবাদের স্থান নেই। বস্তুতপক্ষে মানুষ সৎজ্ঞান শিক্ষা বুদ্ধি বিবেককে সমাজের সার্বিক কল্যাণের নিমিত্তে পুঁজি করে সমাজের বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপটে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, এটাই মার্কসীয় সাম্যবাদী দর্শনের মূল লক্ষ্য। সাম্যবাদ প্রচলিত ধর্মকে সামাজিকভাবে স্বীকার না করলেও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার পক্ষপাতি নয়। তবে ধর্ম যাতে সামাজিক রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ করতে না পারে তজ্জন্যই ধর্মকে নিরপেক্ষ রাখা হয়। ধর্ম মানুষের অত্যন্ত ব্যক্তিগত বিষয়– যে যে কোনো ধর্ম পালন করতে পারে বা না-ও পারে। এ ব্যাপারে কেউ কাউকে বাধা দিতে বা প্রভাবিত করতে পারবে না। সুতরাং ধর্মকে ব্যক্তিমানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার বিধান নিশ্চিত করতে হবে। কারণ প্রচলিত ধর্মসমূহ যাবতীয় স্বৈরাচার শোষণ বঞ্চনা প্রতারণা অত্যাচার– শ্রেণীবিভেদ সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব বিবাদ সংঘর্ষ অবিশ্বাস হিংসার হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। সুতরাং ধর্মের ইতিহাস, কার্যকলাপ ও কার্যকারণের ফলশ্রুতিতে ধর্মকে সামাজিক রাজনৈতিক আর্থবৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে প্রবেশের অধিকার দেয়া যায় না। এক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিই কেবল ধর্মকে তার অবস্থানের নিশ্চয়তা দিতে পারে এবং সামাজিক শৃঙ্খলা ঐক্য ভ্রাতৃত্ববোধ– পারস্পরিক সহযোগিতা সৃষ্টির নিশ্চয়তা দিতে পারে। তাই ধর্মনিরপেক্ষতা– এ নীতির ওপরই ইসলাম ও আধুনিক সাম্যবাদী দর্শন, চিন্তাচেতনা ও ধ্যানধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সাম্যবাদ মানুষের জাগতিক সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে শ্রমের ওপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। এ ব্যতীত সময়ানুবর্তিতা, নিয়মানুবর্তিতা, দৈহিক সুস্থতা, কৃচ্ছতাসাধন, সৌহার্দ্য, ভাতৃত্ব, ঐক্য, মৈত্রী, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, প্রেম-পিরিতি-ভালোবাসা, পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদান, মহানুভবতা, সহানুভূতি, আত্মসংযম, আত্মশুদ্ধি, আত্মসমালোচনা, পারস্পরিক সম্প্রীতি-মিলন-সম্মেলন-মহোৎসবের মহান শিক্ষা প্রদান করেছে। ইসলামের ধর্মীয় ব্যবস্থাপনায় নামাজ রোজা হজ্ব যাকাত... হিন্দুধর্মের নানান পূজা-পার্বণ, উপবাস, যোগশাস্ত্র ইত্যাদি– বৌদ্ধধর্মের অষ্টকনীতি বা নির্বাণ– খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মের নানান ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়েও উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ কিঞ্চিতভাবে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহই হলো সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার অন্যতম ভিত্তি। এই বৈশিষ্ট্যসমূহ অর্জন করার মধ্যে ধর্মের তেমন কোনো অবদান নেই, ব্যক্তিগতভাবে অর্জিত হলেও রাষ্ট্র ও সমাজের প্রেক্ষাপটে এটা অতিনগণ্য। এসবই মানুষের সহজাত চারিত্রিক

বৈশিষ্ট্যের পরিণতি থেকে উত্থিত হয়ে থাকে। তবে এজন্যে শিক্ষামূলক প্রচেষ্টার প্রয়োজন। সাম্যবাদ তাই শিক্ষার ওপরই সবিশেষ গুরুত্বারোপ করে থাকে।

কেউ বলেন, ধর্ম আল্লাহর সৃষ্টি। কেউ বলেন মানুষের সৃষ্টি। কেউ বলেন, মানুষের সার্বিক জীবনের– ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের শান্তির জন্যেই ধর্মের প্রয়োজন রয়েছে। আবার কেউ বলেন, ধর্ম শোষণ স্বৈরাচার অসংগতি অনৈক্য ও দ্বন্দ্ববিবাদের একটি হাতিয়ার, তাই সার্বিক শান্তি ও কল্যাণের জন্যেই জাগতিক কর্মকাণ্ডে ধর্মের প্রয়োজন নেই। জগতের বাইরে– মৃত্যুর পরে আর কোনো জগত নেই। সাধারণ মানুষকে পরজগতের ভয় দেখিয়ে শোষকশ্রেণী তাদের ওপর খবরদারী করে চলেছে। ... কেউ বলেন : আল্লাহ আছেন, কেউ বলেন : এটা একটা কল্পনামাত্র। মানুষের সীমাবদ্ধজ্ঞান থেকেই এসব কল্পনার উদয় হয়েছে। এক্ষেত্রে বিজ্ঞান নিয়োজিত রয়েছে, অনেক সীমাবদ্ধ ধারণার জট খুলে গেছে, ভবিষ্যতে খুলতেই থাকবে।.... নানাজনের নানান মত। এই মতামতের মাঝখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের প্রশ্ন জাগে, ধর্ম মূলতঃ কী? এর উৎপত্তির কারণ কী এবং কেনো? কোনো পর্যায়ে এসে ধর্মের তিরোধান হবে কি? এ জাতীয় নানান প্রশ্ন প্রায়শই আমাদের মনকে আলোড়িত করে থাকে। এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদেরকে সমাজের ঐতিহাসিক বিবর্তনবাদ বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে সম্বল করে অগ্রসর হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

বিজ্ঞানীরা মত প্রকাশ করেছেন যে, আমাদের এই পৃথিবীর বয়স প্রায় চার কোটি বছর। পৃথিবীর বুকে মানবজাতির আবির্ভাব ঘটেছে আজ থেকে প্রায় ত্রিশ লক্ষ বছর পূর্বে, আর মনুষ্যসমাজে ধর্মের সূত্রপাত আজ থেকে আনুমানিক মাত্র দশ হাজার বছর পূর্বে ঘটেছে। তাহলে প্রশ্ন জাগে– ২৯ লক্ষ ৯০ হাজার বছর কি পৃথিবীতে কোনো ধর্মই ছিল না? ধর্মহীন অবস্থায় এতো লক্ষ বছর অতিবাহিত করে এসেছে মানবজাতি? আশ্চর্য হলেও বলতে হয়, হ্যাঁ, তাই। আজ থেকে দশ হাজার বছর পূর্বে ধর্ম কি, আল্লাহ কি তা মানুষ জানতো না, কোনো অদৃশ্যশক্তির প্রতি আত্মসমর্পণ করতে জানতো না, সমাজশক্তিই তাদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করেছে। এ কথাগুলো উড়িয়ে দেয়া যাবে না।

ধর্ম সম্পর্কে সমাজে নানান মত প্রচলিত আছে। এবং এটাই হলো পৃথিবীতে সবচাইতে বেশি আলোড়িত ও বিতর্কিত বিষয়। ধর্মকে কেন্দ্র করে

হাজার হাজার বছর পূর্ব হতেই মনুষ্যসমাজে শ্রেণীবিভেদ হানাহানি মারামারি কাটাকাটি রক্তারক্তি জীবনপাত হিংসা বিদ্বেষ ঘৃণা বর্ণবৈষম্য দ্বন্দ্ববিবাদ সংঘাত যুদ্ধ মহাযুদ্ধ ঘটেছে এবং ঘটে চলেছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে অন্যের ধর্মকে নাকচ করে দিয়েছে বা দিচ্ছে। প্রাত্যহিক জীবনের সর্বক্ষেত্রের ওপর ধর্মকে এনে দাঁড় করানো হয়েছে। এসব কারণেই ধর্ম মানুষের মনের ওপর এক প্রচণ্ড প্রভাব ফেলেছে। এরই ফলশ্রুতিতে ধর্মকে গ্রহণ-বর্জন ও নিরপেক্ষ রাখার কর্মকাণ্ডে মানুষ নিজেদেরকে সমর্পিত করেছে।

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, সাম্যবাদী দর্শনের মধ্যে ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতাবাদ বা ভাববাদের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। বস্তুবাদ, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ও ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ববাদভিত্তিক বস্তুবাদের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে আধুনিক সাম্যবাদ। আদিম সাম্যবাদের বৈজ্ঞানিক সংস্করণই হচ্ছে আধুনিক সাম্যবাদ। এর প্রবক্তা মনীষী কার্ল মার্কস। মার্কসবাদের ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশে, সেই সব দেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠেছে প্রগতিশীল সমাজসভ্যতা।

সাম্যবাদী দর্শনের চিন্তায় জগতটা একটা বাস্তব সত্য। বাস্তব বা বস্তুজগতের বাইরে কিছু নেই। তবে বাস্তব বা বস্তু থেকে চিন্তা চেতনা ভাব অনুভবের সৃষ্টি, এগুলো আবার কোনো অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃতিক বা অবাস্তব বিষয় নয়। বস্তুই আদি এবং বস্তুতেই বস্তুর শেষ পরিণতি, বস্তুর অভ্যন্তরস্থিত দ্বন্দ্বই বস্তুকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে থাকে। আর বস্তুর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বই বস্তুকে বস্তুর মধ্যেই পরিবর্তিত পরিবর্ধিত বিবর্তিত ধ্বংস ও বিনাশ সাধিত করে থাকে।

কিন্তু পাশাপাশি এ প্রশ্নটা ওঠা স্বাভাবিক, জগতটা যদি বাস্তব সত্যই হয় তাহলে ভাববাদ বা আধ্যাত্মিকতাবাদ বা ঐশ্বরিকবাদ বা ধর্ম মূলত কী এবং কী অবস্থার প্রেক্ষিতে মানুষের মধ্যে এসব প্রেক্ষাপট জাগ্রত বা উত্থিত হয়েছে? কেনো মানবমন ধর্ম মানে বা ঈশ্বরের নিকট নিজেকে সমর্পণ করে সান্ত্বনা খুঁজে পেতে চায়? কেনো পৃথিবীতে মানুষে মানুষে হানাহানি– বৈষম্য অশান্তি অসংগতি এই ধর্মকে কেন্দ্র করে? মূলত ধর্ম কী এবং কী এর লক্ষ্য– এ জাতীয় প্রশ্ন প্রায়শই মানবমনকে আলোড়িত করে থাকে। ফলে ধর্মকে কেন্দ্র করেই মানুষ আস্তিক নাস্তিক ও নিরপেক্ষতার নীতিতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

এ যাবতকাল ধর্মের উৎস-উৎপত্তি সম্পর্কে যতটুকু বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে– তাতে প্রমাণিত হয়েছে যে, সীমাহীন মহাবিশ্ব

সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতা, প্রাকৃতিক-নৈসর্গিক বৈচিত্র্যতা-বিপর্যয়, জন্ম-মৃত্যু, রোগ-শোক, ক্ষুধা-অভাব-দরিদ্রতা-বৈষম্য, অত্যাচার-নির্যাতন-বঞ্চনা, নানান বিস্ময়-বিহ্বলতা... এক কথায় মানুষের জ্ঞানবহির্ভূত বিষয়ের অজ্ঞতা ও অসহায়ত্ব থেকেই তার মনে এসবের পশ্চাতে কোনো এক মহানিয়ন্ত্রক– জাগ্রত অতিন্দ্রীয় মহাশক্তির অবস্থান, তাঁর নিয়ন্ত্রণ পরিচালন ক্ষমতা সম্পর্কে নানান অতিপ্রাকৃতিক চিন্তাচেতনা ধ্যানধারণা ভাবানুভাব আবেগানুরাগ ইত্যাদি সৃষ্টি হয়েছে। আদিকালে প্রাকৃতিক-নৈসর্গিক ঘটনাবলী সম্পর্কে মানুষ যা জানতে বুঝতে দেখতে ও আয়ত্তে আনতে পারতো না অথচ সেই সব ঘটনা তাদের সামনেই ঘটে যেতো বা প্রকাশিত হতো, সেসব ঘটনাবলীকে তারা দৈবিক দৈত্যিক বা ঐশ্বরিক মনে করতো। এই অজানা জ্ঞানবহির্ভূত অজ্ঞাত বিষয়াবলী থেকেই মানুষের মনে নানান ভাব-অনুভাবের সৃষ্টি হয়। এ ব্যতীত ভয়-বিস্ময়-বিহ্বলতা ইত্যাদি হতেও মানুষের মনে নানান ধারণার সূত্রপাত ঘটে। এই অজানা অজ্ঞাত বিস্ময় ভয় বিহ্বলতা ইত্যাদির পশ্চাতে এক অদৃশ্যশক্তির কাল্পনিক অস্তিত্ব অবলীলাক্রমে মানুষের মনে উদয় হয় এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় ভয় বিহ্বলতা– বিরাট বিরাট হিংস্র জন্তুর আক্রমণের কবল থেকে পরিত্রাণের জন্যে সেই অদৃশ্যশক্তির প্রতি পূজা-অর্চনা-প্রার্থনা ও নানান অনুষ্ঠানের উদ্ভব ঘটায়।

অর্থাৎ আদিকালে অজ্ঞ, দুর্বল, সংখ্যায় নগণ্য মানুষ যা কিছু বিরাট বিশাল ভয়ঙ্কর বিপর্যাত্মক ধ্বংসাত্মক– ধরাছোঁয়া বোঝার বাইরে এবং যে সমস্ত কিছু জীবনধারণের জন্যে প্রয়োজন কিন্তু যা তারা সৃষ্টি করতে পারতো না– সেই সকল অজানা অজ্ঞাত অসম্ভব বিষয়গুলোকে ঐশ্বরিক বলে মনে করতো। যেমন চন্দ্র সূর্য আগ্নেয়গিরি ভূমিকম্প বন্যা ঝড় মহামারি মৃত্যু– বিরাটকায় হিংস্র জীবজন্তু প্রভৃতি সম্পর্কে মানুষের মনে ঐশ্বরিক ধারণার সৃষ্টি হয় এবং এগুলোকে বশ করার জন্যে তাদের মনে তোয়াজ পূজা অর্চনা বা প্রার্থনার সূত্রপাত ঘটে। একইভাবে ছোট ছোট নদী-খাল-জলাশয়, পাহাড়-পর্বত-বৃষ্টি, গরু-ছাগল ও অন্যান্য সহজলব্ধ নিরীহ জীবজন্তু-পক্ষি-কীটপতঙ্গ, ফলমূল গাছপালা– যা তাদের জীবনযাপনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন মেটাতো, এগুলোকে তারা ঐশ্বরিক বা দেবতার আশীর্বাদ বলে মনে করতো এবং এসবকিছুকে দেবতা গণ্য করে এসবের প্রতি নির্ভর করার সহজাতপ্রবৃত্তির কারণে মানুষের মনে পরমমাতা-পরমপিতা বা মহামাতা-মহাপিতা জাতীয় অতিপ্রাকৃতিক শক্তি সম্পর্কে ধারণা ও ভাবের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ তৎকালীন প্রাকৃতিক পরিবেশগত বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপটেই মানুষের মনে এ জাতীয় ঐশ্বরিক-দৈবিক-অতিপ্রাকৃতিক অদৃশ্য মহাশক্তির কাল্পনিক

অস্তিত্ব সম্পর্কে নানান চিন্তাচেতনা ধ্যানধারণা ও ভাব-অনুভবের সৃষ্টি হয়– যে প্রেক্ষাপট কোনো অলৌকিক বা বস্তুবাদের প্রেক্ষাপট থেকেই ভাববাদের সূত্রপাত এভাবেই হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

এসবকিছুর পরও কোনো প্রকার শোষণ ব্যবস্থা বা শ্রেণীব্যবস্থার পূর্বে আদিম মানুষ যখন নিজের পরিশ্রমের ফল নিজেই ভোগ করতো, নিজের ক্ষমতার ওপর আস্থাশীল ছিল, তখন পর্যন্ত অজানা অজ্ঞাত শক্তিকে ভয়-বিস্ময়ের বা বিহ্বলতার দৃষ্টিতে গণ্য করলেও ওগুলোর ওপর নির্ভরশীলতা বা আত্মসমর্পণের কথা চিন্তাও করতো না। বরং সীমিত জ্ঞান ও দৈহিক শক্তি দিয়ে বা কৌশল অবলম্বন করে বা আত্মশক্তিতে বলিয়ান হয়ে তা জয় করতে বা বশে আনতে প্রচেষ্টা চালাতো। ঐ মানুষের যা কিছু ইন্দ্রজাল ব্রতচার আচার-পূজা-প্রার্থনা তার মূলে ছিল ঐ শক্তিগুলোকে নিজের আয়ত্তাধীন করার স্থূল প্রচেষ্টা মাত্র। তারা ওগুলোকে আয়ত্তাবহির্ভূত মনে করেনি– দৈহিক শক্তি দিয়ে– নানান ইন্দ্রজাল বা যাদু দিয়ে বশে আনার প্রচেষ্টা চালাতো। একেবারে আদি থেকে শুরু করে সমাজব্যবস্থা যখন শ্রেণীসত্তা বা দাসপ্রথায় রূপান্তরিত হয়েছে– তার পূর্বে এই মধ্যকালীন লক্ষ লক্ষ বছর ছিল ধর্মহীন শ্রেণীহীন শোষণহীন রাষ্ট্রহীন সমাজ ব্যবস্থার স্থায়ীত্বকাল। এ সময়টাকেই 'আদিম সাম্যবাদী সমাজে'র কাল বলে সমাজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে উল্লেখিত হয়েছে।

সাম্যবাদী সমাজের শেষধাপে তথা উৎপাদনব্যবস্থার প্রচলন ও উৎকর্ষতার ঊষালগ্নে সমাজের প্রয়োজনাতিরিক্ত উদ্বৃত্ত বা বাড়তি সম্পদকে কেন্দ্র করে উপজাতীয় সমাজের সমাজপ্রধান, সমরপ্রধান উৎসবপ্রধান, শিকারপ্রধান, কৃষিপ্রধান, ব্যবসাপ্রধান প্রভৃতি প্রভাবশালী শ্রেণীর মনে ব্যক্তিসম্পদ ব্যক্তিচিন্তা ব্যক্তিসত্তা ব্যক্তিস্বাধীনতার লোভ-লালসার বীজ অঙ্কুরিত হতে থাকে। এ প্রক্রিয়ায় কালক্রমে উক্ত প্রভাবশালী শ্রেণীর সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিক কর্মকাণ্ডের ফলশ্রুতিতে সাম্যবাদী সমাজের মূলে প্রচণ্ড ধস নেমে আসে এবং সমাজের ব্যাপক অজ্ঞ দুর্বল নিরীহ মেহনতি মানবগোষ্ঠী এই প্রভাবশালী শ্রেণীর অধীনে দাসে পরিণত হয়ে পড়ে। এভাবেই শুরু হলো দাসপ্রথার যুগ– সামন্ততান্ত্রিক যুগ। এই দাসপ্রথাই উত্তরণ ঘটালো প্রভুসমাজের। এই প্রভুসমাজই জন্ম দিল শ্রেণী শোষণ বঞ্চনা অত্যাচার নির্যাতন ব্যভিচার ও নানান অসংগতির। এই শ্রেণীবিভক্ত সমাজকে তথা শোষণভিত্তিক সমাজকে বা দাসমানবগোষ্ঠীকে দাবিয়ে রাখার লক্ষ্যে এবং সকল অবিচার অসংগতি অত্যাচার শোষণকে হালাল করার লক্ষ্যে

প্রভুসমাজের অন্যতম সহযাত্রী– সাবেক সমাজের উৎসবপ্রধানগণ বা বুদ্ধিজীবিগণ সমাজের নানান আচার-অনুষ্ঠান পূজা পার্বণ ইত্যাদির মধ্যে নানান 'টোটেম' বা আদিমাতা-আদিপিতার কাল্পনিকসত্তাকে প্রতীকসত্তায় দাঁড় করিয়ে তার মধ্যে নানান অলৌকিক অতিপ্রাকৃতিক আধ্যাত্মিক ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে। সেইসব টোটেমকে মানুষের ভাগ্যবিধাতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, যাতে দাসমানবগোষ্ঠী তাদের জীবন ও কর্মের লিপিকার বিধাতার নির্দেশ বলে মেনে নিয়ে নিজ নিজ ভাগ্যকে বরণ করে নিতে বাধ্য হয়। এভাবেই আদিসমাজের ব্রতচার পূজা প্রার্থনা যাদুবিদ্যা ইত্যাদিকে ভিত্তি করে এবং এসবের পশ্চাতে অদৃশ্যশক্তির কাল্পনিক চিন্তাধারাকে সম্বল করে প্রভুসমাজ বা দাসপ্রথার যুগ থেকেই ধর্মের উৎপত্তি ঘটেছে সমাজের প্রভুশ্রেণীর হাতে.... তাদের শাসন-শোষণ অত্যাচারকে জায়েজ ও প্রবহমান রাখার লক্ষ্যে। আর প্রভুসমাজের একটি ক্ষুদ্র ধূর্ত বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠী এই ধর্মকেই তাদের পেশা হিসেবে গ্রহণ করে নিয়ে একে আধ্যাত্মিকতাবাদ অলৌকিকবাদ প্রতিপ্রকৃতিবাদ বা মহাজাগ্রত অদৃশ্যশক্তিকে নানান আভরণে-আবরণে মণ্ডিত করতে থাকে এবং জাগ্রতশক্তির মহিমা প্রচারের জন্যে সাধুভাষায় ভাবানুভাব অনুরাগ ও আবেগ দিয়ে ছান্দিক কাব্যগানে নানান সাহিত্য সংস্কৃতি সৃষ্টি করতে থাকে। এবং এ কাজকেই তারা তাদের সার্বক্ষণিক কর্মকাণ্ডে রূপান্তরিত করতে থাকে। সাধারণ অজ্ঞ নিরীহ ব্যাপক মানবগোষ্ঠী এ জাতীয় মধুর সাহিত্য-সংস্কৃতিতে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। এই ধর্মীয় বুদ্ধিজীবীশ্রেণী তাদের প্রভুসমাজের যাবতীয় কার্যকলাপকে– ব্যক্তিসম্পদের মালিকানা স্বত্বকে ও সেই সম্পদ নিরাপদে তাদের উত্তরাধিকারীদের হাতে ন্যস্ত করার লক্ষ্যে ধর্মের ধূম্রজালে নানান আইন-কানুন সৃষ্টি করতে থাকে। এভাবেই শোষকসমাজ ও সাধারণ মানুষের কাছে এই ধর্মীয় বুদ্ধিজীবীশ্রেণী বিশেষ শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে পড়ে। এভাবেই সমাজের সার্বিক নিয়ন্ত্রণভার মুষ্টিমেয় প্রভু প্রভাবশালী শ্রেণীর হাতে এসে যায়। এবং এ প্রক্রিয়ায়ই সাম্যবাদী সমাজের লয়প্রাপ্ত ঘটে এবং সমাজে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে, যথা প্রভু ও দাস, বা পেট্রেশিয়ান ও প্লেবিয়ান। শাসক ও শাসিত। শোষক ও শোষিত। এই দাসপ্রথার মধ্য দিয়ে পরবর্তীকালে জন্ম নিলো ভূমিদাসপ্রথার যুগ– তথা সামন্তবাদী সমাজ। আর সামন্তবাদী সমাজের গর্ভ থেকে জন্ম নিলো রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা।

শোষক সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ব্যাপক অজ্ঞ দুর্বল মেহনতি মানবগোষ্ঠী ভূমিদাসশ্রমিক হিসেবে সামন্তপ্রভুদের অধীনে নিয়োজিত হলো। তাদের শ্রমোৎপাদিত সম্পদে তাদের কোনো অধিকার স্বীকৃত হলো না। কারণ

উৎপাদনের যাবতীয় উপায়গুলোর মালিকানা ধর্মকর্তৃক পূর্বাহ্নেই স্বীকৃত হয়ে প্রভাবশালীদের বা সমাজের মুষ্টিমেয় প্রভুদের বা সামন্তপ্রভুদের মালিকানায় পর্যবশিত হয়ে পড়েছিল। এ মালিকানার বদৌলতে উৎপাদিত যাবতীয় সম্পদের একচেটিয়া মালিকানা তাই সামন্তপ্রভুদের হাতে ন্যস্ত হয়ে পড়ে। এমনকি ভূমিদাসশ্রমিকরাও সামন্তপ্রভুদের মালিকানায় অন্যান্য উপকরণের মতোই পর্যবশিত হয়ে পড়ে। ফলে ব্যাপক মেহনতি মানবগোষ্ঠীর কোনোই অধিকার বা স্বাধীনতা ছিল না। এভাবে এই মানবগোষ্ঠীর নিজেদের ওপরই আস্থা বা আত্মবিশ্বাস থাকলো না। তাদের মন-মানসিকতায় জন্ম নিলো আত্মসমর্পণ ও পরনির্ভরশীলতার প্রকৃতি। সমাজের সামন্তপ্রভুদের ক্ষমতার দাপট ও অন্যান্য কারণে সামাজিক অজ্ঞাতশক্তিকে অজ্ঞেয় মনে করে সামন্তপ্রভুদের প্রতি তোয়াজ তোষামোদ ভক্তি পূজা প্রার্থনা ইত্যাদি তাদের মানসিকতায় স্থান পেল। আদিম সমাজের অজ্ঞাত অজানা শক্তিকে দৈহিকশক্তি ও পরিশ্রম দিয়ে যে মানুষ বশীভূত করতো– আর এ সমাজে সেই মানুষের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তাদেরই মধ্যকার একটি ক্ষুদ্র চতুর শক্তিশালী প্রভাবশালী ও কৌশলী মানবগোষ্ঠীর শক্তিকে অতিপ্রাকৃতিক অলৌকিক ও ঐশ্বরিক মনে করে তাদের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়লো, তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করলো। আর এ আত্মসমর্পণের পশ্চাতে সবচাইতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে শোষকসৃষ্ট ধর্মীয় চিন্তাধারণা বা ঐশ্বরিক ভাববাদ। ধর্মের মহাআবিষ্কার 'নসীব' বা 'বিধির বিধান' থেকেই ব্যাপক অজ্ঞ দুর্বল মেহনতি মানবগোষ্ঠীর মনে জন্ম নিলো পরনির্ভরশীলতা ও আত্মসমর্পণের প্রবৃত্তি।

কালক্রমে সভ্যতার যে অগ্রগতি সূচিত হয়েছিল এই ব্যাপক দাস-শ্রমিক মানবগোষ্ঠীর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে, সেই অগ্রগতির ফলে মানুষ অনেক প্রাকৃতিক শক্তিকে জানতে বুঝতে ও আয়ত্তে আনতে পেরেছে। কিন্তু সমাজ বিকাশের সাথে এমন কতকগুলো সমাজশক্তি দাঁড়িয়ে যায় যা সাধারণ মানুষের কাছে একেবারেই অবোধ্য। যেমন এক স্তরে এসে মানুষ অনুভব করতে পারে যে, সমাজের বৃহত্তম সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ দিনরাত রক্ত জল করে শ্রম প্রদান করেও শ্রমের প্রাপ্য পায় না, ক্ষুধা-দারিদ্র্য দূরীভূত হচ্ছে না, শ্রমের ক্ষেত্রও অনেক ক্ষেত্রে সীমিত, বেকারত্বই তাদের নিত্যসঙ্গী, অর্ধাহারে অনাহারে রোগে তারা ধুকে ধুকে মরছে, অথচ তাদেরই পাশাপাশি মুষ্টিমেয় মানুষ শ্রম প্রদান না করেও পায়ের ওপর পা রেখে, অপরের ওপর ডাণ্ডাবাজি ও খবরদারী করে অতি স্বচ্ছলভাবে জীবনযাপন করছে– তারা যাবতীয় উৎপাদনক্ষেত্রের মালিক, সামাজিক প্রভাবপ্রতিপত্তি মানসম্মানের অধিকারী,

তারা অঢেল অর্থ-সম্পদ নানান আমোদ-ফুর্তি ইত্যাদিতে বেঁঘোরে ব্যয় করছে, অথচ এসব অর্জন বা প্রতিকারের কোনো ক্ষমতা এই ব্যাপক সাধারণ মানুষের নেই। এভাবেই তাদের মনে জন্ম নিলো 'নসীব' বা বিধির বিধান জাতীয় মহাসান্ত্বনা বা আধ্যাত্মিক শান্তির চিন্তাধারা।

সুতরাং আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, আদিমকালে ধর্ম বলতে কিছুই ছিল না– ছিল না শোষণ বৈষম্য অসংগতি। যখনই সমাজে উৎপাদন ব্যবস্থার অগ্রগতি সাধিত হতে লাগলো, তখনি প্রয়োজনাতিরিক্ত বাড়তি সম্পদকে কেন্দ্র করে মুষ্টিমেয় মানুষের মনে সেই সম্পদকে ব্যক্তিমালিকানায় ভোগ-দখলের লোভ-লালসার উদ্ভব ঘটলো। এই ব্যক্তিমালিকানাকে জায়েজ করার লক্ষ্যে ধর্মের সূত্রপাত ঘটলো– ব্যক্তিমালিকানাকে কেন্দ্র করে সমাজের বুকে প্রভু-দাসের আবির্ভাব ঘটলো– সমাজে শ্রেণীসত্তার বীজ অঙ্কুরিত হলো– তখনই দেখা দিলো অসংগতি বৈষম্য শোষণ বঞ্চনা অত্যাচার ও নির্যাতনের হোলিখেলা। দেখা গেল কেউ কাজ করেও খেতে পায় না– কেউ কাজ না করেই খায়, সমাজের বুকে শানশওকত শাসন তদারকী প্রভাবপ্রতিপত্তি জ্ঞানগরিমা প্রদর্শন করে। এসবই হলো ধর্ম ব্যবস্থার ফলশ্রুতি।

ধর্ম সম্পর্কে আরো একটা কথা। প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী তার নিজ ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করে থাকেন, প্রচার করে থাকেন। প্রচলিত সবকটি ধর্মের কেন্দ্রে স্থান পেয়েছেন 'মহাপ্রভু'– কারো দৃষ্টিতে তিনি আল্লাহ, কারো দৃষ্টিতে গড, কারো দৃষ্টিতে ঈশ্বর, কারো দৃষ্টিতে ভগবান, কারো দৃষ্টিতে প্রভু, কারো দৃষ্টিতে অমুক, কারো দৃষ্টিতে তমুক ইত্যাদি। এসব নামগুলো এসেছে প্রতিটি ধর্মাবলম্বীদের ভাষা থেকে। সেই 'মহাপ্রভু'র সর্বজনস্বীকৃত একটি শাশ্বত নাম নেই। প্রতিটি ধর্মাবলম্বীদের জন্যে তিনি নাকি একজন করে নবী ও একটা করে কেতাবী ধর্ম তাদের নিজস্ব ভাষায় নাজেল করেছেন। কোরআনের মতে নবী পয়গম্বরদের সংখ্যা ১ লক্ষ ২৪ হাজার/২ লক্ষ ২৪ হাজার। প্রেরিত বা আসমানী কেতাবের সংখ্যা একশতের ওপর। উল্লেখিত গরমিল হিসেবের নবীদের মধ্যে কোরআনে মাত্র ২৬ জন নবীর নাম বর্ণিত আছে, আর আসমানী কেতাবের মধ্যে চারটি বহাল রেখে বাকিগুলো বাতিল করে দেয়া হয়েছে। সেই চারটি হলো : (১) দাউদ (আঃ)-এর তাওরাত, (২) মুসা (আঃ)-এর যাবুর, (৩) ঈশা (আঃ)-এর ইনজিল ও (৪) মোহাম্মদ (সঃ)-এর কোরআন। কোরআনে বর্ণিত অন্যান্য নবীদের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনও করতে হয়– তবে তাঁদের ওপর নাজেলকৃত কেতাবগুলো বাতিল করা হয়েছে। উল্লেখিত চারজন নবীর পূর্ব পুরুষ খুঁজলে পাওয়া যায় আব্রাহাম বা ইব্রাহিম (আঃ)-কে। অর্থাৎ সময়ের বিরাট ব্যবধান হলেও এঁরা

একই বংশ থেকে আবির্ভূত হয়েছেন। মুসলমান ধর্ম মতে ইসলাম ধর্ম ও মোহাম্মদ (সঃ)-ই হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম ও সর্বশেষ নবী। এ কথা ঘোষণা করা হলেও কোরআনের মধ্যেই বলা হয়েছে যে, আমরা যুগে যুগে প্রত্যেক ভাষাভাষী লোকের মধ্যে সেই ভাষায় কেতাব এবং নবী নাজেল করেছি যাতে সেই ভাষাভাষী লোকেরা সহজেই বুঝতে পারে। এবং এও বলা হয়েছে যে, যারা পাপী বা অপরাধী তাদেরকে আল্লাহ বলবেন, আমি কি তোমাদের মধ্যে কেতাব ও নবী পাঠাইনি যে তোমরা আমার নির্দেশাবলী পাওনি? এ ব্যতীত কোরআনে বলা হয়েছে যে, সেবিয়ানস, মেজিয়ানস, পলিথিস্ট, খ্রিস্টান, জুইশ, মুসলমান, স্ক্রীপচার্স এবং অন্যান্য যারা এক আল্লাহ এবং শেষ বিচারের দিনে বিশ্বাস রাখে, সৎপথে চলে– তাদের কোনো ভয় নেই– নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন।

অর্থাৎ কোরআনের মতে আল্লাহ প্রত্যেক ভাষাভাষী লোকদের ধর্মের জন্যে একটি করে কেতাব ও একজন করে নবী পাঠিয়েছেন। এবং প্রত্যেক নবীই মানবজাতির কাছে শ্রদ্ধার পাত্র। বর্তমান বিশ্বে গৌতম বুদ্ধের ধর্মাবলম্বী মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। শ্রীকৃষ্ণের ধর্মাবলম্বী তথা হিন্দুধর্মের লোকের সংখ্যাও ৪র্থ স্থানে রয়েছে। এ ব্যতীত মহাবীর, কনফুসিয়াস, চৈতন্যদেব, গুরু নানক অন্যান্য ধর্মপ্রবর্তকদের ধর্মের অনুসারীদের সংখ্যাও কম ছিল না বা নয়– এরাও ঐ ১/২ লক্ষ ২৪ হাজার নবীদের কাতারে আছেন কিনা তা আমাদের জানা নেই। যেহেতু এরাও ধর্মপ্রবর্তক সেহেতু এঁরাও সমভাবে শ্রদ্ধার পাত্র কিনা!

এ ব্যতীত যে চারটি কেতাব শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়েছে এবং উল্লেখিত চারজন নবীর ওপর তা নাজেল হয়েছে– আমাদের জানামতে ঐ চারটি কেতাব উক্ত নবীদের মৃত্যুর অনেক পরে গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়েছে এবং ঐ কেতাবগুলো সংকলিত হওয়ার ব্যাপারে তাঁদের অনুমতি বা অনুমোদন ছিল কিনা তাও আমাদের জানা নেই। তাওরাত ও যাবুর সম্পর্কে আমাদের জানা নেই– তবে বাইবেল (ইনজিল) সংকলিত হওয়ার পর একে কেন্দ্র করে ঐ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে রক্তাক্ত সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়েছিল, ফলে বাইবেল দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তদ্রূপ এর অনুসারীরাও বিভক্ত হয়ে পড়েছে। অপর দিকে কোরআন সংকলিত হওয়ার পরও রক্তপাত হয়েছিল এবং কোরআনের ব্যাখ্যাসমূহকে কেন্দ্র করে এর ধর্মাবলম্বীরা ৭২/৭৩ ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীরা নিজ নিজ ধর্মকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন এবং ধর্ম নিয়ে জবরদস্তি ও বাড়াবাড়ি করে থাকেন।

সুতরাং শুধু ইসলাম ধর্মই নয়, প্রচলিত অন্যান্য সব ধর্মের মধ্যে এর চেয়েও অধিক পরস্পরবিরোধী বক্তব্য, নানান গরমিল, অব্যবস্থা ও নানান অসংগতি এবং সন্দেহ বিশ্বাসহীনতার নানান প্রেক্ষাপট সচেতন মানবমনে প্রায়শই উদয় হয়ে থাকে। এ প্রেক্ষিতে ধর্ম নিয়ে, ধর্মের মধ্যে থেকে মানুষ কতটুকু উপকৃত হতে পারে– সে-ব্যাপারে নানান মতবিরোধ রয়েছে।

এ প্রেক্ষিতে কোরআন ও বাইবেলের দুটি কাহিনীর উল্লেখ করছি, যেখানে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেমন (১) পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আছে বা আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে যে, হযরত ইব্রাহিম তার পুত্র হযরত ইসমাইলকে আল্লাহর অভিপ্রায়ে কোরবানী দিতে উদ্যত হয়েছিলেন। কিন্তু বাইবেলে রয়েছে হযরত ইব্রাহিম তার পুত্র হযরত ইসহাককে কোরবানীর নিমিত্তে আল্লাহর ইচ্ছায় বলিদান করতে উদ্যত হয়েছিলেন। এখন প্রশ্ন : তাহলে কোনটি সত্য– ইসমাইল, না ইসহাককে হযরত ইব্রাহিম কোরবানী দিতে উদ্যত হয়েছিলেন? (২) আমরা শুনে আসছি বা পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আছে যে, হাজেরা বিবি হযরত ইব্রাহিমের স্ত্রী ছিলেন– কিন্তু বাইবেলে আছে সারাহ ছিলেন হযরত ইব্রাহিমের স্ত্রী; তাঁর আরো ছিল অনেক উপপত্নী– হাজেরা ছিলেন ইব্রাহিমের দাসী। এখন প্রশ্ন : কোনটা সত্য?

এ প্রসঙ্গে কেউ কেউ বলতে পারেন : পবিত্র কোরআনসহ অন্যান্য তিনটি গ্রন্থ [ইনজিল (বাইবেল), তাওরাত ও যাবুর] আল্লাহ প্রেরিত পবিত্র গ্রন্থ, তবে কোরআন নাজেল হওয়ার পর নাকি তিনটি গ্রন্থকে বাতিল করে দেয়া হয়েছে। তাহলে এখানে প্রশ্ন আসবে, পবিত্র বাইবেলও আল্লাহ প্রেরণ করেছিলেন, কাহিনীগুলো তাঁরই মাধ্যমে এসেছে– যা পবিত্র কোরআনও বহন করে এনেছে, তাহলে একই কাহিনীর মধ্যে এ ধরনের অসংগতি বা পরস্পরবিরোধিতা এলো কেমন করে? তাহলে আল্লাহ বাইবেলে বলেছেন এক কথা, কোরআনে বলেছেন অন্য কথা? যিনি আল্লাহ, তাঁর কি এমনভাবে ভুল হতে পারে? নিশ্চয়ই নয়। তাহলে প্রশ্ন উঠবে, ঐ গ্রন্থ বা কাহিনীগুলো কি আল্লাহ প্রদত্ত, না কোনো মানব কর্তৃক লিখিত বা বর্ণিত?

এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে ধর্মকে নিয়ে নানান দ্বিধাদ্বন্দ্ব-সংঘাত সত্য-মিথ্যার প্রতিযোগিতা।

এ কারণেই সাম্যবাদী বা সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মের গুরুত্বকে স্বীকার করা হয় না। তাই বলে হাজার হাজার বছর পূর্ব থেকে প্রচলিত ধর্মমত– যা মানুষের মন-মানসিকতা, অস্থি মজ্জা রক্ত মাংসের সাথে একাকার হয়ে মিশে গেছে– সেই ধর্মমতে অভ্যস্ত সমাজদেহ থেকে ধর্মকে

ঝেঁটিয়ে বিদায় করাও হয় না। তবে এটাকে শুধুমাত্র ব্যক্তিজীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া হয়।

ধর্ম হলো শোষণের একমাত্র কার্যকরী মহাহাতিয়ার। তাই ধর্ম সমাজের কোনো সমস্যার সমাধান দিতে পারে না– উৎপাদনের কোনো কাজেই আসে না। সুতরাং সমাজরাষ্ট্রিক জীবনের কোনো কর্মকাণ্ডে ধর্মের কোনো প্রয়োজন অনুভূত হয় না বা এ জাতীয় ক্ষেত্রের সাথে ধর্ম কোনো সহায়তাও করে না। বরং সামাজিক অশান্তি, অসংগতি, বৈষম্য, শোষণ, সাম্প্রদায়িক বিভেদ ইত্যাদির পক্ষে বা নসীব অথবা বিধির বিধান জাতীয় গাঁজাখোরি সান্ত্বনার বাণী দিয়ে মানুষকে নিষ্ক্রিয়, পরনির্ভরশীল ও অন্ধতিমিরে ডুবিয়ে রাখতে সাহায্য করে। তাছাড়া বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্র থেকেও মানুষকে পিছিয়ে রাখতে সাহায্য করে। এমনকি হত্যাকাণ্ড রক্তপাত হানাহানি ব্যভিচার পৈশাচিকতা হিংসা বিদ্বেষ ইত্যাদির কাহিনীতে ধর্মের ইতিহাস কলুষিত এবং এগুলোকে ধর্ম সমর্থনও দিয়ে থাকে। তবে সমাজের কিছু কিছু নৈতিকতার ক্ষেত্রে ধর্মের অবদানও দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু সমাজের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে তা ধোপেই টেকে না। সবচে বড় কথা হলো, সমাজের সার্বিক অগ্রগতি বিকাশ কল্যাণ সমৃদ্ধি শান্তি– সবকিছু চিহ্নিত রয়েছে শ্রেণীসংগ্রাম– শ্রেণীহীন ও শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে। কিন্তু এসবের কোনো সমর্থন ধর্মের মধ্যে নেই বা কোনো পথনির্দেশও নেই। এখানেই সাম্যবাদের সাথে ধর্মের আদর্শগত মতবিরোধ।

প্রশ্ন আসবে– ধর্ম যখন মানুষ ও সমাজের সার্বিক অগ্রগতি বিকাশ ও কল্যাণের পথের যাবতীয় সমস্যার কোনো সমাধান দিতে পারে না, তাহলে কিসের ওপর ভিত্তি করে সমাজের বুকে ধর্ম আজো টিকে আছে– মানুষ কেনোইবা ধর্ম পালন করে? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে বেশি বেগ পেতে হয় না। আর তা হলো, হাজার হাজার বছর পূর্ব থেকে সমাজের বুকে ধর্ম প্রচলিত হয়ে আসছে– মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞান– অভাব ক্ষুধা দারিদ্র্য রোগ শোক শোষণ অত্যাচার– অনেক প্রাকৃতিক নৈসর্গিক ক্ষেত্রে মানুষের অজ্ঞতা ইত্যাদি মানুষের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে, যা থেকে মানুষ পুরোপুরি মুক্ত হতে সক্ষম হতে পারেনি। তাদের অজ্ঞতা অসহায়ত্বতা দারিদ্র্য ইত্যাদিকে এখনো তারা নসীব বা বিধির বিধান বলে মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে– কারণ সমাজ থেকে এখনো এগুলো অপসারিত করা সম্ভব হয়নি। এসব থেকে পরিত্রাণ পাবার লক্ষ্যে এক শ্রেণীর ধর্মব্যবসায়ী বুদ্ধিজীবীশ্রেণী তাদের কানের কাছে আধ্যাত্মিকতাবাদের বা পারলৌকিক শান্তির বাণী শুনিয়ে যাচ্ছে। এসব কারণে, বিশেষ করে জাগতিক শান্তি যখন

জাগতিকভাবে অর্জিত হতে না দেখে তখনি মানবমন আধ্যাত্মিকশক্তির প্রতি নিজেকে সমর্পণ করে দিতে বাধ্য হয়– তখনি ধর্মের মধ্যে মানুষ নিজেকে সঁপে দিয়ে অলৌকিক সান্ত্বনা খুঁজে পেতে চায়। এ কারণেই মানবমন ধর্ম মানতে চায়– শান্তি পেতে চায়। ধর্মই যে জাগতিক অশান্তিকে ডেকে আনতে সহায়তা করেছে– সীমাবদ্ধ জ্ঞানের মানুষ তা বুঝতে অক্ষম।

সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা দুর্বলতা দুর্বিপাক অভাব দরিদ্রতার সুযোগ গ্রহণ করেছে– তাদের সহায়ত্বতা ও পরনির্ভরশীলতাকে পুঁজি করেছে এক শ্রেণীর স্বার্থবাদী কৌশলী বিজ্ঞ মানুষ, উত্তরণ ঘটিয়েছে নানান বিধিবিধান নিয়ম-শৃঙ্খলা আধ্যাত্মিকতাবাদকে টেনে এনে, এসবই সাধারণ অজ্ঞ মানুষকে শোষণ করার লক্ষ্যে। অর্থাৎ সমাজ বিকাশের একটি স্তরে তৎকালীন সমাজের প্রাকৃতিক পরিবেশগত বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপটে ধর্মের সূত্রপাত ঘটেছে এবং এর চেতনাশক্তিকে শোষক-পরজীবীশ্রেণী তাদের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার হাতিয়ারে পরিণত করেছে অত্যন্ত সুকৌশলে ও সুচিন্তিতভাবে যা সাধারণ অজ্ঞ দুর্বল মানুষের চিন্তাধারায় এর নানান আবরিত রূপপ্রকৃতি ধরা পড়েনি। ফলে একটা বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতেই মানুষের মনের ওপর ধর্ম প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে। এবং কালক্রমে এর প্রভাবে গড়ে উঠেছে মানুষের চিন্তাচেতনা ধ্যানধারণা ও সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবেশ। তাই হাজার হাজার বছর থেকে সমাজের বুকে ধর্ম প্রচলিত হয়ে আসার ফলশ্রুতিতে ধর্মও মানুষের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। ফলে মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে ধর্ম তাকে মোহগ্রস্ত করে রাখছে। এ প্রক্রিয়ায় ধর্ম বর্তমান সমাজের বুকে উত্তরাধিকার ভিত্তিতেই প্রচলিত হচ্ছে।

যেমন একটি শিশু মুসলমান ঘরে জন্ম নিলে তার নাম-ধাম-পরিচয় ইত্যাদি মুসলমান ধর্মমতে বা ইসলাম ধর্মমতে হয়ে থাকে। তদ্রূপ যদি ঐ একই শিশুটি খ্রিস্টান বা হিন্দু ঘরে জন্ম নিতো তাহলে তার পরিচয় খ্রিস্টান বা হিন্দু ধর্মমতে সংঘটিত হতো। অর্থাৎ পিতা-মাতা বা বংশের ধর্মগত পরিচয়ের সাথেই সদ্যভূমিষ্ট শিশুর পরিচয়ও সেই ধর্মগত পরিচয়ে পরিচিত হয়ে থাকে।

কিন্তু ব্যক্তির নামের সাথে ধর্মগত নাম রাখতেই হবে– এটা ভাবা একেবারেই বোকামির শামিল। ধর্মের সুপারিশকৃত কোনো নাম নেই। যা কিছু আছে তা হলো ভাষাভিত্তিক। তাছাড়া ধর্মের দিক থেকে কোনো নামকে সেই ধর্মভিত্তিক হতে হবে– এর সপক্ষে তেমন যুক্তিও নেই। এ প্রসঙ্গে মহানবীর ব্যক্তিনামটি প্রণিধানযোগ্য। ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের পরও সাবেক

ধর্মভিত্তিক ভাষাগত শব্দের নামটি তিনি পরিহার করেননি। এককালে যে উমর ছিলেন মহানবীর ঘোর শত্রু, কাফের– সেই উমর ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলেও তাঁর নামের ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন আসেনি। একইভাবে বিবি খাদিজা, আবু বকর, ওসমান, আলী, মাবিয়া তথা কারো ইসলাম ধর্মপূর্বনামের পরিবর্তন হয়নি। অর্থাৎ ধর্মের সাথে মানুষের নামের কোনো সম্পর্ক নেই। নাম হলো প্রচলিত মাতৃভাষা থেকে আগত শব্দ ও অক্ষরের সমষ্টিগত কোনো বস্তুর পরিচিতি সত্তা বা কোনো একটি বস্তুকে চেনার জন্য সেটাকে একটি সাংকেতিক শব্দ দ্বারা চিহ্নিতকরণ; প্রচলিত ভাষাগত শব্দ-অক্ষরের সমষ্টি দিয়ে। এর মধ্যে ধর্মীয় কোনো তন্ত্রমন্ত্র নেই।

এ ব্যতীত যেমন সুকর্ণ, সুহার্ত, গাদ্দাফী, খোমেনী প্রভৃতি নামগুলো আরবি ভাষার নাম নয়। অথচ তাঁরাও তো মুসলমান হিসেবে নিজেদের চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আমাদের বাংলাদেশে– বিশেষ করে বাংলাদেশে আরবি নাম ব্যবহারের প্রবণতা খুবই প্রকট। এই দেশের মুসলমান ঘরে কোনো শিশুর জন্ম হলে তার নাম ঘটা করে আরবি থেকে টেনে এনে তা ইসলামী নাম বলে চালিয়ে দেয়া হয়। বলা হয়– আল্লাহর ৯৯টি নামের যে কোনো একটিকে বেছে নিলে অধিক নেকী বা ছওয়াব হাসিল হয়, মুসলমান বা ইসলামী হিসেবে পরিচিত হয়, আল্লাহর নেকনজর ও বরকত লাভ হয়। কিন্তু তাহলে প্রশ্ন আসে, ইসলাম-পূর্ব সমাজের ভাষাগত বা ধর্মগত নামটি কেনো মহানবী বা অন্যান্য ব্যক্তিরা পরিবর্তন করলেন না? সুকর্ণ, সুহার্ত, গাদ্দাফী, খোমেনী নামগুলোতে আরবি ভাষা ও আল্লাহর ৯৯ নামের একটির সাথেও মিল নেই। তবে কি তারা ইসলাম ধর্ম বা মুসলমান থেকে খারিজ হয়েছেন? তাঁরাও কি আল্লাহর বরকত হতে বঞ্চিত হয়েছেন? আগা খানও তো ইসলাম ধর্মের ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের নেতা এবং বিশ্বের অন্যতম ধনাঢ্যব্যক্তি– তাঁর নামটি কোন আরবি ভাষা থেকে এসেছে? আল্লাহর বরকত হতেও তো তিনি বঞ্চিত হননি। অন্যান্য ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের লোকদের নামের ক্ষেত্রে একই প্রবণতা বিদ্যমান।

সুতরাং আমাদের দেশে মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকদের নামকে নিয়ে এই যে আরবি ভাষার জারিজুরি ও মহিমা তা প্রকৃতপক্ষে ইসলামী নাম নয়। এগুলো আরবি বা ফার্সি ভাষার নাম। ধর্মের সাথে নামের কোনোই সম্পর্ক নেই। তদ্রূপ ইসলামী লেবাস বা পোশাক বলতেও কিছু নেই। আরবের লোকদের পাগড়ি-কোর্তা-টুপি ইত্যাদি পোশাক-পরিচ্ছদকে সাধারণ মানুষ– বিশেষ করে মোল্লা সাহেবরা মনে করেন যে ওগুলো ইসলামী পোশাক।

ওগুলো অনুকরণ ও পরিধান করে তারা মনে করেন যে তারা সাংঘাতিক রকমের ধার্মিক হয়েছেন, ইসলামের পাক্কা অনুসারী হয়েছেন এবং অধিক নেকী লাভ করে ফেলেছেন বলে আত্মতৃপ্তি লাভ করেন, অপরকে তা অনুকরণ করতে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। অথচ এসবের মধ্যে ইসলামের নাম-গন্ধ নেই। এ ব্যাপারে ইসলামের কোনো সুপারিশও নেই। আমাদের দেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে বিশেষ করে পাগড়ি-কোর্তাও যে একটি বিরাট অপচয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই অপচয় বিষয়ে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে : 'যারা অপচয় করে তারা শয়তানের ভাই'।

আরব দেশে আমরা যে পোশাক-পরিচ্ছদ দেখি তাহলো আরবীয় জাতীয় পোশাক– যা ঐ দেশের ভৌগোলিক আবহাওয়া-জলবায়ু-মাটি, সামাজিক পরিবেশ ও তাদের ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপটে স্বীকৃত। আর তা ইসলাম প্রবর্তনের বহুপূর্ব থেকে প্রচলিত। আমাদের লুঙ্গি গেঞ্জি গামছা যেমন আরব দেশের আবহাওয়ায় অচল প্রমাণিত হবে– তেমনি আরবের পাগড়ি-কোর্তা আমাদের দেশেও বেমানান। কারণ পোশাকের সাথে জড়িয়ে আছে একটি দেশের বা অঞ্চলের ভৌগোলিক আবহাওয়া-জলবায়ু ও অন্যান্য সামাজিক ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য।

দাদা-দাদি, মাতা-পিতা, পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন ধর্ম পালন করে বলেই তাদের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ধর্ম পালনের মানসপ্রবৃত্তি গড়ে ওঠে। এবং এভাবেই ধর্ম একটি উত্তরাধিকারভিত্তিক সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রথা হিসেবে প্রচলিত হয়ে আসছে। যেমন সদ্যভূমিষ্ট শিশু কোনো ধর্মমত নিয়ে পৃথিবীতে আসে না। বয়োঃবৃদ্ধির সাথে সাথে সে তার আত্মীয়স্বজন ও সামাজিক পরিবেশের অনুকরণে ও শিকারে পরিণত হয়ে সেই সমাজের একজন হয়ে যায়। অর্থাৎ তার পারিপার্শ্বিক বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতেই তার মন-মানসিকতা তথা মনোজগত পরিচালিত আবর্তিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

এভাবেই ধর্ম মানুষের জীবনে ও সমাজের বুকে আবির্ভূত হয়েছে এবং মানুষ ও সমাজের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের মধ্যে ধর্ম প্রভাব বিস্তার করেছে। অজ্ঞ দুর্বল সাধারণ মানুষের দুর্গতির নেপথ্য নায়কচক্র তথা প্রতিক্রিয়াশীল শাসক-শোষক ধর্মব্যবসায়ী বুদ্ধিজীবীশ্রেণী দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে তারা ধর্মের নব নব ফেকা ও বিধিবিধান প্রচার করে চলেছে– গোয়েবলসীয় অপপ্রচারের মাধ্যমে ধর্মকে ইহজাগতিক ও পারজাগতিক যাবতীয় কল্যাণ সমৃদ্ধি সুখ শান্তির একমাত্র বাহন বলে মহিমান্বিত করে চলেছে নিজেদের সীমাহীন জাগতিক ব্যক্তিস্বার্থ সংরক্ষিত সুসংহত ও নিরাপদে চরিতার্থ করার লক্ষ্যে। ক্ষুধার্ত অভাবগ্রস্ত-দরিদ্রতার অভিশাপে জর্জরিত লোকদের উদ্দেশে

বলা হয়– এ জগতে যারা কষ্ট-সহিষ্ণুতা স্বীকার করে– পরজগতে তারাই মহাসুখী হবে। শোষণ-বঞ্চনায়, দুঃখ-দরিদ্রতায়, অনাহারে, অর্ধাহারে, আশা-নিরাশায়, রোগে-শোকে, অত্যাচার-নির্যাতনে, কুসংস্কার-ব্যভিচারে, নিষ্পেষণে-যন্ত্রণায়, ভাগ্যাহত-আশাহত ও সীমাহীন বেদনায়-যন্ত্রণার জালে আবদ্ধ সমাজের 'নসীব'-এর ওপর নির্ভরশীল ব্যাপক অজ্ঞ দুর্বল মেহনতি শ্রমজীবী মানবগোষ্ঠীর সামনে দাঁড়িয়ে ধর্মীয় বুদ্ধিজীবীশ্রেণী নানান সান্ত্বনাজাত আধ্যাত্মিক অতিপ্রাকৃতিক পারলৌকিক বা ঐশ্বরিক কাহিনীর ফিকির জাহির করে থাকে। অথচ শোষক-ধর্মব্যবসায়ী বুদ্ধিজীবীদের ঐ জাতীয় দুর্যোগ দুর্গতি ও দুর্বিপাকের মধ্যে পড়তে হয় না।

সুতরাং উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে বিচার-বিশ্লেষণ করে আমরা এই মর্মে উপনীত হতে পারি যে, ধর্ম হলো স্বৈরতান্ত্রিক প্রতিক্রিয়াশীল শাসক-শোষক-ধর্মব্যবসায়ী বুদ্ধিজীবীশ্রেণী– মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানদের ইহজাগতিক সুখশান্তি ভোগবিলাস আরামআয়েশ প্রভাবপ্রতিপত্তি মানসম্মান কল্যাণ সমৃদ্ধি তথা ব্যক্তিস্বার্থোদ্ধারের মহাহাতিয়ার। আর শোষিত বঞ্চিত লাঞ্ছিত অত্যাচারিত নির্যাতিত ভাগ্যাহত ক্ষুধিত সর্বহারা মেহনতি শ্রমজীবী– 'নসীব'-এর ফ্যারে পতিত– 'ভাগ্যে'র নির্মম পরিহাসের শিকারে পরিণত ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ অজ্ঞ দুর্বল সাধারণ মানবগোষ্ঠীর পারজাগতিক-পারলৌকিক প্রাপ্তীয় পুরস্কারের মহাসান্ত্বনা। আর এই মহাসান্ত্বনা বা ধর্মকে তারা আফিমের মতো গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে নানান আভরিত-আবরিত-মহিমান্বিত প্রচারের জারিজুরির মাধ্যমে। সুতরাং মনুষ্যজীবনের দুর্বিপাক-দুর্গতি যতদিন পর্যন্ত দূরীভূত না হবে– ততদিন মানুষের ঐ মহাসান্ত্বনা আফিমীয় নেশা উবে যাবে না। সাম্যবাদী দর্শন মানুষের এই দুর্বিপাক-দুর্গতিকে সমূলে উৎপাটিত করার লক্ষ্যেই আবির্ভূত হয়েছে। তবে এ কথাও সত্য– যে বাস্তবতা থেকে ধর্মবিশ্বাসের উৎপত্তি– সেই বাস্তব অবস্থার পরিবর্তন-বিবর্তন না-ঘটা পর্যন্ত শুধুমাত্র তত্ত্বীয় শিক্ষা প্রচার ও জবরদস্তিমূলক পন্থায় মানুষের ধর্মবিশ্বাস বা কোনো একটি প্রচলিত ভাববাদী চিন্তাকে অপসারণ করা যাবে না।

এই পার্থিবজগতটা অতি বাস্তব। পৃথিবী অজ্ঞেয় নয়। যা-কিছু আমরা দেখি-জানি ও অনুভবি– এসবের মূলে রয়েছে বাস্তবতার ফলশ্রুতি। আর দৃশ্যমান বস্তু থেকেই বাস্তবতার উৎপত্তি। যেসব বস্তু আমরা দেখি– তার বাইরেও হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বস্তু আছে। তবে যেসব বস্তু এখনো আমাদের কাছে অজ্ঞাত বা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে– তা যে একেবারে অজ্ঞেয়ই থেকে যাবে– এমনতর ভাবনার কোনো অবকাশ নেই। বিজ্ঞানের অগ্রগতির মধ্য দিয়েই সব অজ্ঞেয় বস্তুকে মানুষ প্রত্যক্ষ করতে পারবে। আদিযুগের

মানুষ– আমরা যা প্রত্যক্ষ করি– তার অনেক কিছুই তারা প্রত্যক্ষ করেনি বা ভাবতেও পারেনি। আবার আমরা যা ভাবতে পারি না– আগামী মানুষ অবশ্যই তা প্রত্যক্ষ করবে। বিজ্ঞানের কার্যক্রম এ পথের সন্ধান দেবে। সুতরাং পার্থিব জগতে অবাস্তব বলতে কিছুই নেই। অস্তিত্বহীনতার অপর নামই হলো অবাস্তবতা– যাকে অলীক বলাই শ্রেয়।

পৃথিবীতে অনেক প্রাকৃতিক ঘটনা আছে যা মানুষের বুঝশক্তি ও জ্ঞানের বাইরে– ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। জন্ম-মৃত্যু এখন আর বিজ্ঞানের কাছে রহস্যাবৃত নয়। তেমনি মহামারি আগ্নেয়গিরি ভূমিকম্প বন্যা-ঝড়, রাত-দিন, সূর্য-চন্দ্র-বাতাস, জোয়ার-ভাটা, মেঘ-বৃষ্টি প্রভৃতি রহস্যের জট মানুষের কাছে খুলে গেছে বিজ্ঞানের বদৌলতে। তবুও অনেক কিছু এখনো মানুষের বা বিজ্ঞানের নিয়ন্ত্রণাধীন হতে পারেনি। তবে এর অর্থ এই নয় যে, আজ যা অজ্ঞেয়– আগামীতে তা বিজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হবে না। অবশ্যই হবে– সময়ের ব্যবধান মাত্র। আকাশে ওড়া একদা মানুষের কল্পনায়ও আসেনি– কিন্তু শুধু আকাশে ওড়াই নয়– কোটি কোটি মাইল দূরে অবস্থিত বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহে মানুষের পদার্পণও ইতোমধ্যে সম্ভব হয়েছে। আরো অনেক কিছু বিজ্ঞানের বদৌলতে সম্ভব হয়েছে–হচ্ছে যা নিকটাতীতের মানুষও ভাবতে পারেনি। এসবই ছিল তাদের কাছে অজানা অজ্ঞাত রহস্যাবৃত ও অবাস্তব। আর এই অজ্ঞতা থেকেই মানুষের মনে অন্ধবিশ্বাস বা ধর্মবোধের সূত্রপাত ঘটেছে– সে-বিষয়ে সন্দেহের কোনোই অবকাশ নেই।

আর এই শোষণবাদী অন্ধকারমুখী প্রগতিবিরোধী নসীবসৃষ্টিকারী ভাওতাবাজী ধর্মবিশ্বাস চিরকাল টিকে থাকবে কি? থাকবে না। পর্যায়ক্রমে বিজ্ঞানের অগ্রগতি বিকাশ উন্নতি এবং তার প্রয়োগে মানুষের সব অজ্ঞতা অন্ধতা অভাব দরিদ্রতা অসহায়তা ও অনিশ্চয়তা কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মবোধ ও ধর্মবিশ্বাসের শীতলমৃত্যুঘণ্টা বেজে যাবে। এমনও একদিন আসতে বাধ্য যখন মানুষ পার্থিবজগত ও বস্তুর বাইরে কোনো অদৃশ্য শক্তি অলৌকিকতা আধ্যাত্মিকতা পরজাগতিকতা ইত্যাদি সম্পর্কে মাথা ঘামাবে না– চিন্তাভাবনা করবে না– বিশ্বাস করবে না। নসীব বা বিধির বিধানের ধূম্রজালে মানুষকে বেঁধে রাখা যাবে না। ইতোমধ্যে এ প্রক্রিয়া শুরুও হয়ে গিয়েছে। আদিম মানুষ যেমন নিজের পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার ওপর নির্ভর করতো– তেমনি আগামী মানুষও পরিশ্রম প্রচেষ্টা ও আত্মশক্তিতে বলিয়ান হয়ে জীবনকে নিজের মতো করে গড়ে তুলবে। তবে এ লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্যে মানুষকে তাদেরই মধ্যকার শক্তিশালী ক্ষমতাশালী সম্পদশালী

অতিবিজ্ঞ ধূর্ত কৌশলী স্বৈরাচারী শাসক-শোষক এবং ধর্মব্যবসায়ী বুদ্ধিজীবী তথা কায়েমী স্বার্থান্বেষীচক্রের বিরুদ্ধে এক সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা-রক্তপাত-জীবনপাত করতে হবে, এক সর্বাত্মক বিপ্লবে অবতীর্ণ হতে হবে। তবে এ কথা সত্য যে মানুষ তার বাঁচার তাগিদেই এসবে অবতীর্ণ হবে, তাকে পথ দেখাবে আধুনিক সাম্যবাদী দর্শন। ইতোমধ্যেই সেই মহাসর্বাত্মক বিপ্লবের প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হয়েছে, বিপ্লবের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। বিপ্লব এগিয়ে আসছে দ্রুতগতিতে।

আমরা আমাদের আলোচনায় ফিরে আসি।

বর্তমান সমাজে এমনো অনেক লোক আছেন যাঁরা বস্তুর বাইরে ভাবতে আর রাজি নন, বিশ্বাস তো দূরের কথা। শোষক-মোল্লাতন্ত্রের দৃষ্টিতে এঁরা 'নাস্তিক'। সাম্যবাদী বা কমিউনিস্টদেরও এরা নাস্তিক খেতাবে ভূষিত করে ফেলেছেন। এ ব্যতীত এইসব নাস্তিকদের সাথে সেইসব লোকদেরকেও এক করে দেখার প্রবণতাও দেখা যায়, যাঁরা ধর্মবিশ্বাসী হয়েও সঙ্গতকারণেই সামাজিক রাজনৈতিক কার্যক্রমের সঙ্গে ধর্মকে না জড়িয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি মেনে চলতে চান তাঁদেরকেও তাঁরা নাস্তিক হিসেবে চিহ্নিত করতে চান। কারণ এই নীতির লোকেরা সামাজিক জীবন থেকে শোষণ অবিচারকে উচ্ছেদ করতে চান, এই শোষণ-অবিচারের হাতিয়ার ধর্মীয় কুসংস্কারকে বিদায় করতে চান এবং এসবকিছুর পরও তাঁরা ধর্মকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে চান না... ধর্মবিশ্বাসকে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার বিশ্বাসে রূপান্তরিত করতে চান। এ কারণেই তাঁরা ধর্মকে ব্যক্তিজীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার পক্ষপাতি। কিন্তু এই নীতির মধ্যেও শোষক-ধর্মব্যবসায়ীচক্র নাস্তিকতার গন্ধ খোঁজেন। কারণ ধর্মনিরপেক্ষ সাম্যবাদী সমাজে ধর্মব্যবসার কোনো সুযোগ নেই, শোষণ এখানে অচল। তাই ধর্মনিরপেক্ষতার কথা শুনলেই তাঁরা আঁতকে ওঠেন, ধর্মনিরপেক্ষ নীতিতে বিশ্বাসীদেরকেও 'নাস্তিক' নামে অপবাদ দিয়ে থাকেন।

মনীষী এঙ্গেলস ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে বেশ রসালো উক্তি করেছেন। তিনি বলেছেন : 'বৈদ্যুতিক আলো ভূত তাড়িয়ে দেয়।' অতঃপর মনীষী কার্ল মার্কস ও এঙ্গেলস এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, বিজ্ঞানের চরম উন্নতির ফলে সমাজেরও বিকাশ ও অগ্রগতি সাধিত হবে। এমতাবস্থায়, মানুষ যখন নিশ্চিত সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির সাথে বসবাস করবে, সমাজে শোষণ অবিচার থাকবে না, যখন প্রতিটি ঘটনার কার্যকরণ বুঝতে পারবে, যাবতীয় দুর্গতি দুর্যোগকে পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে, তখন ধর্মবিশ্বাস বলতে কিছুই থাকবে না।

এ প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, মানবেতিহাসের বিশেষ একটি স্তরে তখনকার সামাজিক বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপটে ধর্মবিশ্বাসের সূত্রপাত ঘটেছে– তেমনি একই মানবেতিহাসের একটি চরম উন্নততর স্তরে তদীয় সামাজিক বাস্তব অবস্থায় এর অবলুপ্তি ঘটতে বাধ্য। সুতরাং জবরদস্তি মূলক প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসকে খর্ব করার কোনো প্রয়োজন নেই।

এ কারণেই ইসলামও প্রচলিত ধর্মমতকে জবরদস্তিপন্থায় খর্ব করেনি বা জোর করে তার ধর্মীয় মতামতকে মানুষের ওপর চাপিয়েও দেয়নি। সামাজিক রাজনৈতিক ও আর্থবৈষয়িক ক্ষেত্রে বরং ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকেই স্বীকৃতি দিয়েছে। প্রকৃত সাম্যবাদীরাও ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিতে বিশ্বাসী– ধর্মকে রাতারাতি সমাজদেহ থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করার পক্ষপাতি নয়। কারণ ধর্মবিশ্বাস হয়ে পড়েছে মানুষের মানসিক আবেগের বিষয়। সেই সহজাত আবেগ বা প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসের ওপর আঘাত হানলে– সেই আবেগ ও বিশ্বাসের সপক্ষে মানুষ বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে। রক্তপাত জীবনপাত হানাহানি ঘটতে পারে। অতীতে এসব দেখা গেছে। মানুষকে বুঝানো হয়েছে যে, নাস্তিক, কাফের, বিধর্মীদের হত্যা করলে অশেষ নেকী হাসিল হয়... ধর্ম জেহাদে আত্মাহুতি দিলে শহীদী মর্যাদা বা বিনা হিসেবে বেহেশতবাসী হওয়া যায়। সুতরাং প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করলে ঐ বেহেশতের লোভ দেখিয়ে– নেকীর লোভ দেখিয়ে ধর্মব্যবসায়ী-শোষকচক্র মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলবে– সাম্যবাদী বিপ্লবের অপমৃত্যু হবে। তাই জোর করে নয়– বরং কীভাবে মানুষের অজ্ঞতা অন্ধত্ব অসহায়ত্ব অভাব দারিদ্র্য অনটন শোষণ বঞ্চনা কুসংস্কার ইত্যাদি অপসারণ করা যায়, সমাজের বিজ্ঞানভিত্তিক অগ্রগতি বিকাশ উৎপাদনবৃদ্ধি– সম্পদের সুষমবণ্টন, আর্থবৈষয়িক শ্রীবৃদ্ধি– সৎজ্ঞান সৎবিবেক প্রতিষ্ঠিত করা যায়– সেদিকেই সাম্যবাদীদের লক্ষ্য রাখতে হবে। এ লক্ষ্যকে সম্মুখে রেখে বিপ্লবে অবতীর্ণ হতে হবে। যেমন বিপ্লব চালিয়ে ছিলেন মহানবী এবং তাঁর চার খলিফা। আধুনিক রুশ বিপ্লব, ভিয়েতনাম বিপ্লব, চীন বিপ্লব, কোরিয়ান বিপ্লব, কিউবান বিপ্লব এবং বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু মুজিবের বিপ্লবের লক্ষ্য গতিপ্রকৃতি একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েছিল। সুতরাং মানুষের সার্বিক কল্যাণের মহাবিপ্লবে ধর্মবিশ্বাস নিয়ে মাথা ঘামানো বা কালক্ষেপণ করা প্রকৃত বিপ্লবীদের নীতি নয়।

এ প্রসঙ্গে মহামতি লেনিনের উক্তি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেছেন : 'শোষক সমাজের শোষিত মেহনতি মানুষকে শ্রেণীসচেতন করা, শোষকদের বিরুদ্ধে শ্রেণীসংগ্রাম পরিচালনা করার অর্থই হচ্ছে ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

করা।' কারণ শোষকসমাজই তার প্রয়োজনে ধর্মকে সৃষ্টি করে শোষণের হাতিয়ারে পরিণত করেছে। এই শোষকসমাজ ও তার শোষণের যাবতীয় উপকরণকে মূলোৎপাটন করতে পারলেই প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের বাস্তবভিত্তি আর থাকবে না। এবং বিজ্ঞানই মানুষ ও সমাজের মনমানসিকতা ও গতিকে সংস্কারমুক্ত করবে। সুতরাং ধর্মব্যবসায়ীদের ধর্মরক্ষার জেহাদ ঘোষণার মতো ধর্মাপসারণের জেহাদের কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ জেহাদ অর্থই রক্তপাত হত্যালীলা বীভৎসতা। প্রকৃত সাম্যবাদীরা এসব চায় না, তাদের কাছে প্রতিটি জীবনই মহামূল্যবান।

অনেকে বলেন এবং মনে করেন, কোনো একটা ধর্মবিশ্বাস বা আধ্যাত্মিক বিশ্বাস তথা ধর্মীয় নিয়ম-নীতি-শৃঙ্খলার ওপর বিশ্বাস না থাকলে মানুষ স্বৈরাচারী স্বেচ্ছাচারী সমাজদ্রোহী বিবেকহীন পাষণ্ড দুশ্চরিত্র ও হিংস্রজন্তুতে পরিণত হয়ে পড়বে। ধর্মহীনতা সকল অধঃপতন অনাচার ও বিশৃংখলাকে ডেকে আনবে। হানাহানি মারামারি রেষারেষি খুনাখুনি রক্তারক্তি অন্যায় জুলুম অবিচার ব্যভিচারী ডাকাতিতে লিপ্ত হবে, মানবতাবোধের কোনো দায়দায়িত্ব আর থাকবে না, 'জোর যার মুল্লুক তার' এই নীতিতে মানুষ হৃদয়হীন বর্বরতার তিমিরে ডুবে যাবে– এভাবেই মানবসভ্যতার পতন ঘটবে ইত্যাদি। বলাই বাহুল্য, প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের ধারক-বাহক যারা এবং যাদের মনমানসিকতা এই ধর্মবিশ্বাসে আচ্ছন্ন, যাঁরা জ্ঞানপাপী, যারা সবকিছুর গভীরে ও বাস্তবচিন্তায় অভ্যস্ত নন, যারা যাবতীয় শোষণ ব্যবস্থায় বিশ্বাসী, ব্যক্তিস্বার্থের পূজারী, সুবিধাবাদী, তারা এসব চিন্তার বাইরে ভাবতে নারাজ ও অক্ষম।

কিন্তু উপরোক্ত চিন্তাধারাসমূহ হলো উক্ত যুক্তিবাদীদের অজ্ঞতা দীনতা হীনতা দুর্বলতা ও সংকীর্ণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বার্থান্বেষী মানসের পাগলীয় সংলাপ এবং ভ্রান্ত ও উর্বরমস্তিষ্কপ্রসূত চিন্তাধারার ফসল। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রমাণ দিলেই তাদের যুক্তিকে কল্পনার ফানুস বলে উড়িয়ে দেয়া যাবে। যেমন :

(১) মাবিয়া-এজিদ অবশ্যই ধর্মবিশ্বাসী ও পাক্কা মুসলমান ছিলেন। তারাও এক আল্লাহ, পবিত্র কোরআন ও রাসূল তথা ইসলাম ধর্মের যাবতীয় বৈশিষ্ট্যে বিশ্বাসী ছিলেন। তো এতো বড় ধার্মিক হয়ে তারা কীভাবে মানবেতিহাসের সর্বাপ্রেক্ষা করুণ হৃদয়বিদারক মর্মান্তিক হত্যালীলা পৈশাচিক ক্রিয়াকলাপে...হিংসাত্মক জিঘাংসায়, পাষণ্ড বীভৎসতায়, অত্যাচার-নির্যাতনের হোলিখেলায় মেতে উঠেছিলেন মহানবীরই দৌহিত্র– আত্মীয়-স্বজনদের ওপর? ধর্মবিশ্বাসী হয়ে, একই ধর্মের অনুসারী হয়ে কীভাবে, কোন নৈতিকতার বলে তারা এহেন বর্বরতা ও উন্মত্ততার

কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছিলেন? যে মহানবী গণতান্ত্রিক শোষণহীন সাম্যবাদী ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার দিকদর্শন দিয়েছিলেন– খেলাফতে রাশেদীন যা বাস্তবায়িত করেছিল– সেই মহানবীর অনুসারী হয়ে, ধর্মমতে দীক্ষিত থেকে মহানবীপ্রদর্শিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমাজদ্রোহিতার নিদর্শনসরূপ অগণতান্ত্রিক উত্তরাধিকারভিত্তিক সামন্তবাদী স্বৈরতান্ত্রিক শাসন-শোষণ-ব্যবস্থার উত্তরণ ধার্মিক মাবিয়া-এজিদচক্র কর্তৃক সংঘটিত হয়নি? এ ব্যতীত তিনজন খলিফাকে কোন অধার্মিক বিধর্মীরা হত্যা করেছিল? যীশুখ্রিস্টের হত্যা– সক্রেটিসের হত্যা ও অন্যান্য মহামনীষীদের হত্যা কোন অধার্মিকদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল, হচ্ছে?

(২) পাকিস্তানি শাসক-শোষকরাও নিজেদেরকে সহিমুসলমান বা ধর্মের ধারক-বাহক-রক্ষক মনে করে থাকে, সেই ধার্মিকরা ধর্মের নামে বাঙালিদের ওপর বল্গাহীন শোষণ, স্বৈরতান্ত্রিক শাসন, নির্যাতন, বঞ্চনা– পাশবিক পৈশাচিক বীভৎস হত্যালীলা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়নি?

(৩) একই ধর্মমতে বিশ্বাসী হয়েও বাঙালি জতির জনক বঙ্গবন্ধু মুজিবকে মোশতাক-জিয়াচক্র ইতিহাসের কারবালা হত্যাকাণ্ডকে ম্লান করে দিয়ে মর্মান্তিকভাবে পরিবার-পরিজনসহ হত্যা করেনি? মোশতাক-জিয়াচক্র বাংলাদেশের বুক থেকে বঙ্গবন্ধুপ্রদর্শিত সাম্যবাদী শোষণহীন সমাজব্যবস্থাকে উৎপাটিত করে সাধারণ মানুষকে সর্বহারায় পরিণত করার এবং গুটিকতক মানুষের সীমাহীন সৌভাগ্য গড়ার পথ প্রশস্ত করে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা হত্যা করেনি?

(৪) চেঙ্গিস খান, হালাকু খান, অশোক, হিটলার ও অন্যান্য ব্যক্তিরা কোন অধার্মিক ছিলেন? ধার্মিক হয়েও কি তারা হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেনি? একই ধর্মে বিশ্বাসী হয়েও মীরজাফর, মিরণ, মোহাম্মদী বেগ নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাকে হত্যা করেনি? মীরজাফরচক্র বাংলার স্বাধীনতাকে ব্রিটিশের কাছে বন্ধক দেননি? ধার্মিক আওরঙ্গজেব পিতৃপীড়ন ভাতৃহত্যা ও গণহত্যা চালাননি?

(৫) ধর্মবিশ্বাসী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ধার্মিক শাসক-শোষক এশিয়া আফ্রিকা লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের শোষণকে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে– মেহনতি শোষিত মানুষের স্বাধীনতা ও মুক্তিকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে জঘন্যতম পৈশাচিক হত্যালীলা ও নির্যাতন চালায়নি? চালাচ্ছে না? একই ধর্মে বিশ্বাসী হয়েও আরব রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে হিংসা সংঘাত যুদ্ধ মারামারি হত্যালীলা সংঘটিত হচ্ছে না? নারী ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, প্রতারণা, শঠতা, বঞ্চনা ইত্যাদি যারা করেন তারা কি সকলেই

অধার্মিক? খোঁজ নিয়ে দেখুন, এরাও পাক্কা ধার্মিক। এ ব্যতীত আরো হাজার হাজার প্রমাণ দেয়া যায় ধার্মিক সাহেবদের কর্মকাণ্ডের। প্রচলিত ধর্ম ও ধর্মের ধারক-বাহকদের ক্রিয়াকলাপ নারীসমাজের ওপর কী নিদারুণ বঞ্চনা ও অত্যাচার ডেকে আনে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ধর্মের মধ্যে থেকে, ধর্মের দোহাই দিয়ে এবং ধর্মের সমর্থন নিয়েই এ জাতীয় মানবতাবিরোধী কার্যকলাপকেই আমরা প্রত্যক্ষ করেছি এবং প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করছি।

সুতরাং উক্ত যুক্তিবাদীদের চিন্তাধারা প্রমাণসিদ্ধ নয়। এসবই কাল্পনিক চিন্তাধারা। এ জাতীয় কল্পকথা ও জুজুর ভয় দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত বিচলিত করে ধর্মীয় শোষণ তথা শোষকসমাজকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে সাজানো হয়ে থাকে নানান আভরণে ও আবরণে। এ কাল্পনিক চিন্তাধারা সাধারণ মানুষের মানসিক বিকার সৃষ্টি করে থাকে– মানুষের মন-মানসিকতাকে অন্ধমরীচিকার পেছনে ধাবিত করে তার স্বাভাবিক জীবনধারাকেই ধর্ম শিক্ষা দিয়েছে– আর ধর্মব্যবসায়ী বুদ্ধিজীবীরা এই ধর্মেরই ধারক-বাহকশক্তি।

সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃত শিক্ষা এই যে, সমগ্র মানবজাতি এক অতি মহান লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। সেই লক্ষ্য অলীক ও কাল্পনিক নয়। বর্তমান বিজ্ঞানই তার বাস্তব প্রমাণ। সেই লক্ষ্যটা কি? সেই অতিবাস্তব লক্ষ্যটি হলো শোষণহীন শ্রেণীহীন শান্তিপূর্ণ সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা, মানবজাতির সার্বিক কল্যাণ, সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির চরম বিকাশ সাধন। যে সমাজে মানুষ মানুষকে শোষণ করবে না– মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ববিবাদ হিংসাবিদ্বেষ হানাহানি মারামারি থাকবে না। প্রত্যেকে একে অপরের সাথে একযোগে সকলের মঙ্গলের জন্যে যোগ্যতানুযায়ী কাজ করবে– সকলেই তাদের প্রয়োজনানুযায়ী জীবননির্বাহ করবে– সকলে সকলের প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা সহমর্মিতা প্রদর্শন করবে। এমনতর একটি কল্যাণকামী আনন্দদায়ক সুন্দরতম সামাজিক রাজনৈতিক আর্থবৈষয়িক সাংস্কৃতিক নৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার সর্বাত্মক বিপ্লবের চাইতে মহত্তর লক্ষ্য অর্জনের চেয়ে এই পৃথিবীতে পুণ্যের বা সুখের আর কী আছে?

কবরের শান্তি? পারজাগতিক বা পারলৌকিক শান্তি? ওসব চিন্তা থাক। ইহজাগতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার বিপ্লবে যে মহত্তর পুণ্য প্রচেষ্টা ও কর্ম মানুষকে, যদি 'পরজগত' বলতে কিছু থেকে থাকে, পারজাগতিক শান্তির পথ দেখাবে। শান্তি না বুঝলে, শান্তি চিনবো কেমন করে?

সুতরাং নির্মমবাস্তবকে এড়িয়ে তথাকথিত অলীক চিন্তাপ্রসূত আধ্যাত্মিক পুণ্যের পেছনে ছুটতে গিয়ে মানবতাবিরোধী কার্যকলাপ দিয়ে মনুষ্যসমাজের

বাস্তব সমস্যার কোনো সমাধান হবে না, প্রকৃত শান্তি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে না। এসব বাস্তব কথাগুলো অবশ্য ঐসব যুক্তিবাদীরা পাগলীয় প্রলাপ বলে ছাগলীয় কায়দায় উড়িয়ে দিতে চান। কিন্তু প্রমাণভিত্তিক বা বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তি দাঁড় করতে নিজেরা পুরোপুরি অক্ষম। বরং বিজ্ঞানকেও তারা ধর্মবিরোধী বলে আখ্যায়িত করে থাকেন এবং অনেক সময় ধর্মের মহিমাকীর্তন করার জন্যে বিজ্ঞানের কার্যকলাপকে ধর্মের অবদান বা ধর্ম কর্তৃক আভাষকৃত বলে তর্কে অবতীর্ণ হন বা বিজ্ঞানকে অস্বীকার করে ফেলেন, যদিও বিজ্ঞানের আশীর্বাদকে জীবনচলার সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করে চলেছেন।

তাই পরমসত্য কঠিন বাস্তব বিজ্ঞান ও সমগ্র মানবজাতির সার্বিক কল্যাণ বাস্তবায়িত ও নিশ্চিত করা যে মানুষের চিন্তাধারার মূল লক্ষ্য, সেই মানুষের পক্ষে নিয়ম-নীতি-শৃঙ্খলা নির্ধারিত করার নিমিত্তে কোনো কাল্পনিক বা আধ্যাত্মিকতার ওপর আশ্রয় নেয়ার প্রয়োজন আছে কিনা বা প্রচলিত ধর্মীয় নিয়ম-নীতি-শৃঙ্খলা মানুষের সার্বিক কল্যাণের অনুকূলে, না প্রতিকূলে তা বিজ্ঞ পাঠক ভেবে দেখতে পারেন। তাছাড়া যে মানুষ প্রকৃতিকে বশ করে নবনব সৃষ্টির ফসল দিয়ে, শ্রম দিয়ে, ত্যাগ-তিতিক্ষা দিয়ে সমাজের অগ্রগতি ও কল্যাণের লক্ষ্যে জীবনোৎসর্গ করে, তার পক্ষে স্বার্থান্বেষী ও সমাজদ্রোহী হওয়ার আশঙ্কা নেই। যা কিছু স্বার্থান্বেষণ ও সমাজদ্রোহিতা তা হচ্ছে মানুষসমাজের মধ্যের একটি অতিক্ষুদ্র মানুষরূপী পশুদের সীমাহীন উচ্চাভিলাষ ধনসম্পদ ভোগ-লালসার কার্যকলাপ। এরা ব্যতীত ব্যাপক সাধারণ মেহনতি শ্রমজীবী মানুষ– যারা যাবতীয় সৃষ্টির রূপকার। যে মানুষ সৃষ্টি করে, সেই জানে সৃষ্টির মধ্যে কতটুকু মূল্য দিতে হয়। তার সৃষ্টিকে সে নিজের হাতে ধ্বংস করতে পারে না। সেই তার মহান সৃষ্টিকে রক্ষা করার জন্যে, তার সুখ শান্তি সমৃদ্ধি ও কল্যাণ সুসংহত করার জন্যে আপন বিবেকের তাড়নাই নিয়ম-নীতি-শৃঙ্খলা উদ্ভাবন করবে এবং তা মেনে চলবে। সুতরাং তার সৃষ্টির মধ্যে ধর্মের যেমন কোনো ভূমিকা নেই, তেমনি সামাজিক নিয়ম-নীতি শৃঙ্খলা পালনের ক্ষেত্রে ধর্ম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার কোনো অবকাশ নেই। যে ধর্ম নসীবের দোহাই দিয়ে ব্যাপক মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য হতাশা-নিরাশা ক্ষুধা-যন্ত্রণা ডেকে আনে, মানুষকে শোষণ-পীড়ন লাঞ্ছনা অত্যাচার-নির্যাতনের জালে আবদ্ধ করে, মানুষের মধ্যে শ্রেণীবিভেদ দ্বন্দ্ব সংঘাত হানাহানি রক্তপাত ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপকে ডেকে আনে, মানুষের মনীষা কর্মস্পৃহা অধ্যবসায় সাধনা পরিশ্রম প্রচেষ্টাকে নিরুৎসাহিত করে 'বিধির বিধান' জাতীয় আধ্যাত্মিক বা পারলৌকিকতার দোহাই দিয়ে

নির্জীবতা ও পরনির্ভরশীলতাকে ডেকে আনে, সবলকে লালন ও দুর্বলকে দলন করে, সেই ধর্মের কোনো প্রয়োজন নেই, তাকে সমূলে উৎখাত করতে হবে। তবে জবরদস্তিমূলক নয়, বৈজ্ঞানিক উপায়ে সাম্যবাদী সমাজ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে।

সুতরাং সংকীর্ণ ব্যক্তিসত্তা ব্যক্তিচিন্তা ব্যক্তিস্বাধীনতা ব্যক্তিস্বার্থ ব্যক্তিসম্পদের লোভ-লালসা, যাবতীয় শোষণ বঞ্চনা অত্যাচার নির্যাতন অন্যায় অবিচার ব্যভিচার প্রতারণা শঠতা অসংগতি অনিয়ম বিশৃঙ্খলা শ্রেণীবিভেদ দ্বন্দ্ব সংঘাত হানাহানি মারামারি রেষারেষি ধ্বংস রক্তপাত, পাশবিকতা মানবতাদ্রোহিতা প্রভৃতি কার্যকলাপ শ্রেণীবিভক্ত তথা ধর্মসৃষ্ট শোষকসমাজ থেকে আবির্ভূত হয়েছে। এরই বিরুদ্ধে সর্বাত্মক বিপ্লব হিসেবে সাম্যবাদের আগমন ঘটেছে– ব্যাপক মানুষের সার্বিক কল্যাণ সমৃদ্ধি সুখ ও শান্তির লক্ষ্যে।

ধর্ম মানুষের মনে সংস্কারের বা রক্ষণশীলতার মোহ সৃষ্টি করে মানুষকে অন্ধ করে রাখে। বৈজ্ঞানিক শিক্ষা থেকে মানুষকে বঞ্চিত করে যে-কোনো অবস্থা ও বস্তুকে আড়ালে রাখতে চায়। অন্ধবিশ্বাসই ধর্মের মূল ভিত্তি। ভুল শিক্ষা দিতে এটা একটা যন্ত্রসরূপ। এ কারণে গণবিরোধী শাসক-শোষকচক্র ধর্মের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে তাদের শাসন-শোষণকে প্রবহমান রাখার লক্ষ্যে। ধর্মের নামে কেয়ামত বিচার ও দোজখের ভয় দেখিয়ে, 'আল্লাহ মানুষের সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করেন', 'নসীবের ওপর কোনো হাত নেই'... এ জাতীয় ফেকা দিয়ে অজ্ঞ সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়ে দাবিয়ে রাখে। অজ্ঞ দুর্বল সাধারণ মানুষ বাধ্য হয়ে ধর্মের টোপ গিলে ভাগ্যের ওপর নিজেকে সমর্পণ করে দেয়।

মনীষী কার্ল মার্কসের ব্যাখ্যা এ প্রসঙ্গে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেছেন, 'ধর্মকে যেমন করা হয়েছে আত্মাহীন ঘটনাবলীর আত্মা, তেমনি ধর্ম হলো নিপীড়িত জীবের দীর্ঘশ্বাস (সান্ত্বনা), হৃদয়হীন বা নির্মম জগতের হৃদয় (শান্তি); সাধারণ অজ্ঞ মানুষের জন্যে এটা একটা আফিম।'

বাস্তবিকপক্ষে নির্দ্বিধায় বলা যায়, শোষণ বঞ্চনা অত্যাচার পীড়ন অনাচার ব্যভিচার অন্যায় ও অমানবিক কার্যকলাপকে আল্লাহর নামে ধর্মের দোহাই দিয়ে যুক্তিযুক্ত করা হয়েছে, মহিমান্বিত করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। মানবেতর জীবনযাপনকারী ব্যাপক মেহনতি শ্রমজীবী মানবগোষ্ঠী যখনই এসব থেকে মুক্তিলাভের জন্যে পথ ও মত খোঁজে, তখনই তাদেরকে ধর্মের নামে পারজাগতিক পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে, সান্ত্বনার মিষ্টিমধুর বাণী শুনিয়ে, দোজখের আগুনের ভয় দেখিয়ে বিভ্রান্ত-নিস্পৃহ করে দাবিয়ে রাখে।

প্রকৃত কারণ এই যে, এই ব্যাপক অজ্ঞ শোষিত মানবগোষ্ঠীর হাত থেকে নিরাপদ রাখতে এবং শাসন-শোষণ ধনসম্পদ প্রভাবপ্রতিপত্তি নিষ্কণ্টক ও সংরক্ষিত করার লক্ষ্যেই শাসক-শোষক ও তাদের তাবেদার ধর্মব্যবসায়ী বুদ্ধিজীবীশ্রেণী ধর্মকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কার ও গোড়ামীকে সমাজদেহে চাপিয়ে দেয়াই ধর্মের লক্ষ্য। স্বৈরতান্ত্রিক শাসন-শোষণের পক্ষে ধর্ম ওকালতী করে থাকে। এজন্যে শাসক-শোষকগোষ্ঠী তাদের সপক্ষে ধর্মকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে রাজনৈতিকভাবে রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্র মোল্লাতন্ত্র ও প্রচারমাধ্যমগুলোকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে থাকে এবং ধর্মকে কার্যকরভাবে সমাজে মহিমান্বিত ও টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে নানাপ্রকার ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সংগঠনকে বিপুল অর্থ দিয়ে পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে।

আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছি যে, কোনো ধর্মই মানবসমাজের ইহজাগতিক সমস্যাসমূহের মৌলিক সমাধান দিতে ব্যর্থ হয়েছে। তেমনি মানুষের সার্বিক কল্যাণের পথও দেখাতে পারেনি। তবে বিভিন্ন ধর্মের ভেতর বা বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে কতকগুলো মৌলিক সমস্যাকে চিহ্নিত করা হয়েছে, কিন্তু সমস্যার সমাধান দিতে গিয়ে নানান স্ববিরোধী নির্দেশ প্রদান করে সবকিছুকে জগাখিচুড়িতে পরিণত করে ফেলেছে। ফলে সমস্যার সমাধান দূরে থাক, সমাজের বুকে অবিশ্বাস বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলাকে বিপর্যস্ত করে তোলে। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে এমন কতকগুলো বক্তব্য বা নির্দেশ আছে, যা বিশ্লেষণ করলে সেই বক্তব্য ও নির্দেশের কোনোই তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায় না। কোনো বিষয়ের ধারাবাহিকতা খুঁজে পাওয়া ভার। একস্থানে যে কথা বলা হয়েছে, অন্যত্র সে-কথাকে উল্টিয়ে ফেলা হয়েছে। ফলে কোনটা সঠিক আর কোনটা বেঠিক তা নির্ণয় করা দুষ্কর। সুতরাং নানান স্ববিরোধীয় পরিপূর্ণ বিধিবিধান দিয়ে জাগতিক সমস্যার সমাধান আশা করা বৃথা। এভাবেই সচেতন মানবমন নানান অবিশ্বাস সন্দেহ ও বিভ্রান্তিতে ভোগেন। এই সন্দেহে বশীভূত হয়ে কেউ কোনো বক্তব্য দিলে অমনি তথাকথিত ধর্মের ধারক-বাহকগোষ্ঠী তাঁর চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করে ছাড়েন এবং তাঁর অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তোলেন। কারণ ধর্মের জারিজুরি ফাঁস হয়ে গেলে তাদের ব্যবসায় লোকসান হবে, অজ্ঞ মানুষের দিব্যজ্ঞান খুলে যাবে এবং এতকাল ধরে শোষিত প্রতারিত মানুষের রোষানলে পতিত হয়ে পাত্তাড়ি গুটানোর সময়টুকুও পাওয়া যাবে না। এ কারণেই বলা হয়ে থাকে, ধর্ম আল্লাহর সৃষ্টি, আল্লাহ ধর্মগ্রন্থ নাজেল করেছেন, ধর্মের সমালোচনা করা গুনাহর কাজ, গুনাহকারদের শায়েস্তা

করার জন্যে আল্লাহ্ গজব নাজেল করেন। অতএব, সাবধান! বিপথগামী হয়ো না, আল্লাহর দেয়া ভাগ্যলিখন মেনে নিয়ে তার শোকরানা আদায় করো। ইত্যাদি।

কিন্তু যদি প্রশ্ন করি, আল্লাহর হুকুম ছাড়া যখন গাছের পাতাও নড়ে না, শবেবরাতে তিনি মানুষের যাবতীয় কার্যকলাপ নির্দিষ্ট করে দেন– তাহলে, যিনি ধর্মের ব্যাখ্যার ও ধার্মিকদের সমালোচনা করেন, তিনি তো এজন্যে দায়ী নন? আল্লাহই তো তাকে পরিচালিত করছেন? তবে সমালোচনাকারীকে দায়ী করবেন কোন যুক্তিতে, কিসের ভিত্তিতে? প্রত্যেকটি মানুষকে পৃথিবীতে পাঠানোর পূর্বেই যখন আল্লাহ চাবি এঁটে দিয়েছেন, তখন তাকে নিবৃত করবে কে? তার ভার আল্লাহর ওপরই ছেড়ে দেয়া ভালো নয় কি? আমাদের বক্তব্য হলো : বস্তুবাদ ও ভাববাদের খেলা চলছে পৃথিবীর বুকে। যে যার পক্ষ নিয়ে এ-খেলায় প্রতিযোগিতা করার অধিকার পেতে পারে, খেলার পরিসমাপ্তি যে পরিণতিতে স্থির হবে, সেই পরিণতিকে মেনে নেয়াই শ্রেয়। সুতরাং কাষুণ্ডি ঘাটলে কেবল তেতোই বের হয়– অন্য কিছু নয়। তাই যুক্তিবাদী সমালোচনাকে অস্বীকার করা বা যুক্তিবাদীকে গায়ের জোরে হেনেস্তা করা অন্যায়। আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমেই প্রকৃত সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। সুতরাং সত্যই উত্তম। সত্যই শুভ্রম। সত্যের মধ্যেই প্রকৃত শান্তি নিহিত।

এ পৃথিবী, এ সভ্যতা আজ বিজ্ঞানের করায়ত্তে। এই বিজ্ঞানভিত্তিক যুগে প্রচলিত ধর্মীয় চিন্তা ও কল্পনা অচল প্রমাণিত হয়েছে। মানবসভ্যতা বিজ্ঞানের বদৌলতে ইতোমধ্যেই বহুদূর এগিয়ে গেছে এবং বৈজ্ঞানিক উপায়েই মানুষের দুঃখ-দুর্দশা-হতাশা-শোষণ-অবিচার সবকিছুর বাস্তব সমাধান নিশ্চিত হবে। ইতোমধ্যে অনেক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হয়েছে, পর্যায়ক্রমে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সব সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধান হবে– সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এজন্যে অন্য কোনো কল্পনার আশ্রয় নেয়া বা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে বা নসীব বা ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে বসে থাকলে কোনো সমস্যারই সমাধান হবে না।

এর অর্থ এই নয় যে, ধর্মকে সমাজদেহ থেকে এক হেঁচকা টানে উপড়ে ফেলতে হবে। সাম্যবাদী সমাজে ধর্মদ্রোহিতার কোনো অবকাশ নেই। সাম্যবাদ বাস্তব-সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি বৈজ্ঞানিক দর্শন। বিজ্ঞানকে কার্যকরভাবে সমাজে প্রয়োগ করাই হলো সাম্যবাদের লক্ষ্য। সুতরাং উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি না করে অর্থাৎ মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ না করে ধর্মবিশ্বাসের ওপর আঘাত হানা সাম্যবাদীদের নীতি নয়। এ কারণেই আমরা দেখতে পাই সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে ধর্মকে

সামাজিক-রাজনৈতিক-আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গন থেকে সরিয়ে তা ব্যক্তিজীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। এবং প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত ধর্মীয় স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করা হয়েছে। মোট কথা সাম্যবাদী বা সমাজতান্ত্রিক সমাজের মূল ভিত্তির মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতাকে ঠাঁই দেয়া হয়েছে। খেলাফতের দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে সিক্ত। তাই সমাজতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষাক্ষেত্রে কেবলমাত্র দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী (Dialectical materiatism) শিক্ষাকে উৎসাহিত ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কারণ সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানভিত্তিক দর্শন হলো এই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ যা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠেছে। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কে বিশদ ধারণা নিতে পারলেই কেবল প্রকৃত সাম্যবাদকে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব বলে আমরা মনে করি।

আধুনিক সাম্যবাদের মূল লক্ষ্য শ্রেণীহীন শোষণহীন ও ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির ভিত্তিতে সমাজরাষ্ট্রিক ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার শাসন প্রতিষ্ঠাকরণ ও আর্থবৈষয়িক ক্ষেত্রে সমাজের যাবতীয় উৎপাদনক্ষেত্রকে সমষ্টিগত মালিকানায় ন্যস্ত করে 'প্রত্যেকটি মানুষ তার সমর্থানুযায়ী শ্রম প্রদান করে সম্পদ সৃষ্টি করবে এবং প্রত্যেকটি মানুষ তার প্রয়োজনানুযায়ী সম্পদসামগ্রী পাবে'... এই ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ। শিশু-কিশোর, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বিকলাঙ্গ তথা কর্মঅক্ষম প্রতিটি মানুষ একইভাবে তার মৌলিক অধিকার ভোগ করবে। মানুষের শিক্ষা বাসস্থান খাদ্য বস্ত্র ও চিকিৎসার দায়দায়িত্ব রাষ্ট্র বহন করবে। প্রতিটি শিক্ষার্থী তার প্রতিভা বিকাশের অবাধ ও পূর্ণ অধিকার পাবে। কৃষকের ছেলে কৃষক হবে না, শ্রমিকের ছেলে শ্রমিক হবে না, তারা রাষ্ট্রনায়ক মন্ত্রী সচিবও হতে পারবে। রাষ্ট্রনায়কের ছেলে রাষ্ট্রনায়ক হবে না, মন্ত্রী-সচিবের ছেলে মন্ত্রী-সচিব হবে না, কৃষক শ্রমিক কামারও হতে পারবে। প্রতিটি মানুষের কর্মক্ষেত্র নির্ধারিত হবে তার প্রতিভা ও যোগ্যতার মাপকাঠিতে। সাম্যবাদ 'নসীব' বা 'বিধির বিধানে' আস্থাশীল নয়। বৈজ্ঞানিক উপায়ে সমষ্টিগত মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন ও কল্যাণের লক্ষ্যে শ্রম ও উৎপাদনের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। প্রতিভা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে যে যেখানেই স্থান পাক না কেনো... আর্থবৈষয়িক, নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সকলেই সমভাবে অধিকার ভোগ করবে। সমাজে কোনো শ্রেণীবৈষম্য থাকবে না। ওভাবেই কেবল মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণা, অভাব-দারিদ্র্য, বৈষম্য-সংগতি দূরীভূত হতে পারে।

সাম্যবাদ মানুষের 'জাতি' ও 'রাষ্ট্র' সম্পর্কে নতুন চিন্তাধারা প্রদান করেছে। 'জাতি' বলতে সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে এবং 'রাষ্ট্র' বলতে বিশ্বব্যাপী একক রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে চিহ্নিত করেছে। এ দুটি বৃহত্তর চিন্তাধারাকে উত্তরণের

জন্যে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও আন্তর্জাতীয়তাবাদকে সর্বাগ্রে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। তবে গণতন্ত্র হবে এই ব্যবস্থা পরিচালনার ভিত্তি। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও আন্তর্জাতীয়তাবাদ, এ দুটি চিন্তাচেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমেই সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে সাম্যবাদের পতাকাতলে একতাবদ্ধ করা সম্ভবপর হতে পারে বলে প্রকৃত সাম্যবাদীরা বিশ্বাস করেন। এর প্রক্রিয়াও ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে।

শুধু আলোচনা-পর্যালোচনাই নয়। বঙ্গবন্ধু সবকিছু বিচার-বিশ্লেষণ করে, আলোচিত ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত হয়ে, নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা মনীষার বলে বলিয়ান হয়ে বাঙালি জাতির শোষিত মেহনতি দুখী মানুষের মুখে হাসি ফুটানোর জন্যে, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পটভূমিকাসৃষ্ট বাস্তব অবস্থার আলোকে এবং দেশের ব্যাপক মানুষের মন-মানসের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষিতে, সামাজিক আর্থবৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশগত ব্যবস্থার বাস্তব পটভূমিতে নিজের জীবনকে বাজি রেখে বাংলাদেশে একটি শোষণহীন, সাম্যবাদী– প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার যথোপযুক্ত রাজনৈতিক প্রশাসনিক ও আর্থসামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। একজন মনেপ্রাণে সাম্যবাদী হিসেবে তাঁর চিন্তাচেতনা আন্তর্জাতিকতাবাদের ভাবধারায় সিক্ত ছিল, এ কথা জোর দিয়েই বলা যায়। তিনি জাতীয় শোষিত দুখী মানুষের মুক্তি অর্জনের সাথে সাথে বিশ্বের সমস্ত শোষিত মানুষের মুক্তিসংগ্রামে দ্ব্যর্থহীন কার্যকরী সমর্থন দিয়েছেন। তিনি বজ্রকণ্ঠে বলেছেন : 'বিশ্ব আজ দুই ভাগে বিভক্ত– শোষক ও শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে। এ ব্যতীত বিশ্বের বিভিন্নাঞ্চলে সংগ্রামরত মানুষের স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রামে তিনি সমর্থন দিয়েছেন। বিশ্বের সামরিকখাতে যে বিপুল অর্থ অপচয় হচ্ছে, সেই অর্থ বিশ্বের নিরন্ন ও দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করার উদাত্ত আহ্বানও তাঁর বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। এসব থেকেই তাঁর আন্তর্জাতীয়তাবাদী চিন্তাচেতনার প্রোজ্জ্বলপ্রমাণ মেলে।

অনেকে প্রশ্ন তোলেন, সাম্যবাদীরা যখন সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে স্বীকার না করে আন্তর্জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী তখন তারাই আবার সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও রাষ্ট্রের গণ্ডিতে নিজেদের রেখেছেন কেন? এর প্রত্যুত্তরে বলতে হয়, অবশ্যই সাম্যবাদীরা সংকীর্ণ জাতি-রাষ্ট্রের নীতিতে বিশ্বাসী নন। তবে যেহেতু আন্তর্জাতীয়তাবাদের সার্বিক বিপ্লবের বাস্তব অবস্থা এখনো সৃষ্টি হয়নি, যেহেতু ব্যাপক মানবগোষ্ঠীর মনে এ চিন্তাধারার বীজ এখনো পুরোপুরি অঙ্কুরিত হয়নি, যেহেতু পুঁজিবাদী ধর্মতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা এখনো বহাল রয়েছে এবং তারা এই মতবাদের বিরুদ্ধে নানান কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে, সাধারণ মানুষ দু'দিকের টানাপোড়েনে বিভ্রান্তিতে

ভুগছে এবং এ জাতীয় নানান কারণে আন্তর্জাতীয়তাবাদের বাস্তব ভিত এখনো শক্তিশালী হয়ে ওঠেনি এবং যেহেতু হাজার হাজার বছর পূর্ব থেকে প্রতিষ্ঠিত প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সবেমাত্র বিদ্রোহের সূচনা, এসব কারণেই আন্তর্জাতীয়তাবাদের খরস্রোত এখনো উঠেনি, উঠতে প্রস্তুতি নিচ্ছে মাত্র। এর প্রক্রিয়া চলছে। যেখানেই জনগণ স্বাধীনতা ও শোষণমুক্তির সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে, সেখানেই সাম্যবাদীরা নিজ জাতি-রাষ্ট্রের গণ্ডি পেরিয়ে সংগ্রামরত মানুষের সাহায্যে এগিয়ে যাচ্ছে। এভাবেই শুরু হয়ে গিয়েছে আন্তর্জাতীয়তাবাদের বাস্তব কার্যক্রম। সুতরাং এর পরিণতিকে কোনোভাবেই ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।

এবার আমরা অন্য আরেকটি অধ্যায়ে চলে আসি।

এখানে আমরা মানবশ্রেষ্ঠ মহানবী ও আমাদের বঙ্গবন্ধুর কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক আলোচনায় অবতীর্ণ হবো। তবে এ আলোচনা কেবলমাত্র রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হবে। এভাবে আমরা প্রমাণ করতে চাই যে, আমাদের বঙ্গবন্ধু মহানবীর একজন প্রকৃত সার্থক ভাবশীষ্য। মহানবীর রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক দর্শন থেকে অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত হয়ে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে তাঁর দিকদর্শন নির্ণয় করেছিলেন। এ ব্যবস্থার সাথে এ ব্যতীত মিল রয়েছে মনীষী কার্ল মার্কস, মহামতি লেনিন ও মহান মাও সেতুং-এর চিন্তাচেতনারও।

এ প্রসঙ্গ আলোচনার পূর্বে, আসুন, আমরা একটা ছড়া কাটি। ছড়ার নাম হলো 'ম'।

ম থেকে ভাবনা আসে কেমনে
ছোট বড় সকলে রেখো স্মরণে।

ম-তে 'মহত্তর' মহান যে জন
ম-তে 'মা-জননী' জগতের ধন।

ম-তে 'মুহাম্মদ' মহা এক নবী
ম-তে 'মার্কস' এক উজ্জ্বল রবি।

ম-তে 'মুজিবুর' মহাবিস্ময়
ম-য় 'মাও' দীপ্ত যার নাই ক্ষয়।

ম'য়তে 'মাবিয়া' 'মীরজাফর' ও
'মোশতাক' দেশনেতা স্বঘোষিত ।

'ময়মুনা' 'মোহাম্মদী বেগ' ও 'মিরন'
এ সকল নামগুলো রাখুন স্মরণ ।

ম-তে মহানাম আরো আছে কত
কত কুখ্যাত নাম ম'য় অবিরত ।

'ম' হলো পৃথিবীর ইতিহাস স্রষ্টা
'ম' থেকে সাবধান, সুন্দর ও নষ্টা ।

(আবীর আহাদ)

সুপ্রিয় পাঠক-পাঠিকারা নিশ্চয়ই উপরোক্ত ছড়াটার মূল উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারছেন । আমরা বলতে চাই যে, 'ম' শব্দ হতে আগত মানবনামের থেকে পৃথিবীর অধিকাংশ বিখ্যাত ও কুখ্যাত ব্যক্তিদের আগমন ঘটেছে । এবার তাহলে পৃথিবীর বিভিন্ন দিকের বিখ্যাত-কুখ্যাত ব্যক্তিদের নাম খুঁজুন । দেখতে পাবেন এ দেশের ঐতিহাসিক নামগুলোর অধিকাংশই 'ম' শব্দনাম থেকে বেরিয়ে এসেছেন । যেমন মীরজাফর, মিরন, মোহাম্মদী বেগ, মীরমদন, মোহনলাল, মীরকাশিম, মোহন দাস (গান্ধীজী), মোজাফ্ফর (উপমহাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের নায়ক), মনিসিং, মুজিবুর, মোশতাক, মানিক মিয়া, মাউন্টব্যাটেন.... । কী বিস্ময়ের ব্যাপার দেখুন । আমাদের এ উপমহাদেশের তিনটি রাষ্ট্রের জাতির জনক 'ম' নাম থেকে এসেছেন । ভারতের মোহন দাস (গান্ধী), পাকিস্তানের মোহাম্মদ আলী আর বাংলাদেশের মুজিবুর । আরো খুঁজুন । বিখ্যাত-কুখ্যাত নাম অনেক পাবেন । এ ব্যতীত জাতীয় পর্যায়ে বিখ্যাত বা কুখ্যাত নয়– 'ম' থেকে আগত মানুষগুলোকে দৃষ্টিতে রাখুন, দেখবেন এই 'ম' নামের মানুষগুলোকে মোটামুটি একটু চালুই মনে হবে । তা যা হোক ।

আমরা আমাদের মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি ।

এখানে আমরা মহানবীর আলোকে বঙ্গবন্ধুর কার্যক্রমের একটি মূল্যায়ন করতে চাই । যথা ঃ

(১) মহানবীর ব্যক্তিনাম 'মুহাম্মদ' (সঃ) এবং বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিনাম 'মুজিব'– একই 'ম' শব্দনাম থেকে আগত । উভয়ে বিভিন্নভাবে নিজ নিজ দেশ বা যুগসমাজের শাসক-শোষকদের হাতে নির্যাতিত অত্যাচারিত লাঞ্ছিত

অপমানিত ও নিষ্পেষিত হয়েছেন। এবং একই পদ্ধতিতে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার, শোষণমুক্তি, আর্থবৈষয়িক সমৃদ্ধি-কল্যাণ ও মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরলস সংগ্রাম করেছেন, সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা প্রদর্শন করেছেন। উভয়েই ছিলেন নিজ নিজ যুগসময়ের পৃথিবী আলোড়িত আলোচিত মহাব্যক্তিত্ব। আরবরা শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় গদগদ হয়ে তাঁকে 'আল-আমিন' বলতো, আর বাঙালিরা মুজিবকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় 'বঙ্গবন্ধু', 'বাঙালি জাতির জনক'-এর মর্যাদার আসনে বসিয়েছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মুহাম্মদ (সঃ) বিশ্বনবী, তেমনি মুজিব বিশ্বশান্তির মহানায়কের স্বীকৃতিসরূপ বিশ্বশান্তি পরিষদ কর্তৃক 'জুলিও কুরি' শান্তিপদকে ভূষিত হয়েছেন।

(২) মহানবী একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক শোষণহীন সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'ইসলাম' প্রবর্তন করেছিলেন এবং তাঁর খলিফারা খেলাফতে রাশেদীন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তেমনি বঙ্গবন্ধু একটি স্বাধীন বাঙালি জাতির গণতান্ত্রিক শাসন ও শোষণমুক্ত সাম্যবাদী সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার জন্যে আওয়ামী লীগ ও বাকশালের (বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক-আওয়ামী লীগ) প্রবর্তন করেছিলেন। 'খেলাফতে রাশেদীন' যেমন ছিল মুসলমানদের একদলীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান– তেমনি বাকশাল হলো শোষিত মেহনতি দীনদুখী বাঙালির একক জাতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা।

(৩) 'আইয়্যামে জাহেলিয়াত' বা ধর্মভিত্তিক কুসংস্কার শোষণ অত্যাচার নিপীড়ন ব্যভিচার ও পৈশাচিকতার অন্ধকারে নিমজ্জিত আরব জাতির সার্বিক মুক্তিসংগ্রামে মহানবীর বৈপ্লবিক নেতৃত্বের সাথে হাজার বছরের শোষণপ্রপীড়িত বঞ্চিত অত্যাচারিত লাঞ্ছিত নির্যাতিত বাঙালি জাতির মুক্তিসংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর বৈপ্লবিক নেতৃত্বের হুবহু মিল রয়েছে। মহানবীকে তৎকালীন আরবীয় সাম্রাজ্যবাদ ও অন্যান্য সামন্তবাদী শাসক-শোষক-কেতাবীধর্মের মোল্লাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছিল, তেমনি বঙ্গবন্ধুকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী শোষণ ও তাদের ক্রিড়নক পাকিস্তানি সামরিক শাসক-শোষক-ধর্মব্যবসায়ী এবং বাংলাদেশের উঠতি শোষক-তাবেদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছে।

(৪) আরবীয় মুসলমান মুজাহিদরা যেমন মহানবীর নামে ও নেতৃত্বে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বৈরতান্ত্রিক সামন্তবাদী শাসক-শোষক-মোল্লাদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছিল, তেমনি বাঙালি জনসাধারণ ও মুক্তিযোদ্ধারা বঙ্গবন্ধুর নামে ও নেতৃত্বে এক সর্বাত্মক সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার তাবেদার পাকিস্তানি শাসক-শোষক ও ধর্মব্যবসায়ীদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছিল।

(৫) আরবীয় সামন্তবাদী শাসক-শোষক তথা ইসলামী সাম্যবাদের বিরোধীশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণকল্পে মুক্তিকামী মুসলমানদের অনেকেই মাতৃভূমি মক্কা ত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী বন্ধুপ্রতিবেশী মদিনায় গমন করেছিলেন, তেমনি পাকিস্তানি বর্বর শাসক-শোষকদের অত্যাচার নির্যাতন ও নিপীড়নের কবল থেকে আত্মরক্ষা ও প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে বিপুলসংখ্যক বাঙালি জনসাধারণ ও মুক্তিযোদ্ধারা পার্শ্ববর্তী বন্ধুরাষ্ট্র ভারতে গমন করেছিল ।

(৬) আরবীয় মুসলমান আনসার মুজাহিদরা যেমন ইহুদী-খ্রিস্টান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে একত্রিত হয়ে সম্মিলিতভাবে শক্তিশালী সামন্তবাদী সাম্রাজ্যবাদী শাসক-শোষকদের বিরুদ্ধে এক সর্বাত্মক যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল, তেমনি বাঙালি সৈন্য পুলিশ ইপিআর (বিডিআর) আনসার ছাত্র যুবক কৃষক শ্রমিক– হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান মুক্তিযোদ্ধারা রাশিয়ার সহযোগিতায় এবং ভারতীয় বাহিনীর সাথে একত্রিত হয়ে সম্মিলিতভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, চৈনিক হঠকারী নেতৃত্ব ও পাকিস্তানি বর্বর বাহিনীর বিরুদ্ধে এক সর্বাত্মক যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল ।

(৭) মহানবী আরব জনগণের আস্থাশীল ৩১৩ জন প্রতিনিধি বা সাহাবাদের সমবায়ে সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনতান্ত্রিক মোর্চা গঠন করেছিলেন, তেমনি বঙ্গবন্ধুও ৩১৩ জন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি গণতান্ত্রিক শাসনতান্ত্রিক সরকার গঠন করেছিলেন ।

(৮) মহানবী ইসলামী ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে উত্তরাধিকারভিত্তিক রাজতন্ত্র, নবুয়্যতপ্রথা, দাসপ্রথা, সামন্তবাদীপ্রথা, মোল্লাতন্ত্র প্রভৃতি বাতিল করে গণতান্ত্রিক সাম্যবাদী ধর্মনিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন, আর্থবৈষয়িক সমতা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে বিকেন্দ্রিকরণের ব্যবস্থা প্রদান করেছিলেন, তেমনি বঙ্গবন্ধু উপনিবেশিক আমলের ঘুণে ধরা পেষণ-চোষণ-পীড়ন-অবিচারভিত্তিক স্থায়ী প্রশাসনিক আমলাতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদী শোষণের লীলাখেলা ও পুঁজিবাদ, স্থায়ী ও গণবিরোধী সামরিকতন্ত্র, মোল্লাতন্ত্র ও সামন্তবাদের অবশেষ আধাসামন্তবাদী ভূমিব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন করে একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক সাম্যবাদী শাসন, আর্থবৈষয়িক ক্ষেত্রে ভারসাম্য ব্যবস্থার প্রবর্তন, প্রশাসনিক ও বিচার ব্যবস্থাকে গণমুখী ও বিকেন্দ্রিকরণ করার ব্যবস্থা নিয়েছিলেন ।

(৯) মহানবী সমাজের যাবতীয় উৎপাদন ব্যবস্থাকে জাতীয়করণ করে আল্লাহর নামে সাধারণ মানুষের মালিকানায় ন্যস্ত করেছিলেন, তেমনি বঙ্গবন্ধু প্রাথমিকভাবে কিছু কিছু উৎপাদন ব্যবস্থাকে জাতীয়করণ করলেও

পরবর্তীতে যাবতীয় উৎপাদন ব্যবস্থাকে জাতীয়করণ করে জনগণের মালিকানায় আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

(১০) মহানবীর আদর্শের উত্তরসূরী প্রিয় সহচর হযরত উমর, হযরত ওসমান, হযরত আলী, ইমাম হাসান-হোসেনসহ অগণিত অনুসারী প্রতিবিপ্লবী প্রতিক্রিয়াশীল শোষক-সামন্তবাদীদের ভাড়াটিয়া গুণ্ডাদের হাতে নিহত হন, তেমনি বঙ্গবন্ধু সপরিবারসহ তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচর সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, মনসুর আলী, কামরুজ্জামান, আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, শেখ ফজলুল হক মনি, কর্নেল জামিল ও অগণিত অনুসারী-কর্মী সমাজতন্ত্রবিরোধী সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী শোষক, প্রতিবিপ্লবী, প্রতিক্রিয়াশীল, স্বাধীনতাবিরোধীচক্রের ভাড়াটিয়া গুণ্ডাবাহিনীর হাতে নিহত হন।

(১১) মহানবীর সাম্যবাদী ব্যবস্থার মহাদুশমন, তৎকালীন সকল ষড়যন্ত্র ও হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যনায়ক, স্বঘোষিত খলিফা মাবিয়া-এজিদ, তেমনি বঙ্গবন্ধুর সাম্যবাদী ব্যবস্থার মহাদুশমন– ১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বরের ষড়যন্ত্র ও হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যনায়ক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী দালাল– স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট খোন্দকার মোশতাক ও জিয়াউর রহমান।

(১২) মহানবী প্রায় ২৩ বছর যাবত নানান অত্যাচার নির্যাতন উৎপীড়ন ও অকথ্য জুলুম সহ্য করে মাতৃভূমি আরব ও দাসমানবগোষ্ঠীকে সামন্তবাদী স্বৈরতান্ত্রিক শাসক-শোষকগোষ্ঠীর কবল থেকে মুক্ত করেছিলেন, তেমনি বঙ্গবন্ধু ২৩ বছর নানান অত্যাচার নির্যাতন জেলজুলুম ষড়যন্ত্র ও মৃত্যুকে উপেক্ষা করে বাঙালি জাতিকে পাকিস্তানি স্বৈরশাসনের কবল থেকে স্বাধীন করে বাঙালি জাতিকে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শোষণ থেকে মুক্ত করে একটি শোষণমুক্ত সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে নিরলস জীবনপণ সংগ্রাম ও বিপ্লব করেছিলেন।

(১৩) মহানবীর নেতৃত্বে আরব জনগণ ঐতিহাসিক আরাফাত ময়দানে ইসলামী সাম্যবাদী ব্যবস্থার বিরোধী সামন্তবাদী শাসক-শোষক ও তাদের তাবেদার বাহিনীকে পরাজিত করে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে জাতীয় বিজয় অর্জন করে। ৯ জিলহজ্ব হলো আরবীয় বিজয় দিবস। তেমনি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালি জনগণ ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বাঙালির স্বাধীনতা পদানতকারী, সাম্রাজ্যবাদের দালাল পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীকে ও তাদের দোসর আল-বদর-রাজাকার বাহিনীকে পরাজিত করে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে জাতীয় বিজয় অর্জন করে। ১৬ ডিসেম্বর হলো বাঙালির বিজয় দিবস।

(১৪) মহানবী যুদ্ধবন্দী ইহুদী, খ্রিস্টান ও অন্যান্য ইসলামবিরোধী সশস্ত্র বাহিনী ও দালালদের প্রতি মানবতা ও মহানুভবতার নিদর্শনসরূপ 'সাধারণ ক্ষমা' ঘোষণা করেছিলেন, তেমনি বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবন্দী পাকবাহিনী, তাদের সহযোগী রাজাকার, আলবদর, আলশামস ও শান্তি কমিটির দালালদের প্রতি মানবতা ও মহানুভবতার নিদর্শনসরূপ 'সাধারণ ক্ষমা' ঘোষণা করেছিলেন।

(১৫) মহানবী আরব জাতির মুক্তিদাতা ও জনক– ইসলামী সাম্যবাদী আদর্শের প্রবর্তক ও বিশ্বনবী, তেমনি বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির জনক ও বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা, বাঙালি সাম্যবাদী আদর্শের প্রতীক ও বিশ্বশান্তির মহানায়ক। মহানবী ছিলেন সামন্তবাদী স্বৈরতান্ত্রিক শাসক-শোষকদের কাছে একটি মহাভীতি, তেমনি বঙ্গবন্ধু ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী উপনিবেশবাদী বর্ণবৈষম্যবাদী ও ধর্মব্যবসায়ীদের কাছে একটি মহাত্রাস বা নাভিশ্বাস।

(১৬) মহানবী দাসমানবগোষ্ঠী ও অন্যান্য শোষিত-বঞ্চিত আরব জনগণের চেতনা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রেরণাশক্তি, তেমনি বঙ্গবন্ধু বাঙালি দীনদুখী মেহনতি শোষিত বঞ্চিত লাঞ্ছিত মানুষের চেতনা ও বিপ্লবের মহাপ্রেরণাশক্তি ও আশ্রয়স্থল।

(১৭) মহানবীর বংশধরের মধ্যে ১০ মহররম কারবালা হত্যাকাণ্ডের পর যেমন একমাত্র হোসেনপুত্র জয়নাল প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন, তেমনি বঙ্গবন্ধুর ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের পর তার বংশের বা সন্তানের মধ্যে মাত্র দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বিদেশে থাকার জন্যে প্রাণে বেঁচে গেছেন। শেখ হাসিনা তাঁর পিতা বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সংগ্রামে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

সুতরাং উপরোক্ত তুলনামূলক বাস্তবঘটনাবলী বা প্রবাহ এবং ঐতিহাসিক ও দার্শনিক প্রেক্ষাপটে মহানবীর আদর্শ ও লক্ষ্যের সাথে বঙ্গবন্ধুর আশ্চর্যজনক মিল পরিলক্ষিত হয়েছে। এ কারণেই বঙ্গবন্ধুকে শ্রেষ্ঠ 'উম্মতে মুহাম্মদী' বলে আখ্যায়িত করা যায়। এবং এ কারণেই বোধকরি সেই মোল্লাতন্ত্র ও শোষকসমাজ– যাঁরা তথাকথিত ইসলামীযজ্ঞের সোল এজেন্ট ও ধর্মের রক্ষক সেজে বসেছেন, নিজেদেরকে মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত মনে করে আত্মতৃপ্তি বা ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার কার্যক্রমে নিমগ্ন আছেন তাঁরা বঙ্গবন্ধুকে মোটেই সহ্য করতে পারেন না। মহানবীকেও তৎকালীন মোল্লাতন্ত্র ও শোষকসমাজ সহ্য করেননি, তাঁকে নানাভাবে লাঞ্ছিত অপমানিত নির্যাতিত ও দেশছাড়া করেছিল। বাংলাদেশে এ শ্রেণী কিন্তু বঙ্গবন্ধুর মহানুভবতা উদারতা ও সুহৃদয়তার দানে বেঁচে আছেন, সমাজের

নানান উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এবং হচ্ছেন। কিন্তু তারাই আবার বঙ্গবন্ধুকে নানা ঘৃণ্যাপবাদে নিন্দিত ও চিহ্নিত করেন। এটাকেই বলা হয় উপকারীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা কৃতঘ্নতা বা জিঘাংসা। তাঁরা যখন বঙ্গবন্ধুর মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডকে 'পাপের ফল', 'আল্লাহর গজব' ইত্যাদি বলে উল্লাসে মেতে ওঠেন, তখন তাদের জ্ঞাতার্থে বলতে হয় ঃ তাহলে মহানবীর বংশধর ইমাম হাসান-হোসেন, খলিফা উমর-ওসমান-আলী, মহানবীর শত শত অনুসারী, ইছানবী, অন্যান্য নবী প্রভৃতিদের হত্যাকাণ্ড– এমনকি মহানবীর 'দন্ত মোবারক শহীদ'কেও কি তাঁরা 'পাপের ফল', 'আল্লাহর গজব' বলে প্রকারান্তরে তাই বলতে চান, বুঝাতে চান? শিশুহত্যা, নারীধর্ষণ করে হত্যা, দেশরক্ষা করতে গিয়ে নিহত হওয়া, ধ্বংসলীলা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে নিহত হওয়া ইত্যাদি কার্যকলাপকে 'পাপের ফল' বা 'আল্লাহর গজব' বলতে চান? তাঁরাও কি এজিদ ও তৎকালীন মোল্লাদের মত সকল হত্যাকাণ্ড ধ্বংসলীলা ও বীভৎসতাকে আল্লাহর নামে ধর্মের দোহাই দিয়ে হালাল করতে চান?

সুতরাং এসবই হলো শোষকসমাজের ও ধর্মব্যবসায়ীশ্রেণীর সংকীর্ণতা অজ্ঞতা অশিক্ষা কুসংস্কার অন্ধত্ব স্বার্থান্বেষিতা হীনমন্যতা কুমনোবৃত্তি নির্মমতা নিষ্ঠুরতা পাষণ্ডতা পৈশাচিকতা বীভৎসতা প্রতারণা শঠতা জোচ্চুরি পরশ্রমভোগী ও কুটিলহৃদয়ের পরিচায়ক ও তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের নির্মম বাস্তবতার ফলশ্রুতি। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

বাঙালি সাম্যবাদী সমাজ

ইসলামী ভাবাদর্শে, খেলাফতের রাশেদীনের গণতান্ত্রিক সাম্যবাদী রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক দর্শনে উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত হয়ে এই বাংলার বুকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় সামন্তবাদী জমিদার-মহাজনদের শাসন-শোষণের আমলে হাজী শরিয়তউল্লা, তদীয়পুত্র দুদু মিয়া, ফকির মজনুশাহ ও তিতুমীর প্রমুখ বিপ্লবী পুরুষদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও কৃষকবিদ্রোহের মধ্যেও আমরা সাম্যবাদী চিন্তাচেতনা ও শোষণমুক্ত সমাজ বিপ্লবের প্রচ্ছন্নরূপ দেখতে পাই।

প্রখ্যাত ব্রিটিশ গবেষক-ঐতিহাসিক উইলিয়াম হান্টারের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ফরিদপুরের কৃতীপুরুষ হাজী শরিয়তউল্লাহ ও দুদু মিয়ার নেতৃত্বে পরিচালিত 'ফারায়েজী আন্দোলনে' প্রায় ৮০ হাজার সশস্ত্র কৃষক-মজদুর দেশীয় জমিদার-জোতদার-মহাজন এবং একই সাথে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের স্বৈরাচারী শাসন-শোষণের জাঁতাকল থেকে মুক্তিলাভের লক্ষ্যে রক্তাক্ত বিপ্লবে অবতীর্ণ হয়েছিল। এই আন্দোলনের একটি স্লোগান ছিল 'আল্লাহর ভূমিতে কারো ব্যক্তিমালিকানা চলবে না।' এই বিপ্লবী কৃষকসমাজের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকজন অবস্থান নিয়েছিল। এই বিদ্রোহী কৃষক-সমাজ একত্রে চলাফেরা, বসবাস, আহার-বিহার ও কাজকর্ম যৌথভাবে সম্পাদন করতো। তাদের সকলের যৌথশ্রমোৎপাদিত সম্পদসামগ্রী একটি যৌথতহবিলে জমা হতো, এখান থেকে সকলে তাদের জীবনযাপনের সামগ্রী পেতো, পাশাপাশি সকলেই স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি সম্পাদনা করতো। তবে সামাজিকভাবে কার্যক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করা হতো। কথিত আছে, অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোকজন যাতে বিশেষ একটি ধর্মের অনুসারী বলে পীর দুদু মিয়াকে চিহ্নিত না করেন, বা তারা মনোক্ষুণ্ন না হন সেই কারণে এবং ইসলামী নীতি অনুযায়ী তিনি (পীর দুদু মিয়া) নিজের নামের পূর্বে ব্যবহৃত 'পীর' পদবীটা বর্জন করেছিলেন। এ ব্যতীত বিদ্রোহী কৃষক সমাজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় শোষক সমাজ সৃষ্ট শিক্ষা-সংস্কৃতি পোশাক-পরিচ্ছদসহ সকল বিদেশী মালামাল বর্জন করেছিল। দেশীয় সুতা ও হাতে বা তাঁতে বোনা কাপড়-চোপড় তারা পরিধান করতো। সশস্ত্র ব্যক্তি বা অধিনায়ক বা নেতা– কেউই তাদের

কাজের জন্যে বেতন বা ভাতা পেতো না। ছিল না কোনো রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আনুষংগিক বৈশিষ্ট্য। সমস্ত প্রকার খাজনা ট্যাক্সও বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল।

এভাবেই একটি স্বল্পকালীন সময়ের একটি গণতান্ত্রিক সাম্যবাদী ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ ব্যবস্থার উত্তরণ ঘটেছিল আধুনিক বাংলার ইতিহাসে। কিন্তু দেশীয় শাসক-শোষক, জমিদার-মহাজন-জোতদার ও তাদের পদলেহী ধর্মীয় দালালগোষ্ঠী এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ঐক্যবদ্ধ ও সর্বাত্মক প্রতিক্রিয়াশীল আক্রমণের মুখে এই ক্ষুদ্র বিপ্লবী কৃষকসমাজের নেতৃবৃন্দের অনেকেই নিহত হন এবং অধিকাংশ বিদ্রোহীরা কারান্তরালে নিক্ষিপ্ত হন এবং অচিরেই এই সাম্যবাদী বিপ্লব অংকুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়।

সুতরাং উক্ত 'ফারায়েজী আন্দোলন' তথা কৃষকবিদ্রোহ, ফকির মজনুশাহ এর ফকির বিদ্রোহ এবং তিতুমীরের বিপ্লবের ইতিহাস বঙ্গবন্ধুর অজানা ছিল না এবং এসব বিপ্লব থেকেও তিনি অনুপ্রাণিত হন।

বাংলাদেশে সাম্যবাদী সমাজের আরো একটি ঐতিহাসিক নিদর্শন আমরা খুঁজে পাই বাংলার নিকটাতীতের ঐতিহ্যবাহী একান্নবর্তী বা যৌথ পরিবারভিত্তিক সমাজের আর্থসামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে, যা লুপ্ত হয়ে গেছে বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে। এ সমাজ ব্যবস্থা কয়েক হাজার বছর পূর্ব থেকে বাংলার বুকে স্থায়ীভিত্তিক টিকে ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এ সমাজ ব্যবস্থার অপমৃত্যু ঘটলেও তার সুস্পষ্ট অবশেষ বা ক্ষীণতম নিদর্শন এখনো পর্যন্ত গ্রামবাংলার হিন্দু-মুসলমান পরিবারের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব এবং পূর্ব-দক্ষিণাঞ্চলের বা পাহাড়ি উপজাতীয় সমাজে ঐ একান্নবর্তী পরিবার ব্যবস্থা আজো প্রায় টিকে আছে।

এই একান্নবর্তী বা যৌথপরিবার ব্যবস্থার পশ্চাতে লুকিয়ে আছে বাংলার সুপ্রাচীনকালের উপজাতীয় সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা তথা প্রাচীন বাংলার কৌম সমাজ ও প্রাচীন বাংলার 'স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম সমবায়' ব্যবস্থার ঐতিহাসিক ঐতিহ্য ও এর দার্শনিক ভাবধারা।

ইতিহাসের পাতা থেকে আমরা জানতে পারি– একান্নবর্তী বা যৌথপরিবার ব্যবস্থায় সকল সাবালক কর্মক্রম নারীপুরুষ যে যার সামর্থানুযায়ী কাজ করতো এবং তাদের সম্মিলিত শ্রমোৎপাদিত সম্পদসামগ্রী পরিবারের যৌথ তহবিলে জমা হতো। পরিবারের প্রধানকর্তা বা বয়োজ্যেষ্ঠ বা মনোনীত প্রধানের নিয়ন্ত্রণে যৌথতহবিল থেকে পরিবারের সকল সদস্য-সদস্যাদের ভরণ-পোষণ নির্বাহ করা হতো। শিশু-কিশোর অন্ধ-বিকলাঙ্গ বৃদ্ধা-বৃদ্ধ তথা কর্ম-অক্ষম ব্যক্তিদের

তাই বলে অবহেলা করা হতো না। একটা সূক্ষ্ম নৈতিকতা, প্রেম স্নেহ মমতা ভালোবাসা সহমর্মিতা ভক্তি-শ্রদ্ধাই ছিল এ ব্যবস্থার ভিত্তি। এভাবেই গড়ে উঠেছিল একটি গণতান্ত্রিক সাম্যবাদী একান্নবর্তী বা যৌথপরিবার ব্যবস্থার সুখী-সমৃদ্ধশালী সমাজ এই বাংলার বুকে। ঐতিহ্যবাহী 'স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম সমবায়' বা যৌথপরিবার ব্যবস্থার ইতিহাস এসবের আদর্শ ও লক্ষ্য বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর জ্ঞান ও শিক্ষা ছিল অপরিসীম। তিনি নিজেই এই একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবার থেকে এসেছেন, জানতেন এ পরিবার ব্যবস্থার কল্যাণধর্মী প্রেক্ষাপট। এই শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি বাংলার আপামর জনগণকে একটি রাষ্ট্রীয় পরিবারের পতাকাতলে সংঘবদ্ধ করে তাদের সার্বিক সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি ও কল্যাণের যাবতীয় রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার দিকদর্শন প্রদান করে গেছেন। সেই দিকদর্শন একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক সাম্যবাদী ব্যবস্থা, শোষণমুক্ত সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার দিকদর্শন।

সুতরাং আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, স্থান-কাল-সময় ভেদে সাম্যবাদের প্রকাশ যা-ই হোক না কেনো, প্রকৃতপক্ষে এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য আদর্শ ও লক্ষ্য কিন্তু এক ও অভিন্ন।

সাম্যবাদের বৈশিষ্ট্য বা ভিত্তি

গণতন্ত্র জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা হলো একটি সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার মূল ভিত্তি বা বৈশিষ্ট্য। এগুলো ব্যতীত সাম্যবাদকে কল্পনাও করা যায় না। এগুলোর ওপর ভিত্তি করেই ইসলাম তথা খেলাফতে রাশেদীন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। তেমনি আধুনিক মার্কসীয় সাম্যবাদও এই তিনটি ব্যবস্থাকে পাথেয় করে গড়ে উঠেছে। তেমনি বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পরিকল্পিত সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার মূল ভিত্তিও হলো গণতন্ত্র জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা। সুতরাং সাম্যবাদকে প্রকৃতার্থে হৃদয়ঙ্গম করতে হলে এর বৈশিষ্ট্যসমূহের ঐতিহাসিক দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ও তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট আমাদের জানতে হবে।

১. গণতন্ত্র

প্রাচীন গ্রিসের নগররাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে যে শাসনতান্ত্রিক রূপকাঠামো দাঁড় করানো হয়েছিল তার মধ্য দিয়েই 'গণতন্ত্র' দর্শনটির উৎপত্তি ঘটেছে। আরো একটু পরিষ্কার করে বলা যায় যে, গ্রিস পরিভাষা Demos (জনগণ) ও Kratos (ক্ষমতা) থেকেই 'Democracy' শব্দটির উত্তরণ ঘটেছে। অর্থাৎ জনগণের ক্ষমতাকেই সার্বিকার্থে 'গণতন্ত্র' নামে অভিহিত করা হয়েছে। আর এই গণতন্ত্রের শাসনতান্ত্রিক রূপ প্রদান করেন কোনো একটি নগররাষ্ট্রের কর্ণধার সোলন নামক এক ব্যক্তি বলে আমরা ইতিহাসের পাতা থেকে জানতে পারি। এ ব্যতীত গণতন্ত্রের প্রক্রিয়ানির্মাতা হিসেবে সোলনের সমসাময়িককালের আরো দুজনের নামও জানতে পারি। এঁরা হলেন : প্রাচীন গ্রিসের এথেন্স নগরীর পার্শ্ববর্তী নগররাষ্ট্রের কর্ণধার থিউসিয়াস ও কেলিস্থিনিস। তবে কোনো কোনো রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, এঁদের আবির্ভাব ঘটেছিল সোলনের প্রায় কয়েক যুগ পরে, তাঁরা সোলন প্রবর্তিত ব্যবস্থাকে কার্যকরভাবে সংহত করতে চান। তবে আমাদের মতে, এঁরা নগররাষ্ট্রের কর্ণধার না থাকলে তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষিতে তাঁদের এ চিন্তাধারা সমাজের বুকে বাস্তবায়িত হতে পারতো না। তাঁরা একাধারে নগররাষ্ট্রের কর্ণধার এবং দার্শনিক-চিন্তাবিদ ছিলেন বলেই তাঁদের পক্ষে এ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সমাজে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়েছিল। সে যা-ই হোক।

উক্ত দার্শনিকদের মতবাদকে বিশ্লেষণ করলে আমরা বুঝতে পারি– যারাই নগররাষ্ট্রের সম্ভ্রান্ত অধিবাসী (দাস, ভূমিদাস শ্রমিক ও কুটিরশিল্প মালিক মজদুর শ্রেণী ব্যতীত) তারাই জনগণ। এবং এই জনগণের মতামত

বা শাসনকেই 'গণতন্ত্র' বলা হয়েছে। তবে আমরা যে গণতন্ত্রের ওপর আধুনিক চিন্তাভাবনা (জনগণের ব্যাপক অংশের শাসন ব্যবস্থা বা সাম্যবাদী চিন্তাভাবনা) করি সেই প্রেক্ষিতে প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন নগররাষ্ট্রের তথাকথিত গণতন্ত্রকে 'গণতন্ত্র'ই বলা যায় না। এটা ছিল সমাজের মুষ্টিমেয় সম্ভ্রান্ত ক্ষমতাশালীগোষ্ঠীর গণতন্ত্র যা বিবর্তনের পথ অতিক্রম করে বর্তমান পুঁজিবাদী সংখ্যালঘু ধনিকশ্রেণীর গণতন্ত্র বা সামরিক গণতন্ত্রে পর্যবশিত হয়েছে। তাই গণতন্ত্রের আধুনিক সংজ্ঞায় পুঁজিবাদী সমাজের প্রচলিত গণতন্ত্রকেও 'গণতন্ত্র' বলা যায় না। এ গণতন্ত্রকে শোষকের গণতন্ত্র বলাই শ্রেয়। এ বিষয়ে পরবর্তীতে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রাচীন নগররাষ্ট্রের প্রবর্তিত শাসন ব্যবস্থার মধ্যে গণতন্ত্রকে খুঁজেই পাওয়া যায় না। কারণ নগররাষ্ট্রের রাজা বাদশা সম্রাট বা প্রধানরা নগররাষ্ট্রের অধিবাসীদের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হতো না। এসব নগররাষ্ট্রের কর্ণধাররা সাধারণত সমরশক্তির জোরে, সমাজের মোল্লাতন্ত্রের সমর্থনে রাজরাজড়া হয়ে তথাকথিত নগররাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতো। এবং পরবর্তীতে এ গোষ্ঠী উত্তরাধিকার প্রথা প্রচলন করে তাদের বংশীয় রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সাবেক উপজাতীয় সাম্যবাদী সমাজের ধ্বংসস্তূপের ওপরই নগররাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে, তেমনি সাবেক উপজাতীয় সমাজের প্রধান বা সমরপ্রধানদের গর্ভ হতেই নগররাষ্ট্রের রাজরাজড়াদের আগমন ঘটে। এই নগররাষ্ট্রের কর্ণধাররা তাদের শাসন-শোষণ ব্যবস্থাকে পরিচালিত ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার লক্ষ্যে নগররাষ্ট্রের সম্ভ্রান্ত ক্ষমতাবান অধিবাসীদের মধ্য হতে এবং তাদেরই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি পরিষদ বা দালালচক্র সৃষ্টি করে। এ ব্যবস্থাকেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 'প্রাচীন নগররাষ্ট্রীয় গণতন্ত্র' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যীশুখ্রিস্টের আবির্ভাবের প্রায় ৬-৭ শত বছর পূর্বে নগররাষ্ট্রের পত্তন হয় এবং তারই সাথে সাথে এ জাতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটে। তবে প্রকৃতার্থে ঐ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে 'সামরিক গণতন্ত্র' বলাই শ্রেয়। কারণ সমরশক্তির জোরে যেমন নগররাষ্ট্রের পত্তন হয়, রাজরাজড়াদের আগমন ঘটে, তেমনি সমরশক্তির জোরেই ঐ ব্যবস্থাকে সাধারণ দাসশ্রমিক মানবগোষ্ঠীর ওপর চাপিয়ে দিয়ে, তাঁদের যাবতীয় অধিকারকে কেড়ে নিয়ে নির্মম শোষণ-নির্যাতনের জাঁতাকলে পিষ্ট করা হয়েছিল। এই নগররাষ্ট্র ও তার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পূর্ণভাবে জানতে হলে আমাদেরকে প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিককালের মানব সমাজসভ্যতাকেই আগে জানতে হবে।

আদিমকালে প্রাকৃতিক-নৈসর্গিক নানান ভয়ঙ্কর প্রতিকূল বিরূপ পরিবেশ ও নানান হিংস্র বিরাটকায় জীবজন্তুর আক্রমণের কবল থেকে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন মানবগোষ্ঠী বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে একত্রিত হতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ তৎকালীন প্রাকৃতিক পরিবেশগত বাস্তব অবস্থাই তাদেরকে দলবদ্ধ হতে বাধ্য করে। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলবদ্ধ মানবগোষ্ঠীর নির্দিষ্ট কোনো আবাসস্থল ছিল না। খাদ্য আশ্রয় ও প্রাকৃতিক প্রতিকূল পরিবেশ এবং হিংস্র জীবজন্তুর আক্রমণ ইত্যাদি নানান সমস্যা থেকে পরিত্রাণ লাভের লক্ষ্যে তারা যাযাবর জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়ে পড়ে। তারা একত্রে শিকারসহ অন্যান্যোপায়ে খাদ্যসামগ্রী জোগাড় করতো এবং একত্রে মিলেমিশে তা ভক্ষণ করতো। এভাবেই তাদের মধ্যে একটি পারিবারিক ও আর্থসামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আদিম মানুষের এ সামাজিক স্তরটাকেই 'আদিম সাম্যবাদী সমাজ' বলে সমাজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে উল্লেখ করা হয়েছে।

কালক্রমে এ পারিবারিক আর্থসামাজিক বা প্রত্যক্ষ রক্ত সম্পর্কিত ব্যবস্থা থেকেই এক-একটি উপজাতির আবির্ভাব ঘটে। ফলে পারিবারিক বা রক্ত সম্পর্কিত উপজাতীয় সমাজ পারিবারিক সার্বিক সমষ্টিগত ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, মানব সমাজের একেবারে আদিতে এবং এ উপজাতীয় সামাজিক স্তরেও যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে মাতা-পুত্র, কন্যা-পিতা, ভ্রাতা-ভগ্নি তথা একাধিক স্ত্রীলোকের সাথে একাধিক পুরুষের বা কোনো নারী-পুরুষের মধ্যে যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনো বাধা-নিষেধ ছিল না। তৎকালীন প্রাকৃতিক-সামাজিক বাস্তব অবস্থার কারণে এ ব্যবস্থার প্রয়োজনও ছিল বৈকি। নইলে নানান প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও নানান হিংস্র জীবজন্তুর থাবার কবলে পতিত হয়ে গুটিকতক মানবসন্তানের অস্তিত্ব টিকে থাকাটা সম্ভব ছিল না। এ কারণে মানবজাতির অস্তিত্বের স্বার্থে অবাধ ও মুক্তপ্রেমের প্রয়োজন ছিল। এ কারণেই আমরা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আদম (আঃ)-এর পুত্রদের সাথে তাঁর কন্যাদের বৈবাহিক সম্পর্কের কথা জানতে পারি। এ ব্যতীত হিন্দুশাস্ত্রে পঞ্চপাণ্ডব তথা সহোদর পাঁচ ভাইকে একজন নারী দ্রৌপদীর সাথে প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার কাহিনীও আমরা শুনতে পাই। সুতরাং প্রাকৃতিক পরিবেশ ও অন্যান্য বাস্তব অবস্থার কারণে মানবজাতির অস্তিত্বের প্রয়োজনে বংশবৃদ্ধি ব্যতীত মানবগোষ্ঠীর অন্য কোনো গত্যন্তর ছিল না। আর এ কারণেই অবাধ ও মুক্তপ্রেমের প্রয়োজন ছিল।

এইসব উপজাতির নেতৃত্ব শক্তিশালী সাহসীযোদ্ধা বিচক্ষণ বা বয়সের দিক দিয়ে সবচে' বয়োঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বা উপজাতির সকল সাবালক সদস্য-

সদস্যাদের আস্থাভাজন ব্যক্তির ওপর অর্পিত হতো। এ অবস্থায় উপজাতির মধ্যে গণতান্ত্রিকবোধের উন্মেষ ঘটে। এ উপজাতীয় প্রধান ব্যক্তি বা অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিরা তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও দায়িত্ব পালনের জন্যে অন্য কোনো বাড়তি সুযোগ-সুবিধা বা বেতন-ভাতা পেত না। সবকটি প্রধান পদ ছিল অবৈতনিক। উপজাতি প্রধান ছাড়াও পরবর্তীকালে বাস্তব অবস্থার কারণে উপজাতির সমরপ্রধান, উৎসবপ্রধান, বাণিজ্যিকপ্রধান, কৃষিপ্রধান, পশুপালনপ্রধান, বিচারপ্রধান, শিকারপ্রধান প্রভৃতি শাখাপ্রধানের পদ সৃষ্টি করা হয়। তবে সার্বিক উপজাতীয় প্রধান ব্যক্তিই মূলতঃ একই সঙ্গে সমরপ্রধান ও বিচারপ্রধানের ভূমিকা পালন করতো। তারই ওপর উপজাতির সকল সদস্য-সদস্যার যাবতীয় দায়দায়িত্ব নির্ভর করতো। তারই সার্বিক তত্ত্বাবধানে ও নেতৃত্বে বা নিয়ন্ত্রণে প্রত্যেকটি কর্মক্ষম নারীপুরুষ একই সাথে শিকার, কৃষি ও অন্যান্যোপায়ে খাদ্যসামগ্রী উৎপাদন বা সংগ্রহের কাজে অংশগ্রহণ করতো এবং তারই নিয়ন্ত্রণে তা সকলে মিলেমিশে ভোগ করতো। শিশু-কিশোর ও অন্যান্য কর্ম-অক্ষম লোকজনকে তাই বলে ভোগের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হতো না। একটা সূক্ষ্ম নৈতিকতার প্রেক্ষিতে তাঁরাও অন্য সকলের মতো সম-অধিকার ভোগ করতো। তবে উপজাতির লোকসংখ্যানুপাতে খাদ্যসামগ্রীর পরিমাণ ছিল খুবই নগণ্য। ফলে এ সমাজে 'উদ্বৃত্ত' সম্পদ বলতে কিছুই থাকতো না।

উদ্বৃত্ত সম্পদ ছিল না বলেই তা ভোগদখলের কোনো অবকাশ ছিল না, ফলে এ সমাজে ব্যক্তিসত্তা ব্যক্তিচিন্তা ব্যক্তিস্বার্থ বলতে কিছুই ছিল না। এ ব্যতীত তৎকালীন প্রাকৃতিক পরিবেশ, বৈরী উপজাতির আক্রমণ, বিরাটকায় হিংস্র জীবজন্তুর আক্রমণ ও খাদ্যসামগ্রীর অপ্রতুলতা ইত্যাদি কারণে সমাজে কোনো ব্যক্তির স্বাধীনসত্তা নিয়ে বসবাস করার পরিবেশ ছিল না। ফলে ব্যক্তিস্বাধীনতাও ছিল অকল্পনীয়। উপজাতির যা কিছু সম্পদ সামগ্রী ছিল– তা ছিল উপজাতীয় সমষ্টিগত মালিকানাধীন, তাই ব্যক্তিমালিকানাও ছিল এ সমাজে অজানা-অজ্ঞাত। জীবনের সর্বক্ষেত্রে যা কিছু কাজকর্ম সবই ছিল সমষ্টিভিত্তিক। স্বভাবে-চরিত্রে তারা তথাকথিত আধুনিক মানুষের মত ছিল না ঠিকই, তবুও তাদের মধ্যে প্রেম-পিরিতি-মিলন, ভালোবাসা-স্নেহ-মমতা, ভাতৃত্ববোধ, সহমর্মিতা, অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, কর্তব্যবোধ ইত্যাদি ছিল বলেই তারা সমষ্টিগত ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে জীবনযাপন করতে পেরেছিল। এই যে সমষ্টিগত ভাগ্যোন্নয়ন, এটাই হলো গণতান্ত্রিকবোধের পরিচায়ক।

তবে সবচাইতে বড় কথা হলো– বিরূপ প্রকৃতি, হিংস্র জীবজন্তু, অন্যান্য জানা-অজানা ভয়-বিহ্বলতা এবং খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহের নানান অসুবিধার

কারণে– তথা প্রাকৃতিক সামাজিক পরিবেশগত বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতেই তারা সমষ্টিগত কল্যাণের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হতে বাধ্য হয়েছিল। ছিল না মানুষের ওপর মানুষের শোষণ-বঞ্চনা-অবিচার-অত্যাচার। ছিল না কোনো শ্রেণীসত্তা, শ্রেণীদ্বন্দ্ব, হিংসা-বিদ্বেষ। ছিল না কোনো ধর্ম। রাষ্ট্রসত্তার তো কোনো প্রশ্নই ছিল না।

অর্থাৎ উপজাতির সকলে একই আর্থবৈষয়িক সামাজিক-সাংস্কৃতিক সমষ্টিগত সমসহাবস্থানে জীবনযাপন করতো। ফলে তাদের যাবতীয় চিন্তাচেতনা ভাবধারা আচার-আচরণ সবকিছু সমষ্টিগত মঙ্গলের ভাবধারায় গড়ে উঠেছিল। এ কারণে ব্যক্তিপরিচয়সত্তা বা ব্যক্তিসত্তাসঞ্জাত ভাষাগত রূপও তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়নি। কোনো ব্যাপারেই তারা সমষ্টির বাইরে তাই চিন্তাভাবনাও করতে পারতো না। ফলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রতার পরিচয়গত শব্দ যেমন 'আমি', 'তুমি', 'সে', 'ও' প্রভৃতি তাদের মনে উদয় হতো না। 'আমরা', 'তারা' এ জাতীয় সমষ্টিগত শব্দে একজন অন্যজনকে চিহ্নিত করতো বা কথোপকথন করতো। এ জাতীয় সমষ্টিগত চিন্তা বা শব্দপ্রয়োগের প্রমাণ বর্তমান যুগেও খুঁজে পাওয়া যায়, যদিও সেই আদিম সমাজের পরিবেশের গন্ধও খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে আদিম যুগের সেই সমষ্টিগত চিন্তার শব্দ খুঁজে পাওয়া যায়। কুমিল্লার একজন সাধারণ শিক্ষিত লোককেও যদি প্রশ্ন করা হয়, 'তোমার বাড়ি কোথায়?' তখন নির্ঘাত সেই লোকটি উত্তরে বলবে, 'আমরার বাড়িত্ কুমিলা'। এখানে 'আমরার' শব্দটি 'আমাদের' জাতীয় সমষ্টিগত প্রকাশের শব্দের ইংগিত বহন করে। যতদূর আমরা জানি, সিলেট, ত্রিপুরা, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ জেলার পাহাড়িয়া প্রত্যন্ত অঞ্চলের উপজাতিদের মধ্যে সমষ্টিগত চিন্তাচেতনার আচার-ব্যবহার সামাজিক সাংস্কৃতিক ইত্যাদি কার্যক্রমের মধ্যে ঐ প্রাচীন সমাজের যাবতীয় নিদর্শন ক্ষীণধারায় হলেও প্রচ্ছন্নভাবে ফুটে আছে।

আদিম মানুষের ঐ সামাজিক স্তরটাকেই মানবেতিহাসের অবৈজ্ঞানিক প্রথম সাম্যবাদী সমাজ বলে ঐতিহাসিকগণ ও সমাজ বিজ্ঞানীরা চিহ্নিত করেছেন। আর সত্য বলতে কি, এ স্তরটাকে (বর্তমান বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদী চিন্তাধারার আলোকেও) মানবেতিহাসের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রকৃত সাম্যবাদী গণতান্ত্রিক তথা শোষণহীন শ্রেণীহীন রাষ্ট্রহীন ধর্মহীন দ্বন্দ্বহীন সমাজ ব্যবস্থা হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। আর বহু বিবর্তনের পথ বেয়ে, আদিম সাম্যবাদী সমাজের চিন্তাচেতনা থেকেই ইসলামী সাম্যবাদ এবং আধুনিক মার্কসীয় সাম্যবাদের উত্তরণ ঘটেছে। এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

কালক্রমে বিভিন্ন হাতিয়ার আবিষ্কার এবং তা শিকার, কৃষিকর্ম, কুটির শিল্প ও অন্যান্য কার্যক্রমে প্রয়োগের কৌশল অর্জন করার ফলে জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্র সহজতর ও প্রসারিত হতে থাকে। বিশেষ করে কৃষি ও হস্তচালিত কুটির শিল্পের আবির্ভাবে খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। অপরদিকে মুক্ত যৌনকর্মের বদৌলতে উপজাতির লোকসংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং বর্ধিত জনসংখ্যা উৎপাদন ক্ষেত্রে নিয়োজিত হওয়ার ফলে সম্পদসামগ্রী উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রকৃতিকে নানানভাবে বশে এনে তা উৎপাদনকর্মে আনয়ন করার পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার ফলে সার্বিক উৎপাদনের কাজে নতুন উত্তরণের ধারা প্রবাহিত হতে থাকে। এ ব্যতীত বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে সম্পদ উৎপাদন, লুণ্ঠন, বাজার ইত্যাদি কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে যুদ্ধ-সংঘর্ষের পরিবেশ সৃষ্টি হতে থাকে। ফলে শক্তিশালী ও দুর্ধর্ষ উপজাতি, যুদ্ধ সংঘর্ষে বিজয়ী উপজাতির হাতে একদিকে যেমন দুর্বল বা বিজিত উপজাতির লুণ্ঠিত ধনসম্পদ গচ্ছিত হতে থাকে, তেমনি বিজিত উপজাতির সদস্যদের প্রাণে বধ না করে তাদেরকে বিজয়ী উপজাতির অধীনে 'দাস' হিসেবে নিয়োজিত করা হতে থাকে। ফলে একদিকে বিজয়ী উপজাতি ধন-সম্পদে ফুলেফেঁপে উঠতে থাকে, অপরদিকে উপজাতির লোকসংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলশ্রুতিতে সবদিক থেকে শক্তিশালী উপজাতি উত্তরোত্তর শক্তিশালী সম্পদশালী হতে থাকে। এ কারণে উপজাতীয় লুণ্ঠন বা যুদ্ধবিগ্রহ একটা লাভজনক পেশা হিসেবেও বিবেচিত হতে থাকে। এই লাভজনক পেশাকে সংহত ও শক্তিশালীকরণ, দাসদের নিয়ন্ত্রণকরণ ও উপজাতীয় অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষ্যে উপজাতির শক্তিশালী সাহসী ও বিচক্ষণ সদস্যদের নিয়ে একটি লাঠিয়াল বাহিনী বা সমরবাহিনী বা পুলিশ বাহিনী গড়ে উঠতে থাকে। এ বাহিনীর সদস্যদের বিশেষ সম্মানের সাথে সমাজে দেখা হতো। এরা এই পেশায় সার্বক্ষণিক নিয়োজিত হওয়ার ফলে উৎপাদনকার্যে এদের শ্রম দিতে হতো না। উপজাতির যাবতীয় কাজের তত্ত্বাবধান তদারকি সমন্বয়, যাবতীয় হিসাবরক্ষণ, বিভিন্ন শাখাপ্রধানদের মধ্যে সম্পর্ক, উপজাতীয় নানান আইন-কানুন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, শান্তি-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ, বিভিন্ন আন্তঃউপজাতীয় বিরোধ নিষ্পত্তি, উপজাতিপ্রধান ও অন্যান্য শাখা প্রধানদের পরামর্শ প্রদান ইত্যাদি কার্যাবলী সম্পাদনার জন্যে কালক্রমে উপজাতি সমাজে একটি আমলাগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে। এদেরকেও সমাজে বিশেষ সম্মানের চোখে দেখা হতো এবং এদেরকেও উৎপাদনকার্যে শ্রম দিতে হতো না। সবচে' সাহসী শক্তিশালী বিচক্ষণ ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্য হতে উপজাতির বিভিন্ন শাখাপ্রধানের পদে নিয়োগ করা

হতো। তাদের নিয়োগের আগে স্থানীয় বা মূল উপজাতির সদস্য-সদস্যাদের মতামত যাচাই করা হতো। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সমর ও বিচার বিভাগ উপজাতীয়-প্রধানের নিয়ন্ত্রণে থাকতো। এ ব্যতীত উপজাতির শ্রমজীবী মেহনতি মানুষকে নানান আমোদ-প্রমোদ-ফুর্তি, এ ব্যতীত উপজাতির শ্রমজীবী মেহনতি মানুষকে নানান উৎসব-মেলা ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের মনোরঞ্জন ও কর্মে উৎসাহ দেয়ার ব্যবস্থা করা হতো। এ জাতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে উৎসব-প্রধানের পদও খোলা হয়। এদেরকে সমাজে বিশেষ সম্মানের চোখে দেখা হতো। তবে অন্যান্য প্রধানের চেয়ে উৎসব-প্রধানই সমাজের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল। কারণ এরা নানান ভাবে সমাজের শ্রমজীবী মেহনতি মানুষকে কঠোর ও অক্লান্ত পরিশ্রমের শ্রমক্লান্ত মনে ক্ষণিকের জন্যে কিছুটা আমোদ-ফুর্তি ও হাসিখুশির পরশ বুলিয়ে দিত। ফলে তারা এদেরকে বিশেষ সম্মান ও ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখতো। এদের মধ্য থেকেই আগমন ঘটে গায়ক কবি সাহিত্যিক নৃত্যশিল্পী গণক ঠাকুর প্রভৃতি বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠী।

কালক্রমে উপজাতীয় প্রধানের আশীর্বাদে বা উপজাতীয় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ভেতর দিয়ে এবং নিজেদের মহিমা জাহির করার লক্ষ্যে উৎসব প্রধানরা ধর্মাবতার-পুরোহিত-যাজক-মোল্লা ইত্যাদিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এভাবে কালক্রমে সমাজে উপজাতীয় প্রধান তো বটেই– সমরপ্রধান আমলাপ্রধান কৃষিপ্রধান শিকারপ্রধান বাণিজ্যপ্রধান উৎসবপ্রধান বা ধর্মপ্রধানরা নিজেদের ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তিকে বুঝতে পেরে অন্যান্য অধীনস্থ সকলের চেয়ে নিজেদেরকে পৃথক বা শরীফ ভদ্রলোক সম্ভ্রান্ত বা শ্রেষ্ঠ বলে মনে করতে থাকে– অর্থাৎ যা কিছু সম্পদসামগ্রী, দাস-দাসী প্রভৃতির ওপর নিজেদের একগুচ্ছ মালিকানা স্বত্ব হিসেবে গণ্য করতে থাকে। এভাবেই উপজাতীয় সমাজের ক্ষমতাশালী শক্তিশালী বিচক্ষণ বিজ্ঞ জ্ঞানী তথা সম্ভ্রান্তশ্রেণীর মনে এভাবেই ব্যক্তিচিন্তা ব্যক্তিসত্তা ব্যক্তিস্বার্থ ব্যক্তিসম্পদ ও ব্যক্তিস্বাধীনতার লোভ-লালসা, ভোগ-দখল-বিলাসের সংকীর্ণ উদগ্রকামনার বীজ অঙ্কুরিত হতে থাকে। বিশেষ করে উপজাতীয় প্রধান ও সমরপ্রধানের মনে এই চিন্তাধারার খরস্রোত প্রবলভাবে প্রবাহিত হতে থাকে। কারণ তারা ছিল সমরশক্তির বলে বলীয়ান ক্ষমতাবান শক্তি।

কিন্তু উপজাতীয় আর্থসামাজিক নৈতিক ব্যবস্থায় এ জাতীয় ব্যক্তিচিন্তা ব্যক্তিসম্পদ ও ব্যক্তিসত্তার কোনো অবকাশ ছিল না। আবার সহসা বলপ্রয়োগ করে সমষ্টিগত কল্যাণের চিন্তাধারার সামাজিক কাঠামোকে উৎখাত করার মতো পরিবেশ ও পরিস্থিতির সৃষ্টিও হয়নি। ফলে সামাজিক প্রচলিত সাম্যবাদী কাঠামোকে নিয়ে তারা বিপাকে পড়ে যায়। এ পর্যায়ে

ধর্মপ্রধানরা তাদের সাহায্যকারী বা উদ্ধারকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে পড়ে তাদেরও লালিত লালসা চরিতার্থ করার লক্ষ্যে ।

এই ব্যক্তিস্বার্থ উদ্বৃত্তসম্পদ যাবতীয় সম্পদসামগ্রী ব্যক্তিমালিকানায় ভোগদখল করা এবং সেই সম্পদসামগ্রী নিজেদের ঔরসজাত সন্তান-সন্ততি বা রক্তের উত্তরাধিকারদের মধ্যে নিরাপদে হস্তান্তর করার সামাজিক কাঠামোকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনয়নের লক্ষ্যে ধর্মপ্রধানরা বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা পালনের কার্যক্রমে অবতীর্ণ হতে থাকে । এ উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করার লক্ষ্যে ধর্মীয় সম্প্রদায় উপজাতীয় সম্ভ্রান্তশ্রেণীর নেপথ্য সহযোগিতায় অত্যন্ত সুকৌশলে তথাকথিত ধর্মের মধ্যে ঈশ্বর বা দেবদেবীদের নামে ও তাদের দোহাই দিয়ে নানান সামাজিক আর্থবৈষয়িক নৈতিক নিয়মনীতি ও শৃঙ্খলার বেড়াজালে নানান ধর্মীয় ফেকা বা বিধি-বিধান, আধ্যাত্মিকতা ও বাণী ইত্যাদি মিষ্টিমধুর কল্পকাহিনী ফেঁদে ও সংযোজিত করে সাধারণ অজ্ঞ দুর্বল মেহনতি শ্রমজীবী ও দাস মানবগোষ্ঠীকে কুসংস্কার ও অন্ধকারে নিক্ষেপ করে সম্পদে ব্যক্তিমালিকানা এবং তা উত্তরাধিকারভিত্তিক নিরাপদ হস্তান্তরের যাবতীয় সামাজিক ব্যবস্থা ও পরিবেশের সূত্রপাত ঘটাতে থাকে । এ ধর্মীয়গোষ্ঠী প্রথমবারের মতো সমাজে 'নসীব' বা বিধির লিপি বা যা কিছু ঘটে, হয় ও হচ্ছে তা নিয়ন্ত্রণ করেন ঈশ্বর, এ জাতীয় চিন্তাধারাকে নানান রঙেঢঙে প্রচার করতে থাকে । এভাবেই কালক্রমে সমষ্টিগত মঙ্গলভিত্তিক আর্থসামাজিক নৈতিক সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থায় প্রচণ্ড ধস নেমে আসে, তদস্থলে জন্ম নিতে থাকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তাচেতনা ভাগ্যোন্নয়ন ও কল্যাণের আর্থবৈষয়িক নৈতিক সামাজিক ব্যবস্থা ও পরিবেশ এবং এভাবেই আদি সাংস্কৃতিক আচার-অনুষ্ঠান, ব্রত ইত্যাদি ক্রিয়াকর্ম কালক্রমে ধর্মীয় কার্যক্রমে রূপান্তরিত হয়ে মানবসমাজের বুকে প্রথমবারের মতো শ্রেণীসত্তা বৈষম্য শোষণ প্রতারণা শঠতা অবিচার ও প্রতিপত্তিশীল সমাজের সূত্রপাত ঘটে এবং সমাজের ব্যাপক অজ্ঞ দুর্বল শ্রমজীবী মেহনতি মানবগোষ্ঠী এই ধর্মের বেড়াজালে মুষ্টিমেয় প্রভু বা শোষকগোষ্ঠীর অধীনে দাস হিসেবে পর্যবশিত হতে থাকে ।

এ ব্যতীত আদিমকালে, এমন কি উপজাতীয় সমাজের আদিতে সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক । অর্থাৎ মেয়েরাই শিকার কৃষি আচার-অনুষ্ঠান-ব্রত-সামাজিক সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্ম পরিচালনা করতো এবং এই মাতৃতান্ত্রিক সমাজের নিদর্শনসরূপ প্রত্যেকটি উপজাতির এক-একটি 'টোটেম' বা আদিমাতার প্রতীক হিসেবে নারীদেবীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতো । মাতৃতান্ত্রিক সমাজের 'টোটেম' বিশ্বাসের প্রতীক হিসেবে ভারতীয় উপমহাদেশের আদি ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মে আমরা কালীদেবী, দুর্গাদেবী, চণ্ডিদেবী

প্রভৃতি নারীদেবীদের অবস্থান দেখতে পাই। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ কালক্রমে পুরুষদের কৌশলে ও নানান বাস্তব অবস্থার কারণে ভেঙে যেতে থাকে এবং সমাজে পুরুষের প্রাধান্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। উপজাতীয় সমাজ যখন সাম্যবাদী ভাবধারা থেকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভাবধারায় অর্থাৎ সমাজ যখন প্রভু ও দাস, এই দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হতে থাকে, সেই ভাবধারার সাথে সাথে সমাজ মাতৃতান্ত্রিক থেকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হতে থাকে। এ পর্যায়ে সামাজিক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান-ব্রত ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সামাজিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে 'টোটেম' পূজায় নারীদেবীদের পাশাপাশি পুরুষ দেবতাদের আবির্ভাব ঘটে। যেমন ভারতীয় অঙ্গনে মহাদেব, বিষ্ণু, নটরাজ শিব প্রভৃতি পুরুষ দেবতাদের আবির্ভাব ঘটে। এভাবে প্রাচীন গ্রিস, মিশর প্রভৃতি উপজাতীয় সমাজেও প্রায় একই সমসাময়িককালে সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিশ্বাসের বিবর্তন দেখা দেয়। চীনা সমাজে এভাবেই কনফুসিয়াস ধর্মমতের প্রচলন ঘটে। তবে সবচে' বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, আরব সমাজে, বিশেষ করে মক্কার কাবাগৃহের অভ্যন্তরে মহানবীর আবির্ভাবকালেও যে সকল মূর্তিগুলো ঠাঁই পেয়েছিল, তার সবগুলোই ছিল মাতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রতীক নারীদেবীদের মূর্তি। মহানবীর আবির্ভাবকালীন সময়ে মক্কাতে প্রচলিত ছিল পিতৃতান্ত্রিক সমাজ, অথচ তাদের প্রধান উপাসনালয় কাবামন্দিরে ছিল নারীদেবীদের ৩৬০টি মূর্তি! এতে প্রমাণিত হয় যে, মক্কাবাসীরা তখনো মাতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রভাব থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেনি। এর সমর্থনে সম্ভবতঃ পবিত্র কোরআন সাক্ষ্য দেয় ঃ 'What! For you the male sex And for Him the female!'

সুতরাং আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, উপজাতীয় সার্বিক সমাজ ব্যবস্থা বিবর্তনের সাথে সাথে 'টোটেম' বা আদিমাতা অথবা আদিপিতার প্রতীকসত্তায়ও বিবর্তন এসেছে। অর্থাৎ ধর্মমতেরও পরিবর্তন হয়েছে।

অতএব আদিম সাম্যবাদী শ্রেণীহীন শোষণহীন ধর্মহীন সমাজ ব্যবস্থা এভাবেই উপজাতীয় প্রধান, সমরপ্রধান, উৎসবপ্রধান, কৃষিপ্রধান, শিকারপ্রধান, বাণিজ্যপ্রধান তথা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তাচেতনা ও সম্পদের ব্যক্তিমালিকানায় ভোগ-দখলের লোভ-লালসার দুষ্টক্ষতে আক্রান্ত হয় এবং তাদের ব্যক্তিস্বার্থের নানান কলাকৌশল ও ধর্মীয় বিধিবিধানের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে ভেঙে পড়ে এবং তদস্থলে ব্যক্তিমালিকানাভিত্তিক, শ্রেণীবৈষম্য, শোষণমূলক, ধর্মীয় শঠতা ও প্রতারণামূলক সমাজ ব্যবস্থার উত্তরণ ঘটিয়ে সাম্যবাদী সমাজের গতিধারাকে দাসপ্রথায় প্রবাহিত করে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটে। সমাজের এই সম্ভ্রান্তশ্রেণী তাদের সমমনা বা নিজ নিজ প্রত্যক্ষ রক্ত-সম্পর্কীয়

আত্মীয়-স্বজন, ধর্মীয় পুরোহিত মোল্লা-যাজকশ্রেণী বা অন্যান্য প্রভাবশালী গোষ্ঠীর সমন্বয়ে উপজাতীয় আমলাবাহিনী, সমরবাহিনী ও একটি নির্বাচিত পরিষদ গঠন করে। বাদবাকি স্থানীয় উপজাতি সদস্য ও বহিরাগত দাস মানবগোষ্ঠীকে তারা তাদের অধীনস্থ দাসে পরিণত করে ফেলে।

এ সামাজিক রাজনৈতিক আর্থবৈষয়িক ব্যবস্থায় অগ্রসরমান উপজাতিসমূহ শক্তিশালী সুশৃঙ্খল সম্পদশালী ও ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে। ফলে যাযাবর হিসেবে বা সমৃদ্ধশালী ব্যবসা-বাণিজ্য-কৃষি ও কুটিরশিল্প সমৃদ্ধ অঞ্চলে, প্রাকৃতিক অনুকূল পরিবেশ ও অন্যান্য নির্ঝঞ্ঝাট অঞ্চলে উপজাতিগোষ্ঠী তাদের স্থায়ী আবাসস্থল গড়ে তোলে। এ পর্যায়ে বিভিন্ন অগ্রসরমান উপজাতি সদস্য, পরাজিত উপজাতি সদস্য, বিভিন্ন উপজাতির সমাজচ্যুত, সমাজদ্রোহী, লুণ্ঠনকারী, অপহরণকারী, সম্পদশালী এবং ক্রয়কৃত দাসমানবগোষ্ঠী বিভিন্ন সমচিন্তার অগ্রসরমান শক্তিশালী উপজাতির সাথে মিশে যায়। এ পর্যায়ে রক্তভিত্তিক সম্পর্কের স্থলে জীবিকা বা আদর্শভিত্তিক সম্পর্কের গুরুত্ব প্রাধান্য পেতে থাকে উপজাতীয় সার্বিক সামাজিক কার্যক্রমে।

স্থানীয়ভাবে একস্থানে দীর্ঘকাল যাবত একসাথে বসবাসের ফলে উপজাতির বিভিন্ন স্তর বা শ্রেণীর মানবগোষ্ঠীর সামাজিক সাংস্কৃতিক আচার-অনুষ্ঠান-ব্রত, ধর্মীয় কার্যক্রম, ভাষা-সাহিত্য-কৃষ্টি প্রভৃতি একটি সার্বজনীন স্বতন্ত্র স্থায়ীভিত্তিক রূপ নিতে থাকে। তবে ভাষা ও সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে সমাজের সম্ভ্রান্তশ্রেণী ও সাধারণ দাসমানবগোষ্ঠীর মধ্যে কিছুটা তারতম্যেরও সূত্রপাত ঘটে। সমাজের সম্ভ্রান্তশ্রেণীর মানবগোষ্ঠী কথোপকথনে সময় কাব্য ও ছন্দের ভাষা ব্যবহার করতো, আর সাধারণ মানবগোষ্ঠী সাধারণ ভাষায় কথোপকথন চালাতো। সম্ভ্রান্তশ্রেণীর মধ্যের বিশেষ জ্ঞানী ও বিজ্ঞ ব্যক্তিরা সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে ভাষার নব নব শব্দ সৃষ্টি করে সম্ভ্রান্তশ্রেণীর ভাষাকে সমৃদ্ধশালী করে তোলে। প্রাচীনযুগের সাহিত্যকর্মের নিদর্শন হিসেবে আমরা রামায়ণ মহাভারত মনুসংহিতা, বিভিন্ন গ্রিক কাব্যগ্রন্থ, আরবীয় কাব্যগ্রন্থসহ বিভিন্ন দেশের প্রাচীন কাব্যগ্রন্থ ও ধর্মগ্রন্থসমূহকে দেখতে পাই। এসব প্রাচীন গ্রন্থগুলোর সবকটিই ছান্দিক ভাষায় রচনা করা হয়েছে। এ থেকে আমরা প্রাচীনকালের সাহিত্য ও ভাষা সম্পর্কে এ ধারণাই পোষণ করতে পারি যে, সেই সময়কার সম্ভ্রান্তশ্রেণীর লোকেরা কাব্য ও ছন্দের ভাষায় কথোপকথন করতো। তা যা-ই হোক।

এভাবেই স্থায়ীভিত্তিক বসবাসকারী মানবগোষ্ঠীর মধ্যে এক-একটা জাতিসত্তার সূত্রপাত ঘটতে থাকে। এ জাতীয় জাতিসত্তা অবশ্য পূর্বেকার আদিম সাম্যবাদী স্তরের মানবগোষ্ঠীর মধ্যেও গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

মানবগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে। তবে সেই ক্ষুদ্র বা সীমিত জাতিসত্তা মূলতঃ গড়ে উঠেছিল প্রত্যক্ষ রক্ত-সম্পর্ককে কেন্দ্র করে। আর এ সমাজে রক্তভিত্তিক জাতিসত্তা আরো সম্প্রসারিত হলেও মূলতঃ এ জাতিসত্তার সূত্রপাত ঘটে পেশা ও জীবিকা তথা ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তাধারাকে পাথেয় করে। এ পর্যায়ে সম্পদের পরিধি বা উৎপাদন ব্যবস্থার পরিধি সম্প্রসারিত ও ভোগের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকলে বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে বা আন্তঃউপজাতীয় সম্পদ বিনিময় ক্ষেত্রে 'সম্পদের বিনিময়ে সম্পদ' নীতির ওপর ভিত্তি করে বিভিন্নস্থানে ছোট-বড় হাট বাজার গঞ্জ শহর ও নগর গড়ে ওঠে। এসব নগর-শহর-বন্দর এলাকায় কৃষি ও হস্তচালিত কুটির শিল্পের সূত্রপাত ঘটে। এসবকে কেন্দ্র করে এসব এলাকায় বিপণী-বিকিনি তথা ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে এবং এসব এলাকা বেশ জমজমাট হয়ে ওঠে। সম্ভ্রান্তশ্রেণীর লোকেরা এসব জমজমাট শহর-নগর-বন্দর এলাকায় বসতবাটি স্থাপন করতে থাকে। আন্তঃউপজাতীয় ও বহিঃউপজাতীয় ব্যবসা-বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে কালক্রমে বিনিময় মাধ্যম হিসেবে কড়ি বা মুক্তা, রুপা, স্বর্ণ তথা 'টাকা' প্রচলিত হয়ে পড়ে।

উন্নতমানের নানান হাতিয়ার তথা লৌহনির্মিত নানান হাতিয়ার আবিষ্কার ও তা ব্যাপকভাবে প্রয়োগের ফলে কৃষিসম্পদ ও কুটির শিল্পসম্পদ উৎপাদন এবং এসব সম্পদসমূহকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রেক্ষিতে সমাজে সামন্ত ও বণিকগোষ্ঠীর আগমন ঘটে।

কালক্রমে ঐসব সমৃদ্ধশালী নগর-শহরকে কেন্দ্র করে, বিশেষ করে কৃষি ও কুটিরশিল্পসমৃদ্ধ নগরীসমূহতে উপজাতীয় প্রধান পরিচালনা কেন্দ্র স্থাপিত হতে থাকে। এবং পর্যায়ক্রমে ঐসব সমৃদ্ধশালী নগর-শহর-বন্দর এলাকাকে কেন্দ্র করে এক-একটি নগররাষ্ট্রের পত্তন হতে থাকে। আর সাবেক উপজাতীয় প্রধান বা সমরপ্রধান বা ধনিক শক্তিশালী সামন্তপ্রভুরা ঐসব নগররাষ্ট্রের রাজা-বাদশা-শাহেনশাহ, মহারাজা ইত্যাদি কর্ণধার হয়ে বসে সমরশক্তির বদৌলতে। ঐ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রব্যবস্থার স্থায়ী বেতনভুক সামরিক বাহিনী, আমলাবাহিনী এবং আনুষংগিক আইন বিধিবিধানের ফলশ্রুতিতে ব্যক্তিসম্পদের সংরক্ষণ প্রসার ও নিরাপত্তা সংহত ও নিশ্চিত হয়ে পড়ে। এবং রাষ্ট্রীয় শক্তিতে বলিয়ান হয়ে ঐসব নগররাষ্ট্রের সামন্তবাদী শাসকগোষ্ঠী কৃষি ও উৎপাদনের অন্যান্য ক্ষেত্রকে ক্রমপ্রসারের লক্ষ্যে নিজ নিজ উপজাতির দাসমানবগোষ্ঠী ও অপেক্ষাকৃত দুর্বল অন্যান্য নগররাষ্ট্র ও উপজাতির মধ্য থেকে যুদ্ধ করে বা ক্রয় করে শ্রমিক সংগ্রহ করে তাদেরকে দাসশ্রমিক হিসেবে উৎপাদন ক্ষেত্রসমূহে নিয়োগ করতে থাকে। সামন্তপ্রভুরা এভাবে সমাজে ভূমিদাস প্রথার জন্ম দেয় এবং ভূমিদাসশ্রমিকদের শ্রম

শোষণের ক্রিয়াকর্ম শুরু করে সীমাহীন ভাগ্যোন্নয়ন তথা সম্পদের লোভ-লালসাকে চরিতার্থ করার লক্ষ্যে। এ প্রক্রিয়ায় দাসশ্রমিকরা পূর্বতন দাসপ্রথার মতো একইভাবে সামন্তপ্রভুদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়ে পড়ে। তাদের জীবন ও মৃত্যু সামন্তপ্রভুদের মর্জি ও দয়ার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, এমনকি দাসশ্রমিকরা তাদের সোমত্ত স্ত্রী ও কন্যাদের সামন্ত প্রভুদের ভোগের উদগ্রকামনার বেদীমূলে উৎসর্গ করতে বাধ্য হয়। তবে দাসশ্রমিকদের স্ত্রী-কন্যাদের গর্ভে সামন্তপ্রভুদের ঔরসজাত সন্তানরা সমাজে সামন্তপ্রভুদের সন্তানের স্বীকৃতি ও সম্পদের উত্তরাধিকার হতে পারতো না। এ ব্যবস্থা বর্তমান বিশ্বের সর্বত্রই, বিশেষ করে আরব জাহানের বর্তমান বাদশা-সম্রাট-শেখ-শাহাজাদা বা রাজপুরুষ সমাজেও প্রচলিত আছে। রাজতন্ত্রী আরব রাষ্টসমূহের 'হেরেমখানা'য় শত শত সুন্দরী সোমত্ত নারীদের দাসী হিসেবে রেখে বাদশা ও শাহাজাদা সাহেবরা ইচ্ছেমাফিক তাদেরকে ভোগ করেন। হেরেমপ্রথাকে ধর্মসম্মত করা হয়েছে। এইসব হেরেমদাসীদের গর্ভের সন্তানেরা বাদশা ও শাহাজাদাদের সন্তানের স্বীকৃতি ও সম্পদের উত্তরাধিকার হতে পারে না। উপরোক্ত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিয়মনীতির বেড়াজালে পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম প্রাচীন গ্রিসের এথেন্সকে কেন্দ্র করে নগররাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটেছিল।

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, নগররাষ্ট্রের সামন্তবাদী ধনিকদের মধ্য হতেই সামরিক বাহিনী, আমলাবাহিনী ও একটি নির্বাচিত পরিষদ গঠন করা হয়। তবে কৃষিকার্যে নিয়োজিত দাসশ্রমিক, অন্যান্য দাসমানবগোষ্ঠী ও কুটিরশিল্পপতি-মালিক-শ্রমিকদের কিন্তু নগররাষ্ট্র পরিচালনা পরিষদে নির্বাচিত ও ভোট প্রদান করার অধিকার ছিল না। এমনকি আমলা ও সামরিক বিভাগেও তাদের স্থান ছিল না। নগররাষ্ট্রের কর্ণধার বা রাজার সমগোত্রীয় সামন্ত-পরিবারের সদস্যরা এসব বাহিনীতে যোগদান করতো। এ ব্যতীত ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীও রাষ্ট্রীয় কোনো কার্যক্রমে অংশ নিতে পারতো না বা সে-অধিকার তাদেরও দেয়া হতো না। তবে কুটির শিল্পপতি-মালিক ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ছিল মোটামুটি স্বাধীন। এ দুটি ধনিক-বণিকশ্রেণীকে সামন্তরাজার তহবিলে মোটা অংকের খাজনা বা ট্যাক্স দিতে হতো। নইলে তাদের উৎখাত করে দাসশ্রমিকের কাতারে সারিবদ্ধ করার কার্যকরি ব্যবস্থা রাখা হতো।

গ্রিসের এথেন্সকে কেন্দ্র করে এ নগররাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে বলে আমরা জানতে পারি। অনেক ইতিহাসবেত্তাগণ অবশ্য মতপ্রকাশ করেন, শুধু গ্রিসেই কেবল নয়, প্রাচীন রোমসহ মিশর ভারতবর্ষ চীন ও বিশ্বের অন্যান্য অগ্রসরমান অঞ্চলে

একইভাবে একই সময়ে একই পদ্ধতিতে এ রাজনৈতিক আর্থসামাজিক সাংস্কৃতিক ব্যবস্থারও সূত্রপাত ঘটেছিল। তবে গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে যে, গ্রিসের নগররাষ্ট্র ব্যবস্থা ছিল অন্যান্য অগ্রসরমান অঞ্চলের রাষ্ট্র ব্যবস্থার চেয়ে তুলনামূলকভাবে ঢের গতিশীল সমৃদ্ধ ও সুষ্ঠুশীল। আর এ সামাজিক ব্যবস্থার গর্ভ থেকেই উত্তরাধিকারভিত্তিক রাজতান্ত্রিক সামন্তবাদী স্বৈরতান্ত্রিক-সমরতান্ত্রিক শাসন ও শোষণ এবং সামরিক গণতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে। আর এ জাতীয় গণতন্ত্রের উদ্ভাধন ও এর শাসনতান্ত্রিক রূপকাঠামো প্রণয়নের উদ্‌গাতা হিসেবে আমরা জানতে পারি সোলন, কেলিসথিনিস, থিউসিয়াস প্রমুখ দার্শনিকের নাম। প্রাচীন গ্রিসের নগররাষ্ট্রীয় সামরিব গণতন্ত্রের পাশাপাশি প্রাচীন রোমে একই সামরিক গণতান্ত্রিক 'ট্রাম ভাইরেক্ট' শাসনব্যবস্থার প্রচলন ঘটেছিল। এক্ষেত্রে গ্রিস ও রোমের সভ্যতা সময়ের দিক থেকে সমসাময়িক ও অতিঘনিষ্ঠ তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

প্রাচীন গ্রিসের নগররাষ্ট্রীয় সামরিক গণতন্ত্রই নানান বিবর্তনের পথ অতিক্রম করে ইংল্যান্ডের মাটিতে এসে এক নতুন চিন্তাচেতনায় ও অনুভাবনায় একটি আদর্শনীয় রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক দিকদর্শন হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এ গণতান্ত্রিক দর্শনকেই পুঁজিবাদী বা ধনিক বা বুর্জোয়া গণতন্ত্র বলে সমাজতন্ত্রীরা আখ্যায়িত করেছেন। এ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্তরালে লুকিয়ে আছে সামরিকতন্ত্রের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ অথবা নেতৃত্ব। এ জাতীয় গণতন্ত্রই আধুনিক শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী উন্নতশীল বিশ্বের কাছে একটি আদর্শীয় দর্শন হিসেবে স্বীকৃত বিবেচিত ও গৃহীত। এ ব্যবস্থাকে আবার একচেটিয়া ধনিকশ্রেণীর গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব শাসনব্যবস্থা হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়েছে। কারণ এ গণতন্ত্রের নামে রাজনৈতিক প্রশাসনিক আর্থসামাজিক বিচারব্যবস্থা ও নৈতিক কার্যকলাপকে সমাজে অর্থের মাপকাঠিতে বিচার করা হয় এবং এ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় চলে অর্থের শক্তিতে অবাধ ও মুক্ত প্রতিযোগিতা। অর্থ দিয়েই এ সমাজে সবকিছুকেই হাতের মুঠোয় আনা যায়, ফলে অর্থবানদের ইচ্ছা অনিচ্ছাই এ গণতন্ত্রের দর্শন। আর এই অবাধ ও মুক্ত পদ্ধতিতে সমাজের যাবতীয় ক্ষেত্রে একমাত্র সম্পদশালী ধনিকগোষ্ঠীই প্রতিযোগিতা করে সমাজে নিজ নিজ প্রতিপত্তি ও প্রভাববলয় সৃষ্টি করে সুসংহতভাবে টিকে থাকে। এ সমাজে, এ আর্থবৈষয়িক গণতান্ত্রিক সমাজে মেহনতি শ্রমজীবী সম্পদহীন সর্বহারা ব্যাপক মানবগোষ্ঠীর প্রতিযোগিতার কোনো অবকাশ নেই। বরং এই ব্যাপক মানবগোষ্ঠীকে শোষণ করার লক্ষ্যেই চলে সমাজের অতিনগণ্য সংখ্যক ধনিকগোষ্ঠীর প্রতিযোগিতা। এটাই হলো প্রচলিত বা পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের দর্শন বা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

এ গণতন্ত্রের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা জানতে পারি যে, সামন্তবাদী ব্রিটিশের রাজশক্তিও তাদের দোসর সামন্তশ্রেণী যৌথভাবে তাদের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী শিল্প বাণিজ্যিক ধনিক বুর্জোয়াগোষ্ঠীর সাথে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রের শাসন-শোষণ ও প্রভাবপ্রতিপত্তির বলয় সৃষ্টিকরণের ধারাধাহিক প্রতিযোগিতার ফলশ্রুতিতে এক রক্ষক্ষয়ী সংঘর্ষের অনিবার্য পরিণতি হিসেবে পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে তৎকালীন ব্রিটেনের সামন্তবাদী রাজার মুণ্ডপাতের মধ্য দিয়ে সামন্তশক্তির সীমাহীন ক্ষমতার দাপট লয়প্রাপ্ত হয়ে যায় এবং এভাবেই পুঁজিবাদী শক্তি তথা শিল্প-বাণিজ্যিক বুর্জোয়াগোষ্ঠী ব্রিটেনের ক্ষমতার মঞ্চে আরোহণ করেন। এ বুর্জোয়া গোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন ক্রমওয়েল।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শিল্প-বাণিজ্যিক বুর্জোয়াগোষ্ঠীর ঐ সাফল্যের পশ্চাতে প্রধান ও মূল শক্তি ছিল সামন্তবাদী ব্যবস্থার শিকার ব্যাপক ভূমিদাসশ্রমিকশ্রেণী, যারা সামন্তবাদী স্বৈরতান্ত্রিক শাসন-শোষণ, সীমাহীন অত্যাচার-নির্যাতন ও ব্যভিচারের শিকারে পরিণত হয়ে ধুকে ধুকে মরছিল। এই সকল হতভাগ্য ভূমিদাসশ্রমিকদের মুক্তি ও স্বাধীনতার গালভরা স্লোগান দিয়ে শিল্প-বাণিজ্যিক বুর্জোয়াগোষ্ঠীর প্রতিনিধি-রাজনৈতিক নেতৃত্ব তাদের প্রত্যক্ষ ও কার্যকরি সমর্থন আদায় করে নিতে সক্ষম হয়। অপরদিকে শিল্প-বাণিজ্যিক বুর্জোয়াগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানসমূহের শ্রমিকরাও তাদের মালিকদের দ্বারা শোষিত ও লাঞ্ছিত হচ্ছিল, তবে এদের ওপর শোষণ-বঞ্চনার পরিমাণ ততটা তীব্র ছিল না; এদের সংখ্যাও ছিল ভূমিদাসশ্রমিকদের তুলনায় অতি নগণ্য। এই শ্রমিকশ্রেণী তাই অনিবার্য কারণেই ব্যাপক ভূমিদাসশ্রমিকদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সামন্তবাদী স্বৈরতান্ত্রিক রাজশক্তির বিরুদ্ধে শিল্প-বাণিজ্যিক বুর্জোয়াগোষ্ঠীর সমর্থনে এক অনাগত মুক্তি ও স্বাধীনতার রক্তাক্ত বিপ্লবে ঝাপিয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে সামন্তবাদী রাজশক্তির পতন ও পরাজয় রক্তাক্ত পথই সূচিত হলো। রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক মঞ্চে সদর্পে আরোহণ করলেন শিল্প-বাণিজ্যিক বুর্জোয়াগোষ্ঠীর প্রতিনিধি মিঃ ক্রমওয়েল। একইভাবে ফরাসি বিপ্লবে সামন্ততান্ত্রিক রাজশক্তির পরাজয়ের মধ্য দিয়ে শিল্প-বাণিজ্যিক বুর্জোয়াগোষ্ঠীর সমর্থন নিয়ে ফরাসি ভূমিদাসশ্রমিকশ্রেণী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে, আর তাদেরই প্রতিনিধি নেপোলিয়ান বোনাপার্ট রাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন।

এভাবেই ব্রিটিশ ও ফরাসিদেশের শিল্প-বাণিজ্যিক বুর্জোয়াগোষ্ঠী ভূমিদাসশ্রমিকদের সমর্থনে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় সমাসীন হলো। ব্যাপক ভূমিদাসশ্রমিক ও শিল্প-বাণিজ্যিক শ্রমিকশ্রেণী এই সফল বিপ্লবের

পুরস্কারসরূপ দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেল ঠিকই, কিন্তু শাসনক্ষমতায় তাদের কোনো আসন মিললো না। যে সামন্তবাদী স্বৈরতান্ত্রিক রাজশক্তি ও সামন্তপ্রভুদের পরাজিত করে শিল্প-বাণিজ্যিক বুর্জোয়াগোষ্ঠী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলো, তারা ছলেবলেকলেকৌশলে রাজপুরুষ ও সামন্তপ্রভুদের নিকট থেকে মোটা অংকের ঘুষ গ্রহণ করে বা তাদের বিপুল সম্পদ অপহরণ ও লুট করে সীমাহীন অর্থসম্পদে-বিত্তবৈভবে ফুলেফেঁপে উঠতে লাগল। ফলে সমাজ থেকে সামন্তপ্রথা ও সামন্তপ্রভুদের উৎখাত করা সম্ভব হলো না। রাজতান্ত্রিক আমলাতন্ত্র ও সামরিকতন্ত্রকেও উৎখাত করা সম্ভব হলো না। কারণ তাদের অর্থসম্পদে প্রলুব্ধ হয়ে ক্ষমতাসীন বুর্জোয়াগোষ্ঠী তাদের সাথে প্রকারান্তরে মিতালী স্থাপন করল, নানান আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তুলল। এর প্রমাণসরূপ আমরা দেখতে পাই যে, রাজতন্ত্রের ক্ষমতাকে খর্ব করে রাজতন্ত্রকেই রাষ্ট্রীয় 'প্রতীক' হিসেবে নামমাত্র শাসনতান্ত্রিকভাবে ব্রিটেনে রেখে দেয়া হয়েছে। অপরদিকে যে রাজতন্ত্র বা সম্রাটতন্ত্রকে পরাজিত ও উচ্ছেদ করে ফরাসি বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধি নেপোলিয়ান বোনাপার্ট রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আরোহণ করেছিলেন– সেই বিপ্লবী নেপোলিয়ানই একদা সামন্ততান্ত্রিক রাজশক্তির দ্বারা প্রলুব্ধ ও প্রভাবিত হয়ে, তাঁর স্বগোত্রীয় বুর্জোয়াগোষ্ঠীর সমর্থন নিয়ে নিজেই ফরাসি দেশের সম্রাট সেজে বসলেন। এসবই হলো শিল্প-বাণিজ্যিক বুর্জোয়াগোষ্ঠীর নেতৃত্বে তথাকথিত বিপ্লবের করুণ পরিণতি! এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই।

ভূমিদাসশ্রমিক ও শিল্প-বাণিজ্যিক শ্রমিকশ্রেণী ঐ বিপ্লবের পুরস্কারসরূপ দাসত্বের শৃংখল থেকে মুক্তিলাভ ও কর্মের স্বাধীনতা পেল ঠিকই, কিন্তু রাষ্ট্রীয় নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে প্রতিযোগিতার অধিকার তাদের দেয়া হলো না। নানান বিধিবিধানের মারপ্যাচে শ্রমিকজনতার যোগ্যতাকে খর্ব করা হলো। তারা মুক্তি ও স্বাধীনতা পেল ঠিকই কিন্তু জীবননির্বাহের ও কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা তারা পেল না। বিপ্লবের পুরস্কার হিসেবে যে স্বাধীনতা তারা পেল, তাহলো অন্নহীন আশ্রয়হীন বস্ত্রহীন চিকিৎসাহীন শিক্ষাহীন কর্মহীন অসহায় অবস্থায় সীমাহীন অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎকে নিয়ে ধুকে ধুকে মরার অবাধ ও মুক্ত স্বাধীনতা! পূর্বতন সামন্তবাদী ব্যবস্থায় দাস বা দাসশ্রমিক মানবগোষ্ঠীর খাওয়া-পরা-আশ্রয় ইত্যাদির নিশ্চয়তা সামন্তপ্রভুদের পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়েছিল একটা মানবিক ও নৈতিক দায়িত্ববোধের মানদণ্ডে কিন্তু এই নয়া ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদী বা বুর্জোয়া সমাজে সেই মানবতাবোধ ও নৈতিকতাবোধের অবশিষ্ট আর রইলো না। অবাধ ও মুক্ত অবস্থায় যার যার স্বাধীনতা নির্ধারিত হলো। কে মরলো, কে খেলো না, কে পেলো না, এ সমাজে এ চিন্তাভাবনার বালাই রইলো না। এ সমাজে মানসম্মান, নামযশ,

খ্যাতি, প্রভাবপ্রতিপত্তি, ক্ষমতা, আত্মীয়তা, স্নেহ, মমতা, প্রেম, ভালোবাসা সব– সবকিছু নির্ধারিত হলো ধনসম্পদ, অর্থকড়ি ও বিত্তবৈভবের মানদণ্ডে।

ব্যাপক ভাগ্যাহত অবহেলিত অসহায় শ্রমিকগোষ্ঠীর মধ্য থেকে অল্পসংখ্যক লোককে শিল্প-বাণিজ্যিক বুর্জোয়াগোষ্ঠী তাদের শিল্পকলকারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে নামমাত্র পারিশ্রমিকে নিয়োগ করে তাদের শ্রম শোষণের ব্যবস্থা করা হলো। কারণ তখন তো শ্রমিকের কোনোই অভাব ছিলো না। অপরদিকে পরাজিত সামন্তপ্রভুদের জমিজমা অনেকখানি রাষ্ট্রীয় খাতে নিয়ে নেয়ার ফলে যা কিছু ছিল, তার ওপরও বিরাট খাজনা ও করের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। তারা আর শ্রমিকদের পারিশ্রমিক দিয়ে তাদের ক্ষেত্রসমূহে নিয়োগ করতে সমর্থ হলো না। সাবেক সামন্তপ্রভুদের একটি বিরাট অংশও বুর্জোয়াগোষ্ঠীর কারসাজিতে সাধারণ মানুষের কাতারে নেমে এলো। ফলে এই ব্যাপক কর্মহীন বেকার ও অসহায় মানবগোষ্ঠীর একটি অংশকে কর্ম ও অন্নসংস্থানের ধান্ধায় শাসকশ্রেণী, তথা পুঁজিপতি ধনিক-বণিক-শিল্পপতিগোষ্ঠীর পদতলে নিজেদেরকে বিলিয়ে দিতে হলো। তাদের মধ্যকার সাবেক সামন্তবাদী সমাজের সম্ভ্রান্তশ্রেণীর একটি অংশ নিজেদের সম্মান ও ইজ্জতের প্রশ্নে মাতৃভূমি ত্যাগ করে দলে দলে ভাগ্যকে সম্বল করে অজ্ঞাত অনিশ্চিত ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমালো সুদূর আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি অচেনা অজানা দেশ ও দ্বীপগুলোতে। আর যে সমস্ত মানবগোষ্ঠী দেশের মাটিকে আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকল তাদের অনেকে অন্নহীন অবস্থায় প্রাণত্যাগ করল, অনেকে জঠরজ্বালা নিবারণ ও মানসম্মানের প্রশ্নে পরিবার-পরিজনসহ আত্মহত্যার পথ বেছে নিল, এবং বাকি যারা প্রাণে বেঁচে রইলো তাদেরকে নামমাত্র পারিশ্রমিকে ধনিক বণিক শিল্পপতি বুর্জোয়াগোষ্ঠী তাদের ক্রমসম্প্রসারিত কলকারখানা শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা-বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে দিবারাত্রি অমানুষিক শ্রম প্রদানে বাধ্য করা হলো। মালিকপ্রদত্ত পারিশ্রমিকে শ্রমিকদের সংসার চলে কিনা বা তাদের শরীর স্বাস্থ্য ঠিক আছে কিনা, তাদের কর্মক্লান্তি আছে কিনা তা দেখার কেউ রইলো না। তাদেরকে জড়ো করা হলো নোংরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের ব্যারাক জাতীয় বস্তিতে। তাদের যুবতী স্ত্রীকন্যাদের ধনিকদের কামনার বেদীমূলে অর্পণ করতে বাধ্য করা হলো। এই হলো ধনতান্ত্রিক সমাজের পুঁজিপতি বণিক শিল্পপতি তথা ধনিকদের প্রদত্ত মুক্তি ও স্বাধীনতার মহত্তের অনিবার্য করুণ পরিণতি।

এভাবেই মেহনতি শ্রমজীবী মানবগোষ্ঠীর রক্ত জল করা শ্রমকে শোষণ করে শিল্পপতি-ব্যবসায়ী তথা ধনিক মালিকগোষ্ঠী মুনাফার নামে ব্যক্তিপুঁজির

পাহাড় গড়ে তোলে। আর এ ব্যক্তিপুঁজির বদৌলতে ইউরোপে গড়ে উঠল বৃহৎ বৃহৎ শিল্পকলকারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ। এ সীমাহীন ব্যক্তিপুঁজি ও ব্যক্তিমালিকানার প্রসার সংরক্ষণ ও সংহতকরণের লক্ষ্যে এবং যুগপৎ শ্রমজীবী মেহনতি মানবগোষ্ঠীকে দাবিয়ে ও বিভক্ত করে শোষণের ধারাকে প্রবহমান রাখার কৌশল হিসেবে শাসক-শোষকগোষ্ঠী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আনুষঙ্গিক বৈশিষ্ট্যসমূহ– যেমন সুশৃঙ্খল সামরিক বাহিনী, সামরিক শিল্প কমপ্লেক্স, সুশিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী আমলাবাহিনী ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে বিভিন্ন বৈরিতা সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকে সেদিকে নিবদ্ধ রাখার কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ ব্যতীত রাজনৈতিকভাবে সাধারণ মানুষকে বিভক্ত করে রেখে তাদের শোষণ করার কার্যকরি পদক্ষেপ হিসেবে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটায়। শোষকগোষ্ঠী ভালো করেই জানে যে, মেহনতি শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যের মধ্যেই তাদের ধ্বংসের বীজ নিহিত। তাই রাষ্ট্রব্যবস্থার ছত্রছায়ায় এ বহুদলীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতির ডামাডোলে তারা লিপ্ত হয়ে পড়ে। কারণ শোষকগোষ্ঠী জানে যে, বহুদলীয় রাজনীতির ধূম্রজাল বিস্তার করে, মেহনতি শ্রমিকজনতার ভাগ্যোন্নয়নের গালভরা স্লোগান দিয়ে এই ব্যাপক অজ্ঞ দুর্বল জনগোষ্ঠীকে বিভ্রান্ত করে অতিসহজেই তাদেরকে বিভক্ত করা সম্ভব, তাদের ঐক্যে ফাঁটল ধরানো সম্ভব। অপরদিকে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতির কার্যকলাপের টানাপোড়েনে অজ্ঞ দুর্বল শোষিত মেহনতি শ্রমিক-জনতা নির্ণয় করতে পারে না, কে তাদের বন্ধু কে তাদের শত্রু। কারণ শোষকগোষ্ঠী নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই তাদের ভাগ্যোন্নয়নের গালভরা স্লোগান দিয়ে বা নানান প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনকে মুখর করে রাখে। ফলশ্রুতিতে তারা নানান বিভ্রান্তিতে ভোগে। তাদের মধ্যে ঐক্য গড়ে উঠতে পারে না। তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ ব্যতীত রয়েছে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধিদের সুবিধাবাদী ও সুযোগসন্ধানী কার্যকলাপ। এই সুবিধাবাদী ও সুযোগসন্ধানী শ্রমিকনেতা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অধিকাংশ তথাকথিত বিপ্লবী নেতাদের সম্পর্কে বলা যায়, দিনের আলোয় এঁরা শাসক-শোষকদের বিরুদ্ধে বড় বড় সংগ্রামী বুলি আওড়ান, শাসক-শোষকদের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করেন. কিন্তু রাতের অন্ধকারে এইসব নেতারাই শাসক-শোষকদের সুরম্যবালাখানায় হাজির হন, খানাপিনা শেষে 'নগদ নারায়ণ' নিয়ে বেরিয়ে আসেন। এটাই হলো বহুদলীয় রাজনীতির ফলশ্রুতি। প্রকৃতপক্ষে শোষকশ্রেণীই তাদের স্বার্থে যাবতীয় রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

এই যে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতি, এটাকেই ইতিহাসে ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 'ওয়েস্টমিনিস্টার ধাঁচের গণতন্ত্র' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং এ বহুদলীয় গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাকেই ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী বিশ্ব একটি আদর্শিক শাসনব্যবস্থা হিসেবে গণ্য করে থাকে। ইংল্যান্ডের তৎকালীন শিল্পসমৃদ্ধ ওয়েস্টমিনিস্টার থেকেই এ জাতীয় বহুদলীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতির ক্রিয়াকাণ্ডের খেল জমে ওঠে। সে-কারণেই ঐ স্থানের নামানুসারে এ গণতন্ত্রের নামকরণ করা হয়েছে।

এ জাতীয় গণতন্ত্রের মূল লক্ষ্য ঃ অবাধ, মুক্ত ও বাধ্যবাধকতাহীনভাবে রাজনৈতিক আর্থবৈষয়িক ব্যবস্থার মাধ্যমে সীমাহীন ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধার করা। এটাকে ধনিকশ্রেণীর মধ্যকার প্রতিযোগিতামূলক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলা যেতে পারে। কারণ এ জাতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতায় তারাই কেবল অংশগ্রহণ করে টিকে থাকতে পারে বা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারে, যাদের রয়েছে প্রচুর অর্থসম্পদ এবং যাদের পশ্চাতে রয়েছে প্রশাসন ও আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী শক্তির পৃষ্ঠপোষকতা তথা সাহায্য-সহযোগিতা ও সমর্থন। এ গণতান্ত্রিক রাজনীতির আর্থপ্রতিযোগিতায় সমাজের ব্যাপক মেহনতি শ্রমজীবী শোষিত সর্বহারা মানবগোষ্ঠী অংশগ্রহণ করতে পুরোপুরি অক্ষম। তবে সক্ষম শুধু নির্বাচনে না-বুঝে, না-জেনে, না-ভেবে ধনিকশ্রেণী থেকে আগত নির্বাচনের পদপ্রার্থী ব্যক্তির পক্ষে ভোট প্রদান করতে বা ভোট বিক্রয় করতে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো ভোটারের ভোটটি কেউ কোথাও দিয়ে দিলে তার করার কিছুই থাকে না। অপরদিকে এ শ্রেণীর ভোটারদের একটি বিরাট সংখ্যা কোনো ভোটাভুটির ধারেকাছেও যায় না, সংসারের খোরাক সন্ধানে যার যার কাজকর্মে নিমগ্ন হয়ে যায়। ফলে এ বিরাট অনুপস্থিত ভোটারদের ভোট গ্রহণ করা সম্ভব হয় না, বা হয়তো তাদের অগোচরে ভোটগুলো প্রদত্তও হয়ে যায়। এমনও দেখা যায় যে, ভোটারদের মোট সংখ্যার শতকরা মাত্র ৪০ ভাগ জাতীয় নির্বাচনে অংশ নিয়েছে, বাকি ৬০% যে-কোনো কারণেই হোক নির্বাচনে অংশ নেয়নি, ঐ প্রদত্ত ৪০% ভোটারের অংশগ্রহণই জাতীয় মতামতের প্রতিফলন বলে ধরে নেয়া হয়। তারপরও কথা থাকে। দেখা গেল নির্বাচনে অনেকগুলো প্রতিদ্বন্দ্বীদলের মধ্যে একটি দল প্রদত্ত ৪০% ভোটের মধ্যে একাই ২৫% ভোট পেয়ে জয়লাভ করলো এবং সেই পার্টিই ক্ষমতায় আরোহণ করার অধিকার লাভ করলো। এটা কি জাতীয় মতামতের প্রতিফলন? ২৫% ভোটারের মতামতে বা নিম্নতম সংখ্যালঘু ভোটারের মতামতে 'জাতীয় মতামত বা গণতন্ত্র' বলে মেনে নিতে হবে? হ্যাঁ এটাকেও গণতন্ত্র বলে মেনে নিতে হবে। এবং এটাই হলো ধনতান্ত্রিক

পুঁজিবাদী সমাজের বহুদলীয় রাজনীতির গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রকৃত চরিত্র। এটাই হলো একটি রাজনৈতিক আদর্শ!

এ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বদৌলতে ব্যাপক মেহনতি শ্রমজীবী অজ্ঞ দুর্বল সর্বহারা মানবগোষ্ঠীর ওপর আইনগতভাবেই চেপে বসে একটি ক্ষুদ্র ধনিকশ্রেণীর স্বৈরাচারী শাসন, বল্গাহীন শোষণ এবং অশুভ প্রভাব-প্রতিপত্তি।

এ জাতীয় গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক পদ্ধতিতে গঠিত সরকারের শাসকগোষ্ঠী নিজেদের ও স্বগোত্রীয় স্বার্থ দেখবে এটাই তো স্বাভাবিক। আর ব্যাপক জনতা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে যায়; তারা ক্রমান্বয়ে নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হয়ে সর্বহারায় পরিণত হয়, তাদেরই শ্রম শোষণ করে গড়ে ওঠে ক্ষুদ্র ধনিকশ্রেণীর ভাগ্যের বিপুলসমৃদ্ধি। এ প্রসঙ্গে মনীষী কার্ল মার্কস যথার্থই বলেছেন : "In the captalist society the rich become still riches at the cost of the poor and the working classes."

তবে এ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠিত সরকারের মূল নীতিমালায় বা রাষ্ট্রীয় শাসনতান্ত্রিক নীতিমালায় মেহনতি দরিদ্র শ্রমিকজনতা ও ধনিকশ্রেণীর মধ্যে কোনো ক্ষেত্রেই কোনো তারতম্য বা পার্থক্য নির্ণয় করা হয় না। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। মিষ্টি কথায় চিড়ে ভিজানোর মতো শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন ধারা-উপধারায় এ জাতীয় নীতিবাক্য সযত্নে লিপিবদ্ধ করা হয়, যেমন ঃ

জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। জনগণের অন্ন বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা স্বাস্থ্য তথা মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ। আইনের চোখে সকলেই সমান। প্রত্যেক মানুষের জন্য ন্যায়বিচারের বিধান সংহতকরণ, শোষণ অত্যাচার বঞ্চনার অবসান নিশ্চিতকরণ, ব্যক্তিস্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, ব্যক্তিসম্পদ ও ব্যক্তিমালিকানা সংরক্ষণ ও হস্তান্তরের স্বাধীনতা, কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা, ন্যায়সঙ্গত পারিশ্রমিকের নিশ্চয়তা, শ্রমের স্বাধীনতা, ধর্মঘটের স্বাধীনতা, ভোটাধিকারের স্বাধীনতা, ধর্মপালনের স্বাধীনতা ইত্যাদি ইত্যাদি স্বাধীনতা ও অধিকারের নিশ্চয়তা। কিন্তু বলাইবাহুল্য, মুষ্টিমেয় ধনিক ভাগ্যবান ব্যতীত সমাজের ব্যাপক মানবগোষ্ঠীর ভাগ্যে এ গণতান্ত্রিক ও রাষ্ট্রীয় শাসনতান্ত্রিক স্বাধীনতা ও অধিকার কেমনতরো সোনার হরিণ বা নির্মমতর পরিহাস হিসেবে প্রতিফলিত হয়ে থাকে, তার ব্যাখ্যা করার কোনো প্রয়োজন আছে কি? এখানে যার অর্থ আছে, স্বাধীনতা তারই সাজে। যার অর্থ নেই, তার স্বাধীনতা নেই। অর্থই স্বাধীনতার পূর্বশর্ত।

প্রকৃতপক্ষে এসবই হলো শাসক-শোষকগোষ্ঠীর সৃষ্ট গণতন্ত্রের কাগুজে সংলাপ ও সান্ত্বনার বাণী। এসবই হলো তাদের-প্রতারণা শঠতা ছলনা ও ধোঁকাবাজির কৌশলীচাল মাত্র। এই ক্ষুদ্র চালবাজ, শোষকগোষ্ঠীর

স্বাধীনতার বেদীমূলে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ মেহনতি শ্রমিকজনতার স্বাধীনতা করুণ ও নিষ্ঠুরভাবে বলি হয়ে থাকে এবং তাদের প্রাত্যহিক জীবনের যাবতীয় অন্যায় অবিচার ব্যভিচার শোষণ বঞ্চনা ক্ষুধা ও দারিদ্র্যকে স্বাধীনভাবে ভাগ্যের লিখন বলে মেনে নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করে থাকে। আর এই যে 'ভাগ্যের লিখন', এটা হলো শোষকসমাজের সৃষ্ট ধর্মের উপহার।

ধনিক-দরিদ্র অর্থাৎ শোষক-শোষিত, এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে আরেকটি গোষ্ঠীর অবস্থান দেখতে পাওয়া যায়। এদের সাধারণার্থে বলা যেতে পারে দালালগোষ্ঠী বা মধ্যবিত্তশ্রেণী। এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এই যে, এরা হয় সুযোগসন্ধানী। এরা অবশ্য ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ মেহনতি জনতা থেকে আগত একটি ক্ষুদ্রশ্রেণী। এরা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল ও শিক্ষিত। এদের কাজই হলো শাসক-শোষকদের লেজুরবৃত্তি করা ও অর্থের বিনিময়ে দালালির কাজে লিপ্ত হওয়া। অপরদিকে এরাই আবার মেহনতি শ্রমজীবী মানুষকে নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। ফলে এদের চালে পড়ে মেহনতি শ্রমজীবী মানুষ ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না। ফলশ্রুতিতে শাসক-শোষকগোষ্ঠী নির্বিঘ্নে তাদের শাসন-শোষণকার্য চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়ে থাকে। এই যে মধ্যবিত্ত সুবিধাবাদী সুযোগসন্ধানীগোষ্ঠী, এদের কাতারে রয়েছে লর্ড, বায়রন, মনসবদার, জায়গীরদার, কাজী-উল-কুজ্জাত, উচ্চপদস্থ সামরিক-বেসামরিক আমলা, জমিদার, জোতদার, মহাজন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজনৈতিক দলের নেতা-পাঁতিনেতা, তথাকথিত শ্রমিকনেতা, ধর্মব্যবসায়ী, কৃষকনেতা, বুদ্ধিজীবী প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়। শোষকগোষ্ঠীর উচ্ছিষ্ট খাওয়া বা তাদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় এদের জীবন চলে। ধনিক শোষকগোষ্ঠীর মত এরাও জাতীয় উৎপাদনে কোনো শ্রম ব্যয় করে না। এরা উভয়েই হলো সম্পদের মধ্যস্বত্বভোগী। পরশ্রমজীবীশ্রেণী হিসেবে এদেরকে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। এসবই হলো আধুনিক ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী সমাজের বহুদলীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতির আর্থবৈষয়িক ব্যবস্থার সার্বিক পরিণতি।

তবে প্রকৃত গণতন্ত্র বা ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ মানবগোষ্ঠীর গণতন্ত্র ও ভাগ্যোন্নয়ন কোথায় এবং কোন দর্শনে নিহিত? কী তার সংজ্ঞা?

এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের ইতিহাসের পাতা থেকে শিক্ষা নিতে হবে। অকৃত্রিম আদি ও প্রকৃত গণতন্ত্র প্রাগৈতিহাসিক যুগের অর্থাৎ দাসপ্রথার পূর্বতন আদিম সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার মধ্যে আমরা খুঁজে পাই– যে গণতন্ত্র ও আর্থসাম্য সামাজিক দর্শনের ওপর ভিত্তি করে বা সেই সেই সামাজিক দর্শন থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ইসলামের খেলাফতের শাসন

ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল এবং যার ওপর ভিত্তি করে আধুনিক মার্কসীয় সাম্যবাদ বা সমাজতন্ত্র গড়ে উঠেছে। এ বিষয়ে পূর্বেই বিশদালোচনা করা হয়েছে।

তবে প্রকৃত গণতন্ত্র বা ব্যাপক মানুষের গণতন্ত্র বলতে আমরা এমন একটা রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থাকে বুঝি, যার মধ্যে জনগণের বৃহত্তম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর চিন্তাচেতনা আশা-আকাঙ্ক্ষার সার্বিক প্রতিফলন ঘটে এবং এমন একটা সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় যা তাদের দ্বারা, তাদের জন্যে, তাদের দিয়ে এবং তাদের বৃহত্তর কল্যাণ সাধিত হবে এবং এমন একটা সমাজ ব্যবস্থা, যেখানে মানুষের ওপর মানুষের শোষণ-অবিচার-অত্যাচার-বঞ্চনা থাকবে না, মানুষের মধ্যে কোনো শ্রেণীসত্তা ও বর্ণবৈষম্য থাকবে না, সকলে সমাজের সমষ্টিগত ভাগ্যোন্নয়ন ও কল্যাণে নিবেদিত থাকবে এবং একটি ধর্মনিরপেক্ষ ঐক্যবদ্ধ সমাজ এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সকলেই যার যার মেধা-প্রতিভা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে শাসনক্ষমতায় স্বাধীনভাবে যেতে সক্ষম এবং আর্থবৈষয়িক ক্ষেত্রে যাবতীয় সম্পদের মালিকানা সমাজের সমষ্টিগত মালিকানায় ন্যস্ত এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ যোগ্যতানুযায়ী কাজ করবে এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রয়োজনানুযায়ী জীবনযাপনের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা সমভাবে লাভ করবে। অর্থাৎ সাম্যবাদের মধ্যেই প্রকৃত গণতন্ত্র নিহিত। এবং প্রকৃত গণতন্ত্রের অপর নামই হলো সাম্যবাদ।

সুতরাং তথাকথিত ভোটাধিকার, ব্যক্তিস্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, অবাধ ও মুক্ত পরিবেশে সম্পত্তি অর্জন, যাই ইচ্ছে তাই করার অধিকার বা ফ্রি স্টাইলিং-এর নাম গণতন্ত্র নয়। একশ্রেণী ধনসম্পদে, বিত্তবৈভবে, প্রভাবপ্রতিপত্তিতে সমাজের বুকে শাসন-শোষণ-অত্যাচার-জুলুম-প্রতারণায় লিপ্ত হবে; একশ্রেণী শ্রম প্রদান করেও তার শ্রমের ফসল থেকে বঞ্চিত হবে, মৌলিক মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে; স্বৈরাচারী শাসন-শোষণ-অন্যায়-অবিচার-জুলুম ও প্রতারণায় ধুকে ধুকে মরবে– এর নাম গণতন্ত্র নয়। যে রাজনৈতিক সংগঠন শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, সাম্যভিত্তিক রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক অধিকার নিশ্চিত হয়, সমষ্টিগত মানুষের বৃহত্তর কল্যাণ সাধিত হয় সেই সমাজব্যবস্থাই প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। প্রকৃতপক্ষে জনগণের বৃহত্তম সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের শাসন, জনগণের সমষ্টিগত মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠাকরণ ও একটি শ্রেণীহীন শোষণহীন ধর্মনিরপেক্ষ সমাজই প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পূর্বশর্ত। এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

গণতান্ত্রিক বা সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরাধিকারভিত্তিক শাসনের কোনোই অবকাশ নেই। ইসলামের মহানবী তাই উত্তরাধিকারভিত্তিক শাসন বা নবুয়্যতপ্রথা বা রাজতন্ত্র অনুমোদন করেননি। ইসলামের দৃষ্টিতে এ জাতীয় ব্যবস্থা না-জায়েজ বলে গণ্য করা হয়েছে। এজন্যে মহানবী তাঁর সন্তানদেরকে তাঁর উত্তরাধিকার মনোনীত করেননি। খলিফারাও জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হতেন। তাঁরাও তাঁদের সন্তানদের উত্তরাধিকার করেননি। অবশ্য মাবিয়া, স্বঘোষিত খলিফা, এ সাম্যবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলে নিজপুত্র এজিদকে তাঁর উত্তরাধিকার মনোনীত করেছিলেন। এরই ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট দ্বন্দ্বসংঘাতে ইমাম হাসান-হোসেনের মর্মান্তিক তিরোধান এবং ইসলামী অঙ্গনে অগণতান্ত্রিক সামন্তবাদী উত্তরাধিকারভিত্তিক রাজতন্ত্রের প্রচলন ঘটে। মাবিয়া-এজিদচক্রের ঐতিহ্যকে ভিত্তি করে মহানবীর জন্মস্থান সৌদি আরবসহ অন্যান্য আরব রাষ্ট্রে ইসলামবিরোধী অগণতান্ত্রিক সামন্তবাদী উত্তরাধিকারভিত্তিক রাজতন্ত্র প্রচলিত আছে। এভাবেই প্রকৃত ইসলামকে রাজতন্ত্রী আরবের বালুকার অতলতলে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে এবং ইসলামেরই নামে রাজপরিবারের ইসলামকে আইনসম্মত করা হয়েছে। সুতরাং রাজতান্ত্রিক আরবরাষ্ট্রগুলোর শাসক-শোষকগোষ্ঠীকে মাবিয়া-এজিদের উত্তরসূরী এবং তাদের শাসন ব্যবস্থাকে 'ইসলামবিরোধী' ব্যবস্থা না বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। এবং তাদের আচার-আচরণ, চাল-চলন, আলাপ-ব্যবহার. আর্থবৈষয়িক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে এবং ঘৃণ্যসাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাথে মিতালী স্থাপনের কারণে তাদেরকে মহানবী ও ইসলামের দুশমন বললে অত্যুক্তি হবে না। এবং এসব কারণে তাদের কাছ থেকে মানবজাতির শেখারও কিছুই নেই।

এ প্রসঙ্গে লিবিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান মোয়াম্মের আল-গাদ্দাফী সৌদি আরবের শাসকগোষ্ঠীকে ইসলামের শত্রু হিসেবে আখ্যায়িত করে মক্কার কাবাশরীফ, মহানবীর মাজার শরীফ ও হজ্বকে ঐ ইসলামী দুশমনদের কবল থেকে উদ্ধার করে সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী সংস্থার ওপর অর্পণ করার যে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন, সেই বিপ্লবী ও মহামূল্যবান আহ্বানের মধ্য দিয়ে কোটি কোটি ইসলামীজনতার হৃদয়ের অব্যক্তবাণীই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। গাদ্দাফীর ঐ বিপ্লবী উক্তি ও আহ্বানের জন্যে কোটি কোটি প্রকৃত ইসলামীজনতা তাঁকে চিরকাল শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে, প্রকৃতই গণতন্ত্র কী ও কেনো এবং এর উদ্দেশ্য আদর্শ ও লক্ষ্যই বা কী এবং কোথায়

ও কিসে প্রকৃত গণতন্ত্র নিহিত এবং কী ব্যবস্থায় গণতন্ত্রকে সংহত করা সম্ভব।

২. জাতীয়তাবাদ

সাম্যবাদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা অনুভাবনা ও চেতনাবোধ থেকেই বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য সম্প্রীতি সহমর্মিতা সহযোগিতা ও সৌভ্রাতৃত্ববোধের উন্মেষ ঘটে। 'আমরা সকলে পরের তরে' এ নীতিই হলো জাতীয়তাবাদের সার্বিক মূল লক্ষ্য।

একটা জাতি যখন তার নিজস্ব ঐতিহাসিক ঐতিহ্যগত রাজনৈতিক আর্থসামাজিক সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে তার নিজস্ব চিন্তাভাবনা ধ্যানধারণা স্বকীয়তা আশা-আকাঙ্ক্ষা আত্মাহংবোধ মানসম্মানসম্ভ্রম জাতীয় কল্যাণ ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে, তখনই সেই জাতির মধ্যে জাতীয়তাবাদের স্ফূরণ ঘটে থাকে।

জাতীয়তাবাদ মূলতঃ কী এবং কেনো... এ প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে আমাদেরকে মানবসমাজের অতীত ইতিহাসকে পর্যালোচনা করেই অগ্রসর হতে হবে। নইলে জাতীয়তাবাদকে সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হবে না।

আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি যে, আদিমকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত মানবগোষ্ঠী প্রাকৃতিক প্রতিকূল পরিবেশে, হিংস্র ও অতিকায় জীবজন্তুর আক্রমণ, খাদ্যসামগ্রীর সমস্যা ও নানা বিরোধীয় মানবগোষ্ঠীর আক্রমণ ইত্যাদি জাতীয় বিরূপ পরিবেশের কবল থেকে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন দলে একতাবদ্ধ হতে বাধ্য হয়। এই বিভিন্ন দলবদ্ধ মানবগোষ্ঠীর চিন্তাধারা ছিল সমষ্টিগতভাবে সকলের ভাগ্যোন্নয়ন ও কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে প্রবাহিত। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলবদ্ধ মানবগোষ্ঠীই কালক্রমে এক-একটি উপজাতি বা কৌম হিসেবে চিহ্নিত হয়ে পড়ে। তবে মূলতঃ ঐ উপজাতিসমাজ গড়ে উঠেছিল প্রত্যক্ষ রক্ত সম্পর্ককে কেন্দ্র করে। প্রাথমিকভাবে জীবন বাঁচানোই ছিল তাদের প্রধানতম লক্ষ্য।

তৎকালীন প্রাকৃতিক সামাজিক পরিবেশগত বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপটে তাদের সামগ্রিক চিন্তাধারা ও কার্যক্রম গড়ে উঠেছিল উপজাতীয় সমষ্টিগত চিন্তাচেতনা ভাগ্যোন্নয়ন কল্যাণ ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে। তাই ব্যক্তিসত্তা ব্যক্তিচিন্তা ব্যক্তিস্বার্থ ব্যক্তিসম্পদ ব্যক্তিস্বাধীনতার কোনোই অবকাশ ছিল না। তারা একসাথে শিকারসহ অন্যান্যোপায়ে খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করতো এবং একই সাথে ভোজভুরি করতো এবং সকলে একসাথে চলাফেরা ও বসবাস করতো। যেহেতু প্রয়োজনের তুলনায় খাদ্যসামগ্রীর

পরিমাণ ছিল খুবই নগণ্য এবং যেহেতু প্রাকৃতিক নানান প্রতিকূল পরিবেশ, হিংস্র জীবজন্তুর ও বিরোধীয় উপজাতির আক্রমণ ছিল একটি প্রাত্যহিক সমস্যা– সে-কারণে খাদ্যান্বেষণ ও জীবনরক্ষার তাগিদে তারা যাযাবর জীবনযাপন করতে বাধ্য হতো। এ পর্যায়ে তাদের মধ্যে জাতিসত্তার কোনো চিন্তাভাবনা ছিল না ঠিকই তবে তারা উপজাতীয় সত্তায় সমষ্টিগতভাবে নিজেদের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করতো এবং যেহেতু ঐ উপজাতীয়তা প্রত্যক্ষ রক্তসম্পর্ককে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল সেহেতু তাদের গোষ্ঠীগত স্বার্থকে ভিত্তি করে তাদের মানসিক চিন্তাচেতনার উন্মেষ ঘটেছিল বলেই তারা একসাথে আহার সংগ্রহ, বসবাস ও চলাফেরা করতো। আদিম উপজাতীয় সাম্যবাদী সমাজ বা মানবজাতির ঐ সমাজব্যবস্থা প্রায় এক লক্ষ বছর টিকে ছিল বলে অনেকের ধারণা।

এরপরই আরেক নয়া যুগাধ্যায়ের সূত্রপাত।

উপজাতীয় সমাজপ্রধান বা সমরপ্রধান ও অন্যান্য প্রধান শক্তিশালী ক্ষমতাবান বিজ্ঞবান ব্যক্তিদের মনে, খাদ্যসমস্যার সমাধান হওয়ার পরে বা সমাজে বাড়তি সম্পদ উৎপাদনের পরিবেশ সৃষ্টি হলে, সেই বাড়তি সম্পদকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিলোভ-লালসা, ব্যক্তিচিন্তা বক্তিস্বার্থ ব্যক্তিসত্তা ইত্যাদির উদ্ভব ঘটলে সাম্যবাদী সমাজের ভাঙন সূচিত হয়। সমাজের সমষ্টিগত কল্যাণ ও ভাগ্যোন্নয়নের চিন্তাধারা ও কার্যক্রম এভাবেই বক্তিকেন্দ্রিক কল্যাণ ও ভাগ্যোন্নয়নের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে।

কালক্রমে উপজাতীয় সমষ্টিগত চিন্তাচেতনা থেকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তাচেতনার কার্যক্রম শুরু হওয়ার সাথে সাথে সমাজের উল্লেখিত প্রভাবশালী ব্যক্তিরা প্রভাব প্রতিপত্তি, কৌশল, বল ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে সমাজের সমষ্টিগত সম্পদ বা উৎপাদনব্যবস্থাকে নিজেদের করায়ত্তে এনে ঐ সম্পদসামগ্রী ব্যক্তিমালিকানায় নিরাপদ ও সংহতকরণের প্রয়োজনে আদিম উপজাতীয় সমাজ থেকে বেরিয়ে এসে নতুন সমাজের গোড়াপত্তন করে। এর জন্যে তারা এক-একটা সুবিধাজনক অঞ্চলে বা স্থানে তাদের আবাসস্থল গড়তে থাকে। এভাবেই একই স্থানে বিভিন্ন সমাজচ্যুত, সমাজদ্রোহী, ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিক একই চিন্তাধারার জনগোষ্ঠী নিজের সম্পদসামগ্রী নিরাপদ সংহত ও আদিম উপজাতীয় সদস্যদের আক্রমণ থেকে জীবনরক্ষার তাগিদে এ সমাজে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে থাকে।

এভাবে বিভিন্ন উপজাতি থেকে আগত অগ্রসরমান মানবগোষ্ঠী একই স্থানে ও একই আর্থবৈষয়িক চিন্তাচেতনায় বহুকাল একসাথে বসবাস করার ফলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক নানান সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ সময় তাদের

পরস্পরের ভাষা-সংস্কৃতি, কৃষ্টি, লোকাচার, ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদি ক্ষেত্রেও একটি সর্বজনীন রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে। এখানে প্রত্যক্ষ রক্তের পাশাপাশি আর্থসামাজিক চিন্তাচেতনা ও পেশাগত ধ্যানধারণাও প্রাধান্য পেতে থাকে। এ পর্যায়ে তারা নিজেদের ব্যক্তি আরাম-আয়েশ, সম্পদ বৃদ্ধি ও নিরাপত্তা সুসংহত করার প্রয়োজনে আদিম উপজাতীয় সমাজ থেকে কর্মঠ শক্তিশালী বিশ্বস্ত লোকদের ধরে এনে বা সম্পদের লোভে বশ করে তাদেরকে ব্যক্তিগত দাস ও প্রহরী হিসেবে নিয়োগ করে। আর সামগ্রিকভাবে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে ঐভাবে লোক সংগ্রহ করে শক্তিশালী লোকদের সমন্বয়ে তারা এক-একটি লাঠিয়াল বা সমরবাহিনী গড়ে তোলে। এ বাহিনীকে সংহত করার লক্ষ্যে প্রত্যেক সম্পদশালী ব্যক্তি একটা নির্দিষ্ট চাঁদা প্রদান করে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, আদিম উপজাতীয় সমাজ থেকে এই সমাজে চলে আসার পর– এ সমাজকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে এ মানবগোষ্ঠীও সমাজপ্রধান, সমরপ্রধান, উৎসবপ্রধান বা ধর্মপ্রধান ইত্যাদি পদের সূত্রপাত ঘটায়।

এ সমাজব্যবস্থাকে সুসংহত করা অর্থাৎ ব্যক্তিসম্পদ বা ব্যক্তিমালিকানাকে নিরাপদ রাখা ও দাসমানবগোষ্ঠীকে তাদের অধীনে নিয়োজিত রাখার প্রয়োজনে নানান সামাজিক ও ধর্মীয় বিধিবিধানের সূত্রপাত ঘটাতে থাকে। এ সামাজিক ও আর্থবৈষয়িক প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তা কালক্রমে বিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে বিভিন্ন অগ্রসরমান মানবগোষ্ঠীর আবাসস্থলে হাট-বাজার-বন্দর-নগর ইত্যাদি গড়ে ওঠে এবং অগ্রসরমান বিভিন্ন নগরকে কেন্দ্র করে এক-একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগররাষ্ট্রের পত্তন হয়। এ স্তরে সমাজপ্রধান সমরপ্রধান ও অন্যান্য প্রধান প্রধান সম্পদশালী বিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্য থেকে বা নানান দ্বন্দ্ব-বিবাদ-সংঘর্ষ ও যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বিজয়ী ব্যক্তিরা এইসব নগররাষ্ট্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা-বাদশা-শাহেনশাহ প্রভৃতি কর্ণধার হিসেবে বেরিয়ে আসেন এবং নগররাষ্ট্রের জনগণ তাদের প্রজায় রূপান্তরিত হয়ে পড়ে। এইসব নগররাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে অন্যান্য আনুষঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের মতো একটি নির্বাচিত পরিষদও গড়ে তোলা হয়।

সুতরাং নানান বিবর্তনের পথ বেয়ে যখনই মানবসমাজে রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটেছে তখন এর যাবতীয় নিরাপত্তা সংরক্ষণ, জনগণের মধ্যে ঐক্য শৃঙ্খলা ইত্যাদি সংহতকরণের মধ্য দিয়েই ক্ষুদ্র জাতি বা জাতীয়তাবাদের স্ফূরণ ঘটেছে।

অর্থাৎ রাষ্ট্রসত্তা ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষের পশ্চাতে একই ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যে বসবাসকারী একই আর্থসামাজিক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ বিভিন্ন উপজাতি থেকে আগত মানবগোষ্ঠীর ভাষা-সংস্কৃতি-কৃষ্টি, লোকাচার বা ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতি সংমিশ্রণের পর সর্বজনীন রূপলাভ হওয়ার ফলশ্রুতিতে একটি অভিন্ন জাতিসত্তার উন্মেষ ঘটে। আর এই জাতিসত্তাই কালক্রমে জাতি, জাতীয়তাবাদ ও রাষ্ট্রসত্তার সূত্রপাত ঘটায়।

এটাই হলো জাতীয়তাবাদ উন্মেষের মোটামুটি একটা ঐতিহাসিক মূল্যায়ন। তবে আধুনিক জাতীয়তাবাদী চিন্তাচেতনা আরো বৈচিত্র্যময় সমৃদ্ধশালী ও শক্তিশালী।

আধুনিক জাতীয়তাবাদ মূলতঃ দুটি রাজনৈতিক চিন্তাচেতনার পটভূমিতে গড়ে উঠেছে। একটি হলো সংকীর্ণ রাষ্ট্রকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদ– অপরটি হলো আন্তর্জাতীয়তাবাদ বা বিশ্বমানবতাবাদ। সংকীর্ণ রাষ্ট্রকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদ হলো উগ্র বা আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ। যেমন হিটলারী জাতীয়তাবাদ, ইসরাইলী জাতীয়তাবাদ, পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি। হিটলারের নাৎসী জাতীয়তাবাদের বলি হয়েছে কয়েক লক্ষ মানবসন্তান– ফলশ্রুতিতে জার্মান জাতি দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। ইসরাইলী ইহুদী বা জায়েন জাতীয়তাবাদের বলি হয়েছে প্যালেস্টাইন জাতি। পাকিস্তানি তথাকথিত দ্বি-জাতীয়তাবাদ বা ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের বলি হয়েছে ত্রিশ লক্ষ বাঙালি নরনারী এবং লুণ্ঠিত ও শোষিত হয়েছে বাংলাদেশ। ফলশ্রুতিতে আমরা বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে পাকিস্তান থেকে যুদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জন করেছি। অর্থাৎ সংকীর্ণ বা উগ্রজাতীয়তাবাদ অন্য কোনো জাতীয়তাবাদকে সহ্য করতে চায় না।

আর অপরটি আন্তর্জাতীয়তাবাদ বা বিশ্বমানবতাবাদ। এই জাতীয়তাবাদ রাষ্ট্রহীন শ্রেণীহীন ধর্মনিরপেক্ষতা ও বিশ্বভাতৃত্ববোধের আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। এর জাতীয়তাবাদের চিন্তাচেতনায় ইসলামী সাম্যবাদী চিন্তাচেতনার উন্মেষ ঘটেছিল। আর আধুনিক মার্কসীয় দর্শনের মূল লক্ষ্যও আন্তর্জাতীয়তাবাদ।

একটি জাতি বা রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সেই জাতির রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদ তার ব্যাপক জনগোষ্ঠীর ঐক্য ও সংহতিকে সংহত করে সাম্যবাদী ধ্যানধারণার উন্মেষকে ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করে। যেমন করেছে সোভিয়েত রাশিয়া, চীন, ভিয়েতনাম, কিউবা, পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ। তবে প্রকৃত সাম্যবাদের মূল লক্ষ্য আন্তর্জাতীয়তাবাদ। কারণ সাম্যবাদী দর্শনে কোনো রাষ্ট্র শ্রেণী স্তর স্বীকৃত

নয়; ধর্মের ব্যাপারে আগ্রহ নেই বা বিতৃষ্ণাও নেই– ধর্মনিরপেক্ষতাই এখানে অনুমোদিত। এর সার্বিক লক্ষ্য বিশ্বমানবতার কল্যাণ তথা একটি শোষণহীন সুখসমৃদ্ধশালী বিশ্বমানবের সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠাকরণ।

এ কারণেই সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, নয়াউপনিবেশবাদী শাসক-শোষক সমাজের কাছে আন্তর্জাতীয়তাবাদ মরণফাঁদসরূপ। এজন্যেই শাসক-শোষকগোষ্ঠী ক্ষুদ্র পরিসরে রাষ্ট্রসত্তার সূত্রপাত ঘটিয়েছে। এবং ভাষা ও ধর্মভিত্তিক সংকীর্ণ ও উগ্রজাতীয়তাবাদের ছত্রছায়ায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বলে বলিয়ান হয়ে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি শাসন-শোষণকার্য চালিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে এ ধরনের জাতীয়তাবাদের সূত্রপাত করেছে। আর এ ধারাকে প্রবহমান রাখার লক্ষ্যে এর নেপথ্যে ইন্ধন যুগিয়ে থাকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই আবার বিভিন্ন অঞ্চলের শোষিত অত্যাচারিত মুক্তিকামী মানুষের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে বিকৃতপথে সমর্থন দিয়ে, তাদের ভাওতা দিয়ে তাদের গুদামজাতকৃত বাজে অস্ত্র বিক্রি করে থাকে বা সাহায্য দিয়ে থাকে; কোনো কোনো ক্ষেত্রে সৈন্য দিয়েও সাহায্য করে থাকে। এর অন্তরালে রয়েছে তার একটি লক্ষ্য। তাহলো সেই সদ্যস্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের ক্ষমতায় তার সেবাদাসদের বসিয়ে দিয়ে সাম্যবাদকে প্রতিহত করা, পুঁজিবিনিয়োগ বা পুঁজিলগ্নি দেয়া। একচেটিয়া বাজার দখল করে তার পরোক্ষ শাসন ও শোষণকার্য ঠিক রাখা। এ প্রক্রিয়ায় জন্মলাভ করে উপনিবেশবাদ। এই পুঁজিবিনিয়োগ ও বাজার ব্যবস্থাকে ফাইন্যান্স ক্যাপিটাল ও ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটিং নামে অভিহিত করা হয়েছে।

সুতরাং আন্তর্জাতীয়তাবাদ তথা বিশ্বমানবজাতির জাতীয়তাবাদকে ওভাবেই সাম্রাজ্যবাদ ও তার সেবাদাসরা প্রতিহত করতে তৎপর। অবশ্য এ মানবতাবিরোধী শক্তির প্রতি চ্যালেঞ্জ দিয়ে আধুনিক সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব– বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন আন্তর্জাতীয়তাবাদী চিন্তাচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সাম্রাজ্যবাদ ও নয়াউপনিবেশবাদ কবলিত শোষিত মানবজাতির মুক্তিসংগ্রামে সক্রিয় সাহায্য সমর্থন দিয়ে সাম্যবাদী শাসক-শোষক ও তাদের সেবাদাসদের দাঁতভাঙা জবাব দেয়। আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ ও আন্তর্জাতীয়তাবাদের মধ্যে ইতোমধ্যেই প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। এ প্রতিযোগিতার সূত্রপাত ঘটেছে আধুনিক সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সময় থেকে– প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। আর প্রকৃত জাতিরাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদ বা আধুনিক জাতীয়তাবাদের চিন্তাচেতনাও প্রথম মহাযুদ্ধেরই ফলশ্রুতি, এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

প্রথম মহাযুদ্ধ মানবজাতির জন্যে অভিশাপ হলেও নিপীড়িত শোষিত জাতিসমূহের মানবগোষ্ঠীর স্বাধীনতা ও মুক্তি ত্বরান্বিত করে এবং তাদের জাতীয়তাবাদ সংহত হয়, ফলশ্রুতিতে কিছু কিছু জাতি সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ হতে মুক্তিলাভ করতে সমর্থ হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকাল থেকেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসন-শোষণের কবল থেকে মুক্তির লক্ষ্যে ভারতীয় উপমহাদেশের বুকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটে। অবশ্য এর পূর্বে ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে এ চিন্তাধারার স্ফূরণ ঘটেছিল। কিন্তু দেশীয় শাসক-শোষকদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থতায় পর্যবশিত হয়ে যায়। তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মহাজাগরণ সূচিত হয়। এ চিন্তাধারায় দেশীয় শাসক-শোষকরাও উজ্জীবিত হয়ে পড়ে। আর এ চিন্তাধারার অগ্রসেনানী হিসেবে আবির্ভূত হন মহাবিপ্লবীপুরুষ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামও তাদের কবিতা ও গানের মধ্য দিয়ে এ চিন্তাধারাকে এগিয়ে নিয়ে আসেন। এ ব্যতীত ক্ষুদিরাম, সূর্যসেন প্রমুখ সংগ্রামীদের বিপ্লবী কর্মোদ্দীপনা ও কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে ভারতবাসীর মনে জাতীয়তাবাদের জাগরণ ঘটে এবং ভারত ছাড় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতের স্বাধীনতার দাবি উত্থাপিত হয়।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা নেতাজী সুভাষ বসু স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠার মহান লক্ষ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করেন। 'আজাদ হিন্দ ফোর্স' নামে তিনি একটি সর্বভারতীয় সৈন্যবাহিনী গঠন করেন এবং ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও শুরু হয়েছে। ফলে নেতাজীর সংগ্রাম ঢাকা পড়ে যায় বা বলতে গেলে তৎকালীন ভারতীয় নেতাদের সংকীর্ণ মনোভাবের কারণে এই সংগ্রাম (সশস্ত্র) ব্যর্থ হয়ে যায়। ইতোমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটলো। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের ক্ষমতার দাপট ঐ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে অনেকখানি ভেঙে পড়ে। তবু ভারতকে হাতছাড়া করতে তারা সম্মত নয়। নতুন কলাকৌশলের আশ্রয় নেয়া হলো। এই কৌশল 'ডিভাইড এন্ড রুল'– অর্থাৎ ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে খর্ব করে ভারতবাসীকে 'হিন্দু-মুসলমান দুই জাতি' এইভাবে বিভক্ত করে শাসন-শোষণকার্য চালানো। কূটকৌশলী ব্রিটিশ শাসকদের এই নবতর খেলার প্রথম টোপটি গিলে ফেললেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দালাল মোহম্মদ আলী জিন্নাহ। প্রভু ব্রিটিশের নীলনকশা বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে তিনি 'দ্বি-জাতিতত্ত্ব' মতবাদ প্রচার করতে লাগলেন। এর অর্থ ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ।

মোহম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বি-জাতিতত্ত্ব ফতোয়া এবং তাদের সেবাদাস এজেন্ট উপমহাদেশীয় কায়েমী স্বার্থান্বেষী ধনিক-বণিক-শিল্পপতি, জমিদার-জোতদারগোষ্ঠী, উচ্চপদস্থ সামরিক-বেসামরিক আমলা ও তাদের প্রভাবিত রাজনৈতিক দালালগোষ্ঠী একযোগে তাদের শাসন-শোষণ, প্রভাব-প্রতিপত্তি বজায় রাখার লক্ষ্যে ব্রিটিশের নয়া কৌশলকে আশীর্বাদ মনে করে মহাপ্রভুর দেয়া ধর্মীয় আফিম সেবন করে সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের অপমৃত্যু ঘটায়। দ্বি-জাতিতত্ত্বের পরিণতি হিসেবে ভারত-পাকিস্তান নামক দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হলো।

ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ যে একটি অস্বাভাবিক, ভঙ্গুর, গোঁজামিল, শঠতা, শোষণ, বঞ্চনা অত্যাচার, নিষ্পেষণ, প্রতারণা ও ব্যভিচারমূলক জাতীয়তাবাদ তার প্রমাণ বাংলাদেশের মানুষ হাঁড়ে হাঁড়ে পেয়েছে পাকিস্তানের ২৪ বছরের ইতিহাসে। পাকিস্তানের সেই তথাকথিত মুসলমানী জাতীয়তাবাদ পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখতে পারেনি। ধর্মভিত্তিক পাকিস্তানি স্টাইল জাতীয়তাবাদ স্বাভাবিক ও অনিবার্যকারণেই ভেঙে গেছে স্বাভাবিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের ফলশ্রুতিতে। এ ব্যতীত মধ্যপ্রাচ্যের সবকটি রাষ্ট্রের অধিবাসীরা মুসলমান এবং তাদের ভাষা-সংস্কৃতি-লোকাচার, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যদ্রব্যসহ একই রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রীয় মূলমন্ত্র ইসলামী ধর্ম সবকিছু একই চিন্তাধারা ও ব্যবস্থাপনায় হলেও সেখানে কিন্তু ধর্মভিত্তিক বা ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি বা সম্পূর্ণ আরব জাতি একটিমাত্র রাষ্ট্রব্যবস্থায় ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি। ঐ অঞ্চলে শাসক-শোষকদের কারসাজিতে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছে বলেই একই ভাষা–ধর্ম-রাজনৈতিক-আর্থসামাজিক ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও সেখানে পৃথক রাষ্ট্রের পত্তন হয়েছে। এছাড়াও বিশ্বের কোথাও ধর্মভিত্তিক জাতি-রাষ্ট্র-জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বা আছে তা আমাদের জানা নেই। এক্ষেত্রে পাকিস্তানই ছিল একটি ব্যতিক্রম। পরিণতিতে যা হওয়ার তাই হয়েছে। কিন্তু এতেও পাকিস্তানি স্বৈরতান্ত্রিক শাসক-শোষকদের শিক্ষা হয়নি। তাদের গোঁয়ার্তুমি গোঁড়ামি প্রতারণা ও স্বৈরাচারী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভিত্তিক শোষিত নিষ্পেষিত জাতিসমূহ সোচ্চার হয়ে উঠেছে। হয়তো সেদিন আর বেশি দূরে নয়, পাকিস্তানি ধর্মবেশধারী কায়েমী স্বার্থান্বেষী পাঞ্জাবী শাসক-শোষকগোষ্ঠীর জন্যে ইতিহাসের আরেকটি চরমতম শিক্ষা এগিয়ে আসছে। স্বাধীন 'পাখতুনিস্তান আন্দোলন' এর একটি প্রমাণ বহন করছে। আর এ থেকে পাকিস্তানের নিরীহ জনসাধারণ ও বিশ্ববাসীকে ধোঁকা দিয়ে, অন্যদিকে তাদের দৃষ্টি ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার হীনলক্ষ্য স্বৈরাচারী ধুরন্ধর পাঞ্জাবী

শাসক-শোষকগোষ্ঠী ও তাদের মুরুব্বী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আফগানিস্তানে সোভিয়েত রাশিয়ার সমর্থনের মধ্যে জুজুর ভয় আবিষ্কার করে ও ভারতের আক্রমণের কাল্পনিক কাহিনী ফেঁদে সারা বিশ্বময় তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে। চৈনিক বর্তমান হঠকারী নেতৃত্ব ও পেট্রোডলারী ইসলামী ধর্মীয় সাম্রাজ্যবাদ সৌদি আরব এ কাজে পাকিস্তানকে অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে মদত দিচ্ছে। আর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অস্ত্র অর্থ তো তারা পাচ্ছেই। কিন্তু ইতিহাসের রায়কে গোঁজামিল শঠতা কূটকৌশল ও বলপ্রয়োগ করে নস্যাৎ করা যাবে না, কোনো ছদ্মবেশ দিয়ে ঢাকা দেয়া যাবে না।

সুতরাং সংকীর্ণ বা গোঁজামেলী জাতীয়তাবাদ তথা ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ স্বৈরাচারী শাসক ও কায়েমী স্বার্থবাদী শোষকদের রাজনৈতিক হাতিয়ার বৈ আর কিছু নয়। আর বিশ্বমানবের ভাতৃত্ব, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, শোষণমুক্ত সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শ্রেণীহীন সম্প্রদায়হীন বর্ণবৈষম্যহীন ক্ষুদ্ররাষ্ট্রহীন ও ধর্মনিরপেক্ষতার অপর নামই আন্তর্জাতীয়তাবাদ।

তবে বর্তমান বিভিন্ন ভাষা ধর্ম ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক ভৌগোলিক সামাজিক রাজনৈতিক পরিবেশে গড়ে-ওঠা মানবজাতির বিভিন্ন মন-মানসিকতা, আর্থসামাজিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন জাতি-রাষ্ট্রের ও শ্রেণীবিভক্ত মানবগোষ্ঠীর মধ্যকার দ্বন্দ্ববিবাদ, সংঘর্ষ, যুদ্ধ, আদর্শিক মতবিরোধ ইত্যাদি নানান প্রতিকূল অবস্থার ফলশ্রুতিতে আন্তর্জাতীয়তাবাদের সার্বিক চিন্তাচেতনা ব্যাপক বিশ্বমানবগোষ্ঠীর মনে পুরোপুরি অঙ্কুরিত হয়নি, ফলে হঠাৎ করে আন্তর্জাতীয়তাবাদের আহ্বান দেয়া বা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ, বৈদেশিক ও দৈশিক পুঁজিবাদী শাসন-শোষণের মধ্য দিয়েই– অর্থাৎ এসব শক্তির কার্যকলাপের বাস্তব অবস্থার মধ্য দিয়েই শোষিত মেহনতি ব্যাপক মানবগোষ্ঠীর মনে এ চিন্তাধারার উত্তরণ ঘটবে। ইতোমধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের অগ্রসরমান শ্রমিক মেহনতি মানুষের মধ্যে এ চিন্তাধারা পরিপক্ক হয়ে উঠেছে। তাই হতাশ হবার কিছু নেই। উপরোক্ত কারণসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে আপাত রাষ্ট্রীয় সাম্যবাদী জাতীয়তাবাদী গণচেতনাতান্ত্রিক কার্যক্রম ও প্রচারণার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে হবে। আন্তর্জাতীয়তাবাদ তথা সাম্যবাদের বৈশিষ্ট্যসমূহকে শিক্ষা ও কর্মের ভেতর দিয়ে সাধারণ মানুষের দ্বারে ও অন্তরে পৌঁছে দিতে হবে। এবং বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের শোষিত নিষ্পেষিত মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রামে সক্রিয় নৈতিক বৈষয়িক ও আত্মিক সমর্থন দিয়ে যেতে হবে।

বাংলাদেশে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদের মধ্য দিয়ে একটি গণতান্ত্রিক শোষণমুক্ত সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠাকরণের কর্মসূচি বঙ্গবন্ধু কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু তিনি মূলত আন্তরিকভাবেই ছিলেন আন্তর্জাতীয়তাবাদের চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ। এ কারণেই তিনি বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের শোষিত মুক্তিকামী মানুষের মুক্তিসংগ্রামে দ্ব্যর্থহীন সমর্থন দিয়েছেন। তিনি বিশ্বের ব্যাপক শ্রমজীবী মেহনতি শোষিত মানুষের ঐক্য ও জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করতেন এবং নিজেকে তাদেরই একজন হিসেবে মনে করতেন বলেই প্রত্যয়দৃপ্ত বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, 'বিশ্ব আজ দুইভাগে বিভক্ত। শোষক ও শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে।'

৩. ধর্মনিরপেক্ষতা

ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি ব্যতীত একটি সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। ধর্মনিরপেক্ষতাই হলো সাম্যবাদী সমাজের অন্যতম মূল বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ সাম্যবাদী সমাজে ধর্মকে রাজনৈতিক প্রশাসনিক আর্থবৈষয়িক সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বাইরে– মানুষের আত্মিক বা ব্যক্তিজীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে– ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিতে ঐগুলো বাস্তবায়িত করা হয় সমাজের সকল মানুষের সার্বিক কল্যাণ ভাগ্যোন্নয়ন ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে।

যেহেতু মানবসমাজের বুকে নানান ধর্মমত প্রচলিত আছে এবং যেহেতু ধর্ম মানবসমাজে সাম্প্রদায়িক মনোভাব, চিন্তাচেতনা, ধ্যানধারণা, বৈষম্য, অনৈক্য, শ্রেণীসত্তা ও দ্বন্দ্বকলহবিবাদ সৃষ্টি করে তথাকথিত সংকীর্ণ বা উগ্রজাতীয়তাবাদী চিন্তাধারায় সমাজের মানুষকে নানান পথ ও মতে বিভক্ত করে রাখে, মানুষের সমষ্টিগত চিন্তাধারায় ফাটল ধরিয়ে সমাজের বুকে হানাহানি রেষারেষি ও গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়গত স্বার্থকে চাঙ্গা করে, সেহেতু সমাজের ব্যাপক মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সাম্য-মৈত্রী ভাতৃত্ব-ঐক্য, সহমর্মিতা, সহযোগিতা, সহানুভূতি, সহিষ্ণুতা তথা জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠতে পারে না। কারণ প্রতিটি ধর্মকে নানান আভরণে-আবরণে, কলাকৌশলে ও তথাকথিত আধ্যাত্মিকতাবাদে এমনভাবে মণ্ডিত করা হয়েছে বা ধর্মের মধ্যে এমন আফিমীশক্তি ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে যে, যে বা যে গোষ্ঠী একবার তার প্রভাবে পড়েছে বা তার প্রতি আকৃষ্ট ও আসক্ত হয়েছে, সে বা সেই গোষ্ঠীর পক্ষে ধর্মমতের বাইরে চলা সম্ভব নয়। শক্তিশালী ক্ষমতাবান, বিত্তশালী ব্যক্তিচক্রের স্বভাবগত বিচ্যুতির ফলে অন্য কোনো ধর্মের প্রতি সহনশীলতা সহিষ্ণুতা ও শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করা বা নানান কার্যক্রমে ধর্মে ব্যাপারে নিরপেক্ষতা পোষণ করা সম্ভব নয়। এ কারণেই একই ভাষাভিত্তিক সমাজরাষ্ট্রে

বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ঐক্য-ভ্রাতৃত্ব-সাম্য- মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এর সপক্ষে ভুরি ভুরি প্রমাণ দেয়া যায়।

এ প্রেক্ষাপটে ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক শ্রেণীসত্তাজাত মানবসমাজে সাম্যবাদী চিন্তাচেতনা, ধ্যানধারণা তো জাগ্রত হয়ই না, উপরন্তু এই শ্রেণীসত্তা বা ধর্ম হয়ে পড়ে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার বিপ্লবের পথের একটা মহান্তরায়। অর্থাৎ ধর্ম ও সাম্যবাদ হলো পরস্পরবিরোধী দুটি সামাজিক-রাজনৈতিক দর্শন। সাম্যবাদ তবু সমাজের বুকে ধর্মকে ব্যক্তিজীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিতে সামাজিক রাজনৈতিক ও আর্থবৈষয়িক প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে পরিচালনা করতে চায়। কিন্তু ধর্ম সাম্যবাাদকে একেবারেই সহ্য করে না, বরং এর বিরোধিতা করে এর যাবতীয় চিন্তাচেতনা, ধ্যানধারণা ও কার্যক্রমকে খর্ব করতে সদাতৎপর এবং সাম্যবাদকে নাস্তিকতাবাদ, নৈরাজ্যবাদ ও একদলীয় ব্যবস্থা বলে অপবাদ দিয়ে থাকে। অর্থাৎ সাম্যবাদকে সুকৌশলে প্রতিহত করার লক্ষ্যে ধর্ম মানুষসমাজের মধ্যে শ্রেণী-দ্বন্দ্ব-সংঘাত-অনৈক্য-হিংসা ও বিদ্বেষকে চাঙ্গা করে যাবতীয় শোষণ নিপীড়ন অত্যাচার নির্যাতন অবিচার প্রতারণা শঠতা ও ব্যভিচার পৈশাচিকতাকে সমাজে আল্লাহর নামে জায়েজ করে এসেছে, নিতে চায়। ধর্মের বিগত দশ হাজার বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মানবসমাজের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়ে এর সপক্ষে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল এবং সেই কলঙ্কের ঐতিহ্যকেই ধর্ম বয়ে নিয়ে এসেছে মানুষের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করাই হলো ধর্মের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। আর যাবতীয় কলঙ্ককে ঢাকার জন্যে ধর্মের ধারক-বাহক শাসক-শোষক ও মোল্লাতন্ত্র সাম্যবাদকে নাস্তিকতাবাদে ও নৈতিকতাবাদহীন দর্শন বলে চিহ্নিত করতে চায়। সে যাই হোক, আমরা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মধ্যে আমাদের বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখতে চাই।

ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্মহীনতা নয়। কেবলমাত্র সকল ধর্মের প্রতি সহনশীলতা ও পক্ষপাতহীন কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজের ব্যাপক মানবগোষ্ঠীর ঐক্য-ভাতৃত্ব-সাম্য-স্বাধীনতা-মুক্তি-সহমর্মিতা-সহযোগিতাকে সংহত করে সাম্যবাদী গণতান্ত্রিক শোষণহীন শ্রেণীহীন কল্যাণ সমৃদ্ধিধর্মী সমাজ প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত ও নিশ্চিত হতে পারে। এটাই হলো ধর্মনিরপেক্ষনীতির মূল লক্ষ্য।

ধর্ম সমাজের হাজার বছরের গোঁড়ামি কুসংস্কার ও কূপমণ্ডকত ইতিহাসে ইসলামই পরমত ও পরধর্মসহিষ্ণুতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে স্বীকৃতি দিয়েছে। মহানবীর নির্দেশিত ও খেলাফতে রাশেদীন

কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়িত রাজনৈতিক সামাজিক ও আর্থবৈষয়িক ব্যবস্থায় ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিমালায় সকল সম্প্রদায় বা ধর্মাবলম্বী লোকদের সহ-অবস্থান নিশ্চিত করা হয়েছিল। এ ব্যাপারে পূর্বেই বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এমনকি সামাজিক বৈবাহিক ক্ষেত্রে মুসলমান ইহুদী খ্রিস্টান ও অন্যান্য লোকদের মধ্যে কোনো নিষেধ বা বিধিবিধান ইসলাম কর্তৃক আরোপিত হয়নি। এতে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম রাজনৈতিক সামাজিক আর্থবৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মধ্যে ধর্মকে টেনে আনেনি বা ধর্মের কর্তৃত্বকে স্বীকার করেনি। বরং ধর্মকে ব্যক্তিজীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার ইংগিতই প্রদান করেছে।

ধর্মনিরপেক্ষতা পবিত্র কোরআনেরই শিক্ষা। যেমন ঃ 'লা-কুম দ্বীনাকুম ওয়ালী এ-দ্বীন' ও 'লা-একরাহা ফি-দ্বীন'– অর্থাৎ 'যার ধর্ম তার তার কাছে' ও 'ধর্মের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই'। অর্থাৎ পবিত্র কোরআন ও ইসলাম রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে ধর্মকে টেনে এনে সমাজের বুকে দ্বন্দ্ববিবাদ হিংসাদ্বেষ হানাহানি অসংগতি শ্রেণীবিভেদ অবিশ্বাস অনাচার বৈষম্য ও অনৈক্য সৃষ্টি না করার আভাষ দিয়েছে। কারণ দ্বন্দ্ববিবাদহীন শ্রেণীহীন শোষণহীন ধর্মনিরপেক্ষতাভিত্তিক সমাজের অপর নাম হলো শান্তির সমাজ। তাই ইসলামের অপর নামও হলো 'শান্তি'। এ শান্তি সমাজের সকল মানুষের জন্যে। এ কারণেই মহাসাম্যবাদী সাধক চণ্ডীদাস গেয়েছেন ঃ

'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।'

এ প্রেক্ষিতে বলতে হয়, ধর্মের চেয়ে মানুষের মূল্য অনেক বেশি। ধর্ম হলো মনুষ্যজীবনের নানান কর্মযজ্ঞের মধ্যে একটি ঐচ্ছিক বিষয়, বাধ্যতামূলক নয়। মানুষকে ধর্ম পালন করতেই হবে বা ধর্ম পালন করার জন্যেই মানুষ পৃথিবীতে এসেছে বা ধর্ম পালনের জন্যে মানুষ কারো কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এর সমর্থনের পেছনে কোনো যুক্তি নেই। মানুষেরই মধ্যকার একশ্রেণীর মানুষ তাদের ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে ধর্মের প্রচলন ঘটিয়েছে। সুতরাং ধর্ম কোনো প্রেরিত বিষয় বা মানুষের জন্যে আবশ্যকীয়– এটা সত্য নয়। এ ব্যতীত নানান ধর্মের নানান মত ও পথপার্থক্যের কারণে কোনো ধর্মই চিরস্থায়ী হয়নি বা ব্যাপক মানবগোষ্ঠী তা মেনেও নেয়নি। এ ব্যতীত ধর্মভিত্তিক জাতি ও রাষ্ট্রভিত্তিক জাতি ও রাষ্ট্র আজও পর্যন্ত বিশ্বের কোথাও স্থায়ী হয়নি। হতে পারে না ধর্মেরই ফলশ্রুতিতে। এ বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে ধর্ম এমন কিছু পথনির্দেশ ও নীতিবাক্য প্রদান করে থাকে যা শুনতে খুবই মধুর লাগে, কিন্তু বাস্তব কার্যক্রম, সময়ের

গতিপথে স্বাভাবিক সামাজিক প্রেক্ষাপটে সমাজের বাস্তব প্রয়োজনে সার্বিক কল্যাণ ও সমৃদ্ধির বৈপ্লবিক বিবর্তনের কর্মযজ্ঞে ধর্মের এসব পথনির্দেশ ও নীতিবাক্য পরিণামে শোষণ অত্যাচার অসংগতি ও হানাহানির বেদবাক্যে পরিণত হয়ে পড়ে এবং ধর্ম সার্বিকভাবে শোষকগোষ্ঠী বা প্রতিক্রিয়াশীল শাসক ও সমাজপতিদের স্বার্থোদ্ধারে কার্যকরী ও শক্তিশালী হাতিয়ারে পরিণত হয়ে পড়ে।

তাই বর্তমান শ্রেণীবিভক্ত শোষণভিত্তিক সমাজে ধর্মকে সামনে রেখে, ধর্মের ওপর নির্ভর করে সমাজের ব্যাপক শোষিত অত্যাচারিত অজ্ঞ দুর্বল কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানবগোষ্ঠীর সার্বিক মুক্তি কল্যাণ ও সমৃদ্ধি সফল হতে পারে না। কেবলমাত্র ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শই ব্যাপক মানুষের মুক্তিসংগ্রাম ও সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার বিপ্লব ত্বরান্বিত ও সুসংহত হতে পারে। এর প্রমাণ মহানবীর বিপ্লবোত্তর সাম্যবাদী সমাজ ও খেলাফতে রাশেদীনের সাম্যবাদী সমাজ। সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, ভিয়েতনাম, উত্তর কোরিয়া, কিউবা, পূর্ব ইউরোপীয় ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক প্রগতিশীল রাষ্ট্রের সমাজব্যবস্থা ঐ চিন্তাধারার প্রমাণ বহন করছে। আর আমাদের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শনও ধর্মনিরপেক্ষতারই ফলশ্রুতি।

সুতরাং ধর্মকে ভিত্তি করে নয়, ধর্মকে ব্যক্তিমানুষের ইচ্ছের ওপর ছেড়ে দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে পাথেয় করে সকল মানুষের ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বকে সংহত করা সাম্যবাদী সমাজ বিপ্লবের পূর্বশর্ত। কারণ সমাজে প্রচলিত ধর্মগুলোর মধ্যে নানান মতপার্থক্য বিরাজমান। কোন ধর্ম সত্য– কোন ধর্ম সঠিক তা নির্ণয় করা অসম্ভব। প্রতিটি ধর্মই শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। প্রতিটিই সঠিকত্বের দাবিদার। ধর্মের নানান মতপার্থক্যকে কেন্দ্র করে মানবসমাজে সাম্প্রদায়িক শ্রেণীসত্তার সূত্রপাত ঘটেছে। অথচ আল্লাহর বিধানেই মানুষের কোনো শ্রেণী নেই। কোনো সাম্প্রদায়িক পরিচয় নেই। সুতরাং মানবসমাজের মধ্যে শ্রেণীনির্মাণ বা সাম্প্রদায়িক শ্রেণীসত্তা সৃষ্টির কোনো ধর্ম আল্লাহ প্রেরিত, এ কথা মেনে নেয়া যায় না। আদিম সমাজের অজ্ঞতা, অসহায়তা, ভয়ভীতি, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, নৈসর্গিক বিস্ময়, বিহ্বলতা, মৃত্যু, দুঃখ, দুর্দশা, চন্দ্র, সূর্য, আগ্নেয়গিরি, ভূমিকম্প ইত্যাদির পশ্চাতে এক আদি অতিপ্রাকৃতিক শক্তির নিয়ন্ত্রণ ও অস্তিত্বের প্রশ্ন থেকেই মানুষের মনে আল্লাহ বা ঈশ্বরের অবস্থান এবং পরবর্তীকালে মানুষের অজ্ঞতা ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এবং তাদেরকে শোষণ প্রতারণা বঞ্চনা করে নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে সেই আল্লাহ বা ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে একটি অতি ক্ষুদ্র ধুরন্ধর বিজ্ঞশ্রেণী নানান ধর্মীয় বিধিবিধানের সূত্রপাত

ঘটিয়েছে। আর সত্যই যদি আল্লাহ ধর্ম পাঠিয়ে থাকেন তাহলে এতোগুলো কেনো? তাই ধর্মগুলো আল্লাহপ্রেরিত বা এর মধ্যে কোনো একটি বিশেষ ধর্ম তাঁর কাছে আদরণীয়, এ যুক্তিকে মেনে নেয়া যায় না।

এ ব্যতীত ইসলামী ধর্ম পৃথিবীতে এক লক্ষ/দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী-পীর-পয়গম্বর আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত হয়েছেন বলে মতপ্রকাশ করেছেন। পবিত্র কোরআনে মাত্র ২৬ জন নবীর নাম পাওয়া যায়। তাহলে নবীদের সংখ্যাই বা কত? নবীদের সংজ্ঞা যদি মানুষের হেদায়েতকারী, এ অর্থে ধরে নেয়া হয় তাহলে যিনি যেভাবেই হোক, বিজ্ঞানী দার্শনিক সাহিত্যিক কবি সাংবাদিক চিকিৎসক আইনজ্ঞ রাজনীতিবিদ প্রমুখ বিশিষ্ট মানবপ্রেমিক হেদায়েতকারী... ধর্মমতে এঁরা কী পদবীতে ভূষিত হবেন? যেমন সক্রেটিস, প্লেটো, এ্যারিস্টটল, হেগেল, গার্নার, ডুরিন, কনফুসিয়াস, শ্রীকৃষ্ণ, গুরু নানক, চৈতন্যদেব, চণ্ডীদাস, অশোক, মহাবীর, আলগাজ্জালী, ইবনে সিনা, ইবনে রুশদ, ইবনে খালদুন, ওমর খৈয়াম, মার্কোনী, আলবেরুনি, নিউটন, মর্গান, কার্ল মার্কস, এঙ্গেলস, ডারউইন, আইনস্টাইন, আব্রাহাম লিংকন, ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন, মাওসেতুং, হোচিমিন, মহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু, নাসের, টিটো, সুকর্ণ, বাট্রান্ড রাসেল, গোর্কি, রুশো, বার্নাডশ, পুশকিন, আন্দ্রে মালরোঁ, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুভাষ বসু, ক্ষুদিরাম, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, ফজলুল হক, চিত্তরঞ্জন, শেখ মুজিব, মার্টিন লুথার কিং, চার্চিল, আর্নেস্ট চেগুয়েভারা, ফিদেল ক্যাস্ট্রো, জর্জ ওয়াশিংটন, কিমইলসুং প্রমুখ মানবব্যক্তিত্ব কী হিসেবে চিহ্নিত হবেন? এক লক্ষ বা দুই লক্ষ চব্বিশ হাজারের মধ্যে তাঁরা পড়েন কি? না হলে কারা পড়েন? ধর্মের দিক থেকে মানবহেদায়েতকারী হিসেবে আমরা যাঁদের নাম জানি, তাদের থেকে ঐসব মহামানবদের অবদান কোন অংশে কম? তাই এঁদের কাউকে কি আমরা নবীদের কাতারে ফেলতে পারি না? অন্যদেরকে পীর-পয়গম্বরদের সারিতে ফেলতে কি পারি না? তাছাড়া অনেক পীরের সাক্ষাৎ আমরা পাই, তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে কমবেশি আমরা ওয়াকিবহাল। তাদের যে মর্যাদা দেয়া হয়ে থাকে, তাদের কাজকর্মকে মেথরদের কাজকর্মের সাথে তুলনা করে মেথরদের কি মর্যাদা দেয়া যায় না? মোটকথা মানুষের মঙ্গলের জন্যে কী করা হচ্ছে– এটাই যদি সত্য হয়, তাহলে একজন পীর ও একজন মেথরের কাজের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি? বরঞ্চ মেথরের কাজটি জনগুরুত্বের দৃষ্টিতে খুবই প্রয়োজনীয় ও জরুরি। যাহোক, আমরা আলোচনার বিষয়বস্তুর দিকে আবার ফিরে যাই।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনের বাণীর উল্লেখ করতে হয়। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, 'কোন ধর্ম সঠিক, কোন ধর্ম বেঠিক– তা নির্ণয়ের ভার একমাত্র আল্লাহর ওপর' এবং 'খ্রিস্টান, ইহুদি, মুসলমান, সেবিয়ানস, মেজিয়ানস, পলিথ্যিস্ট, স্ক্রীপচার্স এবং অন্য যে কেউই হোন, যিনি এক আল্লাহ এবং শেষ বিচারের দিনে বিশ্বাস রাখেন এবং সৎপথে চলেন, তার কোনো ভয় নেই, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে পুরস্কৃত করবেন।' সুতরাং ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি, বড়াই, মাঠ সরগরম করা বা ধর্মকে চাপিয়ে দেয়া বা বিশেষ কোনো ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা বা শ্রেষ্ঠ বলে জাহির করা বা সামাজিক-রাজনৈতিক কার্যক্রমকে ধর্মের নামে পরিচালনা করা বা ধর্মকে আবশ্যকীয় পালনীয় কর্তব্য বলে মনে করার পেছনে কোনো যুক্তি আছে কি? তাই বিশেষ কোনো ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে পক্ষপাতিত্ব করে বা ধর্মকে কেন্দ্র করে মানবসমাজে শ্রেণীবিভক্তি ঘটানো বা সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করার অর্থই আল্লাহ ও পবিত্র কোরআনের অবমাননা করার সামিল বলে আমাদের মনে হয়। সাম্যবাদ এ কারণেই সমাজে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি মেনে চলতে চায়। তাই ধর্মকে সমাজ দেহ থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে নয়। ধর্মহীনতার পক্ষে কোনো পদক্ষেপও নিতে চায় না। ধর্মকে নিয়ে প্রচারণা সমালোচনা বা খর্ব করার কার্যক্রমে সময় নষ্ট না করে কিভাবে মানবসমাজের কল্যাণসাধন করা যায়– সেই বাস্তব কার্যক্রমকে নিয়েই এগিয়ে যেতে চায়। ধর্মের জায়গায় ধর্ম, কাজের জায়গায় কাজ। অর্থাৎ যে-কোনো ব্যক্তি তার ইচ্ছেমাফিক নিজ ধর্ম পালন করতে পারবে। কেউ তাকে যেমন এ ব্যাপারে বাধা দেবে না, তেমনি সেও অন্যকে বাধা দেবে না। অর্থাৎ ধর্ম থাকবে প্রত্যেকের নিজস্ব জীবনের গণ্ডির ভেতর।

বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাই ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে তাঁর গৃহীত চারটি রাষ্ট্রীয় মূলনীতিমালার মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতাকে গ্রহণ করে একটি সত্যিকার গণতান্ত্রিক সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার দিকদর্শন প্রদান করেছিলেন।

শ্রেণীসংগ্রাম

"বিশ্ব আজ দুইভাগে বিভক্ত। শোষক ও শোষিত।
আমি শোষিত মানুষের পক্ষে।" – বঙ্গবন্ধু

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, বঙ্গবন্ধু এ উক্তির মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে শ্রেণীসংগ্রামেরই ইংগিত দিয়েছেন। শোষক সমাজে শোষিত মানুষকে চিহ্নিত করে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা, তাদের রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করা, শোষণপ্রক্রিয়া বা শোষণযন্ত্রকে ও এর ধারক-বাহক-প্রবক্তাদের চিহ্নিত করা এবং শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার কার্যকরী রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে ঐক্যবদ্ধ শোষিত মানুষজনকে নিয়ে তাদের কল্যাণ ভাগ্যোন্নয়ন ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের মধ্যদিয়ে শোষকসমাজকে উৎখাত করাই হলো মোটামুটি শ্রেণীসংগ্রামের লক্ষ্য। অর্থাৎ শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে শোষিতশ্রেণীর সংগ্রামই হলো শ্রেণীসংগ্রাম। এ প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু বাঙালি সমাজের শোষক-শোষিতকে, তাদের শ্রেণীদ্বন্দ্বকে চিহ্নিত করে শ্রেণীসংগ্রামের আওতায় তাঁর রাজনৈতিক আর্থসামাজিক ও প্রশাসনিক দিকদর্শন বা কর্মসূচি প্রদান করেছিলেন, 'বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক-আওয়ামী লীগ' বা বাকশাল-এর মাধ্যমে। বাকশাল জাতীয় দলকে কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের–তথা শোষিত মানুষের সমষ্টিগত 'গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব' শাসন ও একটি শোষণহীন সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার বৈপ্লবিক প্লাটফরম হিসেবে দাঁড় করিয়ে, তথা শোষিত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে শোষকসমাজের বিরুদ্ধে শ্রেণীসংগ্রামের সূত্রপাত ঘটাতে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর শ্রেণীসংগ্রাম রক্তপাত হিংসা জবরদস্তি সন্ত্রাস বা গৃহযুদ্ধের নীতিতে পরিচালিত হয়নি, গণতান্ত্রিক উপায়ে শান্তিপূর্ণ পথে শোষকশ্রেণী ও তাদের সমাজব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে শোষণহীন সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করাই ছিল বঙ্গবন্ধুর একমাত্র লক্ষ্য। গলাকাটার শ্রেণীসংগ্রামে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। এ কারণেই আমরা দেখতে পাই শোষিতের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যাত্রাপথে বা বাকশাল রাজনৈতিক ব্যবস্থার যাত্রাপথে কোনো প্রকার হিংসা জবরদস্তি সন্ত্রাস অত্যাচার ভীতি... কোনো কিছুই প্রদর্শন করেননি। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মতামত নিয়ে– শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পথে যাত্রা শুরু করেছিলেন। কিন্তু শোষকসমাজের ধারক-বাহক ও প্রতিনিধিরা তাদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করার লক্ষ্যে তাদের গুরু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সমর্থন দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সুপরিকল্পিতভাবে নস্যাৎ

করে শোষণ ও স্বৈরতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছে, তারা সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলছে, আর ব্যাপক শোষিত মানুষ সর্বহারায় পরিণত হচ্ছে। সমাজের বুকে শ্রেণীদ্বন্দ্বের পরিবেশকে এভাবেই শোষকসমাজ তাদের অজান্তে উত্তপ্ত করে দিচ্ছে। যে শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক বিপ্লব বঙ্গবন্ধু সূচনা করেছিলেন– সেই বিপ্লবকে শোষকসমাজ সহিংস রক্তপাত ও গৃহযুদ্ধের দিকে নিজেদের অজ্ঞাতেই ঠেলে দিচ্ছে। ব্যক্তিস্বার্থ ব্যক্তিসম্পদের উদগ্র লোভ-লালসার মোহে অন্ধ হয়ে শোষক সমাজ তথাকথিত মুক্তসমাজের কার্যক্রমে লিপ্ত হয়ে নিজেরাই যে নিজেদের নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে চলেছে তা নিজেরাই জানে না। এখন তারা ব্যাপক মানুষের জীবনের নিরাপত্তাকে কেড়ে নিচ্ছে, অথচ তাদের নিরাপত্তাও যে তাদের কার্যক্রমের মাধ্যমেই ভেস্তে যাবে– এমনতর ভাবনাও তাদের মধ্যে নেই। শুধু চাই সুখ, চাই শান্তি, চাই ধন, চাই সম্পদ, চাই প্রভাব-প্রতিপত্তি, সে যে করেই হোক, সাধারণ মানুষের রক্ত শোষণ করে হলেও চাই ঐসব। কিন্তু তাদেরও যে রক্ত শোষিত হতে পারে, এ চিন্তা ঘূর্ণাক্ষরেও তারা করে না।

এ কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জন এফ. কেনেডি তাঁর দেশের ধনিক-শোষকদের প্রতি আভাষে বলেছিলেন, 'If a free society can't help the poor who are many, it can't save the rich who are few.' এই তাৎপর্যপূর্ণ উক্তির জন্যেই হয়তো বা মার্কিন জনগণের প্রিয় প্রেসিডেন্ট জন কেনেডিকে খুনীর বুলেটে প্রাণ দিতে হয়েছিল। সারা বিশ্বের সুসভ্য ও আইনের শাসনের দাবিদার মার্কিন শাসকগোষ্ঠী আজো কেনেডি হত্যার কারণ ও বিচারকার্য অনুসন্ধান ও সমাপ্ত করতে সক্ষম হননি।

সুতরাং আমাদের দেশের শোষক-প্রতিক্রিয়াশীলচক্র যেভাবে ধরাকে সরাজ্ঞান করে সমাজের মানবিক মূল্যবোধ-নৈতিকতাবোধ বিসর্জন দিয়ে দেশের বুকে সীমাহীন শোষণকার্য ও স্বৈরশাসনের যাঁতাকলে সাধারণ মানুষকে পিষে চলেছে, তাতে সন্দেহ নেই, তারা শ্রেণীসংগ্রামের বঙ্গবন্ধুর শান্তিপূর্ণ ধারাকে হিংসা রক্তপাত গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়ে নিজেদের কবর নিজেরাই খুঁড়ে চলেছে। শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের পুরস্কার বঙ্গবন্ধুকে শোষক প্রতিক্রিয়াশীলচক্র প্রদান করেছে রক্তপাত ও হিংসাত্মক উপায়ে, সেদিন আর দূরে নয়, রক্তাক্ত পথেই শোষক-প্রতিক্রিয়াশীলচক্রকে বাংলার মাটি থেকে বিদায় নিতে হবে শোষিতমানুষের শ্রেণীসংগ্রামের অনিবার্য নিষ্ঠুর নীতিমালায়। কারণ বাংলাদেশের কোনো মানুষের হৃদয় আকাশের মতো উদার নয়, যা ছিল একমাত্র বঙ্গবন্ধুর। সেই উদার হৃদয়ের বঙ্গবন্ধুকে তারা হত্যা করেছে, তাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছে। সুতরাং ক্ষমা করার আর কেউ রইলো না। স্বাধীনতাবিরোধী ও শোষণচক্রকে বঙ্গবন্ধু ক্ষমা করে দিয়ে

তাদেরকে সমমর্যাদায় সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সকলকে নিয়েই তিনি 'সোনার বাংলা' প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। সেই ক্ষমা ও উদারতার পুরস্কার বঙ্গবন্ধু পেয়েছেন মর্মান্তিকভাবে নিহত হয়ে। সুতরাং শ্রেণীদ্বন্দ্ব চলছে, শ্রেণীসংগ্রাম হবে, তবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে নয়, সহিংস ও রক্তাক্তপথে। আর এজন্যে দায়ী হবে শোষক-প্রতিক্রিয়াশীলচক্র। তাদের তাই চরম মূল্য দিতে হবেই।

সুতরাং শ্রেণীসংগ্রাম যখন বাস্তবসত্য, তখন আমাদের জানা দরকার শ্রেণীসংগ্রাম কী। এর উৎপত্তি, গতিপ্রকৃতি, লক্ষ্য এবং প্রতিফলন কীভাবে সমাজের বুকে প্রতিফলিত হয়ে থাকে, তদ্বিষয়ে এখন সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

আমরা আমাদের আলোচনার পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে মানবসমাজের বুকে প্রধানত দুটি শ্রেণীকে দেখতে পেয়েছি। শোষক ও শোষিত। তাছাড়া আমাদের চারপাশে একটু লক্ষ্য করলেই আমরা দেখতে পাই যে, সমাজে মূলত দুটি শ্রেণীরই অবস্থান রয়েছে। সাধারণত বৃহৎ ধনিক-উঠতি ধনিক একদিকে, অন্যদিকে রয়েছে দরিদ্র মেহনতি শ্রেণী। এদের নিয়েই আমাদের সমাজ। প্রকৃতপক্ষে এ দুটি শ্রেণীই হলো শোষক ও শোষিত শ্রেণী। একশ্রেণীকে দেখতে পাই, যারা উৎপাদনকার্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শ্রমবিনিয়োগ ব্যতিরেকেই সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলছে এবং পরম সুখ-শান্তিতে জীবনযাপন করছে– যারা অন্ন বস্ত্র আশ্রয় শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যাপারে কোনোই সমস্যার সম্মুখীন নয়। এই পরশ্রম ভক্ষণকারী বা পরজীবীদের বলা হয় শোষক-ধনিক বা বিত্তশালী। এরাই যাবতীয় উৎপাদনোপকরণের মালিক এবং উৎপাদন সামগ্রী তথা উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা মালিকানাস্বত্বের অধিকারে এরাই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। শ্রমিকদের শ্রম শোষণ ও অপহরণ করেই এরা সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে, সমাজের বুকে প্রভাব-প্রতিপত্তি-শাসন চালিয়ে যায়।

অপর শ্রেণী যারা সমাজের বৃহত্তম সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ– অর্থাৎ শ্রমজীবী মেহনতি মানবগোষ্ঠী, যারা উৎপাদনের উপকরণ তথা জায়গা-জমি, কলকারখানা, শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক নয়, উৎপাদিত দ্রব্যের মালিক নয়; 'শ্রম' নামক উপকরণের মালিক। কিন্তু বিনিয়োজিত শ্রমের মালিকানাস্বত্ব তাদের অধিকারে থাকে না, উৎপাদনের উপকরণের মালিকদের মালিকানায় সেই শ্রম চলে যায়। শ্রমিকশ্রেণী দিবারাত্রি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বা রক্ত জল করে যে সম্পদসামগ্রী উৎপাদন করে থাকে, সেই সম্পদসামগ্রীর মালিক তো তারা নয়ই, উপরন্তু বিনিয়োজিত শ্রমের

বিনিময়ে তারা যে পারিশ্রমিক পেয়ে থাকে, তার পরিমাণ খুবই নগণ্য। তাই বলতে হয়, উৎপাদিত সম্পদসামগ্রীর ন্যায্য হিস্যা থেকে এরা হয় বঞ্চিত। এরা প্রয়োজনীয় অন্ন বস্ত্র আশ্রয় শিক্ষা ও চিকিৎসার ন্যূনতম নিশ্চয়তা বিধানে অক্ষম হয়ে সমাজের বুকে মানবেতর জীবনযাপন করে থাকে। অপরদিকে মালিকশ্রেণী তাদের বিনিয়োজিত শ্রমে উৎপাদিত সম্পদের প্রায় সবটুকুই ভোগ করে থাকে। অর্থাৎ শ্রমিকের শ্রমের পরিমাণে যৎসামান্য পারিশ্রমিক প্রদান করার পর বাকি শ্রমের যে বিরাট অংশ থাকে, তা মালিকশ্রেণী শোষণ ও অপহরণ করে সেই শ্রমের ফসল দিয়ে তাদের ভাগ্যের সমৃদ্ধি গড়ে থাকে। এ ব্যতীত শ্রমিকদের শ্রমবিনিয়োগেরও কোনো স্বাধীনতা নেই। নিশ্চিত ক্ষেত্রও নেই। কারণ শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যানুপাতে শ্রমবিনিয়োগের ক্ষেত্র বা স্থান খুবই সীমিত। ফলে ধনিকশ্রেণীর অবিচার শোষণ অত্যাচার উৎপীড়ন লাঞ্ছনা ও প্রবঞ্চনা তাদের নীরবে সহ্য করতে হয় বেকারত্ব অভাব দরিদ্র্যতার কারণে। এ কারণেই ধনিক-মালিকশ্রেণী তাদের ইচ্ছানুযায়ী নামমাত্র পারিশ্রমিকে শ্রমিকদের শ্রম ক্রয় করে থাকে এবং ইচ্ছানুযায়ী নিয়োগ ও ছাঁটাই করে থাকে।

এ ব্যতীত সমাজে আরো কতিপয় ক্ষুদ্র শ্রেণীকেও আমরা দেখতে পাই। এরা হলো শোষক-ধনিকসমাজের মধ্যে অবস্থানকারী শোষকসমাজের ধারায় বিশ্বাসী রাজনৈতিক দালালগোষ্ঠী, আর আছে এই সমাজ থেকে আগত রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে অধিষ্ঠিত শাসকগোষ্ঠী তথা উচ্চতর স্তরের সামরিক-বেসামরিক আমলা এবং একই সমাজব্যবস্থায় বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবীশ্রেণী। এই শ্রেণীসমূহ মূলত শোষকদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অর্থে চলে। এরা শিক্ষিতশ্রেণী। জাতীয় উৎপাদনে এরাও শোষক ধনিকদের মতোই কোনো শ্রম প্রদান করে না। এরাও শোষকসমাজ থেকে আগত একটি সুবিধাবাদী শ্রেণী। এদেরকে বলা হয় সম্পদের উপস্বত্বভোগীগোষ্ঠী। এ ব্যতীত এই শ্রেণীই আবার শোষিতশ্রেণীকে রাজনৈতিকভাবে নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। শোষিত শ্রমিকশ্রেণীর উচ্চস্তরের নেতৃত্ব প্রদানকারীরা প্রকৃতপক্ষে কোনো শ্রমিক নয়। শ্রমিকশ্রেণীর শোষণমুক্তি ও ভাগ্যোন্নয়নের জন্যে দিনের বেলায় জান কোরবানী করার কথার মালায় লিপ্ত থাকলেও এরা রাতের বেলায় ধনিক-শোষক-মালিকদের আলো ঝলমলে বালাখানায় গিয়ে ক্লান্তি মোচন করে থাকে। শোষক-শোষিতদের মধ্যকার এই বার্গেনিং এজেন্টরা মূলত শোষকদের পক্ষেই তাদের কার্যক্রম চালিয়ে থাকে। এভাবেই তারা ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধার করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এরা শোষকশ্রেণী কর্তৃক নিয়োজিত শ্রেণী– মিনি শোষক। সুতরাং এতো সব কিছুর পরও সমাজে মোটামুটি দুটি শ্রেণীই অবস্থান করছে, শোষক ও শোষিত।

একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশের সমাজ ব্যতীত পৃথিবীতে যে সমাজ প্রচলিত আছে তাহলো শোষকদের সমাজ। এ সমাজ ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী সমাজ। এই সমাজের মুষ্টিমেয় ধনিকগোষ্ঠী ছলেকলেকৌশলে বৃহত্তম সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী মেহনতি মানবগোষ্ঠীকে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন, অমানবিক শোষণ ও প্রতারণার জালে আবদ্ধ করে ফেলেছে। এ সমাজে শ্রমজীবী মানুষ বিভিন্ন কলকারখানা, শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং কৃষিক্ষেত্রখামার ও অন্যান্য নানান ক্ষেত্রে কঠোর শ্রম প্রদান করছে। কিন্তু শ্রমের উপযুক্ত স্বীকৃতি বা পারিশ্রমিক বা উৎপাদিত সম্পদের ন্যায্য অংশের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কেননা, উৎপাদনের উপকরণ বা ক্ষেত্রসমূহের মালিক তারা নয়। ফলে মালিকানাস্বত্ববিহীন এ শ্রেণীর মানবগোষ্ঠী শ্রম প্রদান করেও তাদের ন্যূনতম মৌলিক মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে ধুকে ধুকে মরছে। মনীষী কার্ল মার্কস এ শ্রেণীকেই 'সর্বহারাশ্রেণী' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এদের শ্রম শোষণ করেই ধনিক-মালিকদের ভাগ্যের সমৃদ্ধি গড়ে উঠেছে। শ্রমিকশ্রেণীর মালিকানাস্বত্বের অধিকার আছে শুধু তাদের শ্রমের ওপর, কিন্তু শ্রম প্রয়োগের স্বাধীনতা নেই। তাই বলা যায়, উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের মতো শ্রমও একটি উপকরণ, এই উপকরণের নিয়ন্ত্রক বা মালিকও প্রকৃতপক্ষে ধনিক-মালিকগোষ্ঠী।

সুতরাং 'মালিকানাস্বত্ব'ই এখানে মুখ্যভূমিকা পালন করে চলেছে। এই যে মালিকানার স্বত্বাধিকার, এটাই আইনসিদ্ধ হয়ে পড়েছে ধর্মীয় বিধিবিধান ও রাষ্ট্রীয় নিয়ম-কানুনের বেড়াজালে। এবং শোষকসমাজের এই মালিকানাস্বত্ব সংহত ও সংরক্ষণ– যাবতীয় শাসন-শোষণ-অত্যাচার-অবিচার-অসংগতি– প্রভাব প্রতিপত্তিকে অক্ষুণ্ন ও প্রবহমান এবং কার্যকরী করার জন্যে– শোষকদের নিরাপত্তা সংরক্ষণ ও শ্রমজীবী শোষিত মানুষকে দাবিয়ে রাখার জন্যে তথাকথিত সামাজিক শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যে– স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার নামে পুলিশ ও সেনাবাহিনীসহ নানান নিরাপত্তা বাহিনীর ছত্রছায়ায় প্রকারান্তরে শোষকসমাজের ভাড়াটিয়া ঠাঙ্গাড়ে বাহিনী পোষা হচ্ছে। জাতীয় উৎপাদনে এসব বিরাট বাহিনীর সদস্যরা কোনোই শ্রম দিচ্ছে না। এদেরকে পোষা হচ্ছে শোষকদের স্বার্থে– শ্রমজীবী মেহনতি সর্বহারা মানুষের খাজনা ও ট্যাক্সের অর্থে। এ ব্যতীত প্রশাসনের নামে নানান অনুৎপাদনশীল বিভাগের সৃষ্টি করা হয়েছে বা হচ্ছে– তাও পোষা হচ্ছে দরিদ্র মানুষের টাকায়। এসবই করা হয়েছে রাষ্ট্র ও সভ্যতার নামে, তথাকথিত আইনের চোখে সাম্যতার নামে, সুবিচারের নামে। প্রকৃতপক্ষে এসবকিছু করা হয়েছে শোষকদের স্বার্থে। শোষিত মানুষ যাতে তাদের কৌশল বুঝতে না পারে, তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করতে না পারে, সেই জন্যেই ঐসব দার্শনিক ক্ষেত্রসমূহ সৃষ্টি করা

হয়েছে এবং নানান নীতিকথার ছদ্মাবরণে এসবগুলো মণ্ডিত করা হয়েছে। আদিম সমাজে তথাকথিত ধর্ম ছিল না, শ্রেণী ছিল না, সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার ধ্বংসস্তূপের ওপরই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রভিত্তিক আইনকানুনভিত্তিক শোষকসমাজ– মানবসভ্যতার ইতিহাসে।

তবে শোষক সমাজের কার্যক্রম সকল সময়ে এক প্রকার ছিল না। সমাজের ক্রমবিকাশের এক-এক স্তরে, উৎপাদনপ্রণালীর ক্রমবিকাশের এক এক পর্যায়ে তার রূপ ও বহিঃপ্রকাশ এক-এক রকম হয়েছে। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, মানবসমাজের আদিতে যে সমাজ ছিল, তা ছিল সাম্যবাদী সমাজ। অর্থাৎ শ্রেণীহীন স্তরহীন ধর্মহীন শোষণহীন রাষ্ট্রহীন সমাজ ব্যবস্থা। এর কারণও সুস্পষ্ট। আর তাহলো, সে-সমাজে প্রাকৃতিক ও অন্যান্য বাস্তব অবস্থার কারণেই ব্যক্তিচিন্তা ব্যক্তিসত্তা ব্যক্তিস্বার্থ ব্যক্তিসম্পদ ও ব্যক্তিস্বাধীনতার কোনোই পরিবেশ ছিল না। একমাত্র শিকার করেই সেই মানবগোষ্ঠী তাদের খাদ্যসামগ্রী জোগাড় করতো। এ ব্যতীত গাছের ফলমূল-পাতা দিয়েও তারা তাদের খাদ্যসামগ্রীর প্রয়োজন মেটাতো। এসবের বাইরে উৎপাদনব্যবস্থার আর কোনো ক্ষেত্র তাদের জানা ছিল না। খাদ্যসামগ্রীর অপ্রতুলতার কারণে, প্রাকৃতিক নানান প্রতিকূল অবস্থার প্রেক্ষিতে, হিংস্র জীবজন্তুর আক্রমণ ও অন্যান্য প্রতিপক্ষের আক্রমণের কবল থেকে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রয়োজনে তারা বিভিন্ন সহজলব্ধ শিকার ক্ষেত্র ও নিরাপদ স্থানে তথা বিভিন্ন বনজঙ্গলের বৃক্ষের উচ্চ শাখা ও পাহাড়-পর্বতের গুহার মধ্যে রাত্রিযাপন করতো এবং একসঙ্গে দলবদ্ধভাবে চলাফেরা ও বসবাস করতো। গাছের ফলমূল-পাতা তো ছিলই, এ ব্যতীত সাধারণ হাতিয়ার বা গাছের ডাল দিয়ে তৈরি লাঠি এবং পাথরের টুকরো দিয়ে নানান দুর্বল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন্যপশুপক্ষী, মাছ ও সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীকে শিকার করে সকলে মিলেমিশে উদরপূর্তি করতো। শিশুসহ বিভিন্ন কর্ম-অক্ষম ব্যক্তিদের তাই বলে অবহেলা করা হতো না।

তবে প্রয়োজনের তুলনায় খাদ্যসামগ্রীর পরিমাণ ছিল খুবই নগণ্য। তাই বাড়তি বা উদ্বৃত্ত সম্পদ বলতে কিছুই ছিল না। যা কিছু নগণ্য হাতিয়ার, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও অন্যান্য সীমিত দ্রব্যসামগ্রী বা মালামাল বা সম্পদ ছিল, তা ছিল সকলের সমষ্টিগত মালিকানায়– ব্যক্তিমালিকানায় নয়। উপরোক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপটে তাদের সবকিছুই সমষ্টিগত কল্যাণের চিন্তার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। ফলে ব্যক্তিসত্তা ব্যক্তিচিন্তা ও ব্যক্তিস্বাধীনতা নিয়ে সমাজে বেঁচে থাকার কোনো পরিবেশ ছিল না। অর্থাৎ উপার্জনের সীমাবদ্ধতা ও নানান প্রাকৃতিক ও অন্যান্য প্রতিকূল অবস্থায় জীবননির্বাহের ক্ষেত্রে 'আমরা সকলে পরের তরে'– এটাই ছিল সেই সমাজের সার্বিক চিন্তাধারা ও লক্ষ্য।

কালক্রমে উৎপাদনের উপকরণ, বিশেষ করে উন্নতমানের হাতিয়ার আবিষ্কার ও কৃষিকার্যের আবির্ভাব হওয়ার ফলে সম্পদ উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে যেতে থাকে। এমনকি প্রয়োজনাতিরিক্ত বাড়তি সম্পদও সৃষ্টি হতে থাকে। এই বাড়তি সম্পদ ও অন্যান্য সম্পদসামগ্রী ব্যক্তিমালিকানায় ভোগদখলের লোভলালসার বীজ উপজাতীয় প্রধান, সমরপ্রধান ও অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মনে অঙ্কুরিত হতে থাকে। উন্নতমানের হাতিয়ার বা অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কার ও নানান কলাকৌশল অবলম্বন করে হিংস্র জীবজন্তু, বিরোধীয় উপজাতীয় লোকজন, প্রাকৃতিক আক্রমণ ও বিপর্যয়কে প্রতিহত করার পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে ব্যক্তিসত্তা ও ব্যক্তিস্বাধীনতা নিয়ে সমাজে বসবাস করার অবস্থাও এভাবে সৃষ্টি হতে থাকে। এ অবস্থায় উপজাতীয় সমষ্টিগত মালিকানাধীন সম্পদ বা বাড়তি সম্পদ অপহরণ ও লুণ্ঠন করার প্রবণতা ঐসব প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা দিতে থাকে। এবং এভাবেই সম্পদকে কেন্দ্র করে আদিম সাম্যবাদী বা উপজাতীয় সাম্যবাদী সমাজে শ্রেণীসত্তা, শোষণ, শ্রেণীবিভেদ ও ব্যক্তিসম্পদের মালিকানাভিত্তিক সমাজের সূত্রপাত ঘটে।

সমাজের শক্তিশালী বিজ্ঞ প্রভাবশালীগোষ্ঠীর মনে এ জাতীয় লোভ-লালসার উদয় হলে 'জোর যার মুল্লুক তার'– এই নীতি নিয়ে এরা কালক্রমে সমাজের যাবতীয় উৎপাদন ক্ষেত্রের মালিক হয়ে বসে। এভাবেই মানব-সমাজের বুকে শ্রেণীসমাজ সৃষ্টি হয়ে পড়ে। এই শ্রেণীসমাজই পর্যায়ক্রমে সমাজের দুর্বল অজ্ঞ শ্রমজীবী মেহনতি ব্যাপক মানবগোষ্ঠী গুটিকতক মানুষের অধীনে দাসে পরিণত হয়ে পড়ে। সমাজ তখন দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে– যথাঃ প্রভু ও দাস। উৎপাদন ক্ষেত্রের ক্রমোন্নতি এবং সমাজ বিকাশের পথ বেয়ে শুরু ভূমিদাসপ্রথা বা সামন্ততান্ত্রিক যুগ। অর্থাৎ নানান সমাজ বিবর্তনের ধারায় দাসপ্রথা ও ভূমিদাস প্রথা বর্তমানকালের পুঁজিবাদী প্রথার মজুরিপ্রথায় আবির্ভূত হয়েছে। এই যে পরিবর্তন রূপান্তর বিবর্তন– এ বিষয়ে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, উৎপাদনক্ষেত্র ও উপকরণের ক্রমোন্নতি ও প্রসারের কারণেই সমাজের অগ্রগতি সাধিত হওয়ার সাথে সাথেই আরেকটি নতুন সমাজের পত্তন হয়েছে। এই যে সমাজের বিকাশ বিবর্তন ও নতুন সমাজের উত্তরণ– এটা হয়েছে সমাজের পরস্পরবিরোধী শক্তি তথা শোষক-শোষিতের দ্বন্দ্বেরই ফলশ্রুতিতে। আর শ্রেণীবিভক্ত সমাজের উত্তরণের অর্থই সভ্যতারও বিকাশ। এটাকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

দাসপ্রথা বা সামন্ততান্ত্রিক দাসপ্রথাই মানবসমাজে শোষণের প্রথম বাস্তব প্রক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে। এ ব্যবস্থায় দাসরা ছিল সামন্তপ্রভুদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি– জমাজমি, হাতিয়ার ইত্যাদির মতই। এমনকি দাসদের সুন্দরী স্ত্রী-কন্যা প্রভৃতিও ছিল সামন্তপ্রভুদের কর্তৃত্বে। তবে নৈতিক মানদণ্ডে দাস-দাসীদের ভরণ-পোষণের দায়-দায়িত্ব সামন্তপ্রভু-মালিকরা বহন করতো। দাসরা তাদের মালিকের ইচ্ছানুযায়ী যাবতীয় কাজকর্ম সম্পন্ন করতো, মালিকের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করতো তাদের ভালো-মন্দ, এমনকি জীবনটাও।

দাস ব্যতীতও আরো কয়েকটি শ্রেণী সে-সমাজে ছিল। যেমন, উপদেষ্টা পরিষদ বা আমলা, সমরবাহিনী, কাজী, ধর্মীয় মোল্লা-পুরোহিত, কবি, গায়ক, নর্তকী, কৃষক, তথা সম্ভ্রান্ত শ্রেণী। সামন্তপ্রভুরা এদের মাধ্যমেই তাদের মালিকানাস্বত্ব বা যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করতো। এ শ্রেণীর লোকদের সামন্তপ্রভুরা তাদের বিশ্বস্ততার জন্যে অল্প পরিমাণ জমিজমা লাখেরাজ ও পুরস্কার হিসেবে প্রদান করতো। এর ফলে এই শ্রেণীর লোকেরা সামন্তপ্রভুদের মনোরঞ্জন ও খুশি করার জন্যে এমন কোনো কাজ ছিল না যা তারা করতো না। এমনকি নিজেদের সোমত্ত স্ত্রী-কন্যাদের দিয়ে প্রভুদের মনোরঞ্জন করে তাদের ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধার করতো। সে যাই হোক, সামন্ততান্ত্রিক প্রথার চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটে রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। শক্তিশালী সামন্তপ্রভুরা রাষ্ট্র বা সাম্রাজ্যের রাজা-বাদশা ও সম্রাটে রূপান্তরিত হয়ে পড়ে এবং বাকি সামন্তপ্রভুরা জমিদার ও দেওয়ান হিসেবে সামন্তবাদী রাজা বা সম্রাটদের স্থানীয় প্রতিনিধি হয়ে পড়ে। নানান বিবর্তনের পথ অতিবাহিত করেও বর্তমান সামন্তবাদী প্রথার সুস্পষ্ট রূপ আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রবহমান থাকলেও বিশ্বরাজনীতিতে সামন্ততান্ত্রিক প্রথার সার্বিক বিবর্তন ঘটেছে বর্তমান ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী প্রথার মধ্যে। সেই সাথে শোষণব্যবস্থারও বিবর্তন ঘটেছে। সামন্ততান্ত্রিক প্রথায় দাস বা ভূমিদাস শ্রমিক শোষণের যে রূপ সরাসরিভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল, সেই শোষণের গতিধারা আরো তীব্রতর হলেও ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী প্রথায় পরোক্ষভাবে বা ভদ্রভাবে প্রবাহিত হয়েছে। আমাদের দেশে সামন্ততান্ত্রিক প্রথা সরাসরিভাবে ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী প্রথায় বিবর্তিত হলেও সামন্ততান্ত্রিক প্রথার আধাসামন্তবাদী ব্যবস্থা বা জমিদারী প্রথার অবশেষ হিসেবে বর্তমানে আমাদের সমাজে বিরাজ করছে জোতদারী, বর্গাদারী ও মহাজনী প্রথা। মহাজনী প্রথা অবশ্য আজকাল ব্যবসার মধ্যে প্রবেশ করেছে।

প্রচলিত ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী সমাজে শিল্পকলকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, যোগাযোগ, ব্যাংক, বীমা, কৃষিকার্য প্রভৃতি উৎপাদন উপকরণ ও প্রক্রিয়ার মালিক হচ্ছে সমাজের মুষ্টিমেয় ধনিকশ্রেণী। শ্রমিকরা এ সমাজে ধনিকশ্রেণীর ভাড়াটিয়া মজুর বা মজুরিদাস। শ্রমিকরা এখানে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শ্রমবিনিয়োগ বা বিক্রয় করেই খালাস– যদিও তাদের শ্রমের তুলনায় পারিশ্রমিকের পরিমাণ অতি নগণ্য। তাদের শ্রমোপার্জিত সম্পদে তাদের কোনোই অধিকার নেই। আর সেই সম্পদ পণ্য হিসেবে বাজারে বিক্রি করে যে মুনাফা অর্জিত হয় তাতেও তাদের অধিকার নেই। এভাবে মালিকরা নামমাত্র পারিশ্রমিক দিয়ে একদিকে যেমন শ্রমিকদের শোষণ করছে তেমনি মুনাফার নামে ক্রেতাসাধারণকেও তারা শোষণ করছে। অর্থাৎ পরোক্ষভাবে এ প্রক্রিয়ায়ও শ্রমিকরাই শোষিত হচ্ছে। কেনোনা ঐ পণ্যের ক্রেতাসাধারণও হলো এই শ্রমিকরাই।

দাস বা ভূমিদাসশ্রমিকদের সাথে ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী প্রথার শ্রমিকদের পার্থক্য এটুকু যে শ্রমিকরা স্বাধীন। অর্থাৎ শ্রমবিনিয়োগ বা বিক্রয় তাদের ইচ্ছাধীন। কিন্তু বর্তমান শ্রমিকদের তথাকথিত স্বাধীনতা বা ইচ্ছার কোনোই মূল্য নেই। কারণ শ্রমিকসংখ্যানুপাতে শ্রমবিনিয়োগ বা শ্রমপ্রয়োগক্ষেত্রের পরিধি সীমিত। সুতরাং জীবন রক্ষার তাগিদে তাদেরকে শ্রমপ্রদান করতে হয়। এছাড়া বাঁচার কোনো উপায় নেই। বাধ্য হয়েই মালিকের দুয়ারে শ্রমিককে ধর্না দিতে হয়। এই সুযোগে মালিকরা নামমাত্র পারিশ্রমিকে শ্রমিকের শ্রম ক্রয় করে থাকে।

এ ব্যবস্থায় সমাজের মধ্যবিত্তশ্রেণী বৃহৎ ধনিকদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে না। ফলে তাদের উৎপাদনব্যবস্থা বা উপকরণগুলো অবলীলাক্রমে ধনিকদের হাতে পুঞ্জিভূত হচ্ছে। এমনিভাবে শ্রমিকদের সংখ্যা যেমন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি শ্রমিকদের পারিশ্রমিক ও শ্রমবিনিয়োগের ক্ষেত্রও কমে যাচ্ছে। এই যে ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী শোষণ, এই শোষণ সামন্তবাদী দাসপ্রথা ও ভূমিদাসপ্রথার শোষণের চাইতে অতি ভদ্রভাবে সংঘটিত হলেও তা অতি নির্মম। সামন্তবাদী প্রথায় দাসমানবগোষ্ঠীর খাওয়া-পরা-আশ্রয় ও স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা বিধানের যাবতীয় দায়দায়িত্ব ছিল সামন্তপ্রভুদের ওপর। কারণ সামন্তপ্রভুদের উৎপাদনের পুঁজি যেমন ছিল জমাজমি ও অন্যান্য হাতিয়ারসমূহ, তেমনি দাসরাও ছিল তাদের সম্পদ অর্জনের প্রধানতম হাতিয়ার বা পুঁজিসরূপ।

কিন্তু ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিকদের নিয়ে মালিকদের কোনোই ভাবনা নেই। তারা শ্রমিকদের পারিশ্রমিক দিয়েই খালাস। তাদের উৎপাদনক্ষেত্রসমূহে নিয়োজিত মজুরি শ্রমিকদের সংসার চলছে কিনা,

শ্রমিকদের অন্ন বস্ত্র আশ্রয় ও চিকিৎসার প্রয়োজন ন্যূনতমভাবে হলেও মিটছে কিনা, সেদিকে মালিকদের নজর দেবার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ তারা ভালো করেই জানে যে, কোনো একজন শ্রমিক মারা গেলে বা না থাকলে অন্য শ্রমিক পেতে তাদের বেগ পেতে হয় না। সুতরাং শ্রমিকদের জীবনমরণের ব্যাপারে মালিকদের কোনোই দায়-দায়িত্ব নেই। কাজেই শ্রম বিক্রয় করার ব্যাপারে এ সমাজে শ্রমিকরা স্বাধীন হলেও মূলত শ্রমপ্রদানের ক্ষেত্রে তাদের কোনোই স্বাধীনতা নেই। শ্রমিকদের এই যে তথাকথিত স্বাধীনতা, এ স্বাধীনতার সূত্রপাত ঘটেছে ফরাসি বিপ্লব ও ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবের ফলশ্রুতিতে।

ব্যক্তিসত্তা ব্যক্তিচিন্তা ব্যক্তিস্বার্থ ব্যক্তিস্বাধীনতা বা স্বেচ্ছাচারিতা ও ব্যক্তিসম্পদের লোভ-লালসার ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট এবং ধর্ম কর্তৃক স্বীকৃত বা অনুমোদিত মানবসমাজে শ্রেণীবিভক্ত সমাজ যেমন অনেক পুরোনো বিষয়, তেমনি এই শ্রেণীসমাজের মধ্যকার শ্রেণীসংঘাত বা শ্রেণীসংগ্রামও একটি অতি পুরোনো বিষয়। যেদিন আদিম সাম্যবাদী সমাজ ভেঙে ব্যক্তিলোভ-লালসার ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে বিভাগ সূচিত হয়েছে, সেদিন হতে শ্রেণীসংগ্রামও শুরু হয়েছে। সমাজ বিবর্তনের সাথে শ্রেণীসংগ্রামও বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। শ্রেণীসংগ্রামের গতিধারা কখনো সুপ্তভাবে অগোচরে, কখনো প্রকাশ্যভাবে পরিকল্পিত উপায়ে, কখনো সীমিতভাবে গতানুগতিকভাবে, কখনো ব্যাপক আকারে রক্তাক্ত ও প্রতিহিংসার পথ বেয়ে সমাজে চলে এসেছে প্রাগৈতিহাসিককাল থেকে। এই শ্রেণীসংগ্রাম বা শ্রেণীদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই সমাজের অগ্রগতি বিকাশ পরিবর্তন রূপান্তর ও বিবর্তন সাধিত হয়ে আসছে। মূলতঃ মানবসমাজ সভ্যতা ও ইতিহাসের অগ্রগতির মূলেই রয়েছে সমাজের দ্বন্দ্ব বা শ্রেণীসংগ্রামের কার্যক্রম।

ইতিহাসের শ্রেণীসংগ্রাম কখনো কখনো বিদ্রোহ ও রক্তাক্তপথে চলে এসেছে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের দাসবিদ্রোহের প্রমাণ ইতিহাসের পাতায় খুঁজে পাওয়া যায়। তবে দাসবিদ্রোহগুলো কোনো প্রত্যক্ষ সফলতা অর্জন করতে না পারলেও দাসপ্রথা বা সামন্ততান্ত্রিক সমাজসভ্যতার ভিত্তিমূলে বারবার আঘাত হেনেছে। ফলশ্রুতিতে অতিবিলম্বে হলেও ঐ প্রথা ক্রমান্বয়ে ভেঙে পড়েছে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের শেষ অধ্যায়ে বহু কৃষক ও দাসবিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে। পৃথিবীর বহু অঞ্চলে সামন্তরাজ ও সামন্ত প্রভুদের বিদ্রোহীদের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে বা আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে। ফরাসি বিপ্লব, ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব তথা সামন্ততান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে শিল্পপতি-বণিক তথা দাসমানবগোষ্ঠীর বিপ্লব এবং অন্যান্য অঞ্চলের সামন্তবাদের বিরুদ্ধে যে-সমস্ত বণিক তথা দাসমানবগোষ্ঠীর বিপ্লব এবং

অন্যান্য অঞ্চলের সামন্তবাদের বিরুদ্ধে যে-সমস্ত বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে তার মূলেই ছিল শ্রেণীসংগ্রাম। বাংলাদেশে ব্রিটিশ রাজত্বকালে হাজী শরীয়তউল্লাহ, দুদুমিয়া, তিতুমীর, ফকির মজনুশাহ প্রমুখ বিপ্লবীদের নেতৃত্বে যেসব সংগ্রাম ও বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল তা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, দেশীয় সামন্তপ্রভু, জমিদার জোতদারদের শাসন-শোষণ থেকে কৃষক বা কৃষক-শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির বিদ্রোহ ও সংগ্রাম। এর মূলেও কাজ করেছিল শ্রেণীসংগ্রাম। এ ব্যতীত ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতের শোষিত মানুষের স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রামও ছিল শ্রেণীসংগ্রামেরই বহিঃপ্রকাশ। এই শ্রেণীসংগ্রামকে উৎখাত করার জন্যে সুচতুর ইংরেজ এটাকে স্রেফ 'সিপাহী বিদ্রোহ' বলে চালিয়ে দিয়েছিল।

সামন্তবাদী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, সামন্তরাজ, সামন্তপ্রভু বা জমিদার ও বৃহৎ জোতদারদের শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে ভূমিদাস ও কৃষকদের বিদ্রোহের সুযোগ নিয়েছে সমাজের তদানীন্তন অবহেলিত মধ্যবিত্ত কুটির শিল্পপতি ও বণিক সম্প্রদায়। তারা ভূমিদাসশ্রমিক ও কৃষকদের সাথে একত্রিত হয়ে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের নেতৃত্ব দখল করে বসে। কারণ সামন্ততান্ত্রিক সমাজে কুটির শিল্পপতি-মালিক ও বণিক শ্রেণী নানাভাবে লাঞ্ছিত-শোষিত হয়েছিল। এ সমস্ত বিদ্রোহে কালক্রমে সামন্তবাদ বা ভূমিদাসপ্রথার বহুলাংশের উচ্ছেদ ঘটে। আর এই উচ্ছেদের মধ্য দিয়ে শিল্পপতি ও বণিকশ্রেণীর নিয়ন্ত্রিত সমাজ তথা পুঁজিবাদী বা ধনতান্ত্রিক সমাজের সূত্রপাত ঘটেছে। আর পুঁজিবাদী বা ধনতান্ত্রিক সমাজের সবচে' বড় অবদান এই যে, এ সমাজেই শ্রমিক মেহনতি মানুষের চেতনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে এবং শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের বিদ্রোহ, সংগ্রামী অভ্যুত্থান ও বিপ্লব অহরহই সংঘটিত হচ্ছে, সমাজতান্ত্রিক বা সাম্যবাদী সমাজ বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করছে।

সুতরাং এই যে একটার পর একটা সমাজ ব্যবস্থার বিবর্তন উত্থান ও উত্তরণ এবং সেই সাথে মানবজাতির অগ্রগতি বিকাশ বা ক্রমোন্নতি, এসবকিছুর মূলে রয়েছে সমাজের শ্রেণীবিভক্ত বা পরস্পরবিরোধী মানবগোষ্ঠী তথা শোষক-শোষিতের মধ্যকার বিরামহীন দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সংঘর্ষের কার্যক্রম। সুতরাং মানবজাতির সার্বিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে এই শ্রেণীসংগ্রামের মধ্যে। এ কারণেই সাম্যবাদের ধর্ম হলো শ্রেণীসংগ্রাম।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ অধ্যায়ে ফরাসি দেশে 'প্যারি কমিউন' নামীয় যে শ্রমিকরাজ অল্প কিছুদিনের জন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার মূলে ছিল সামন্তরাজ সামন্তপ্রভু তথা ধনিকদের স্বৈরতান্ত্রিক শাসন-শোষণের শৃঙ্খল থেকে মেহনতি মানুষের মুক্তির বিপ্লব। বিংশশতাব্দীর প্রথমার্ধে মনীষী কার্ল মার্কসের সাম্যবাদী দর্শনের ভিত্তিতে ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে

সোভিয়েত রাশিয়ার শ্রমজীবী মেহনতি শোষিত মানবগোষ্ঠী মহান লেনিনের নেতৃত্বে এক ঐতিহাসিক বিপ্লবে অবতীর্ণ হয়ে সামন্তবাদী পুঁজিবাদী শাসক-শোষকদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে শ্রমিকজনতার শাসন বা সর্বহারা মানবগোষ্ঠীর গণতান্ত্রিক সাম্যবাদী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছিল। পরবর্তীকালে প্রতিবিপ্লবী ফ্যাসিস্টশক্তির বিরুদ্ধে এক সর্বাত্মক জনযুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার মেহনতি মানুষের যে ঐতিহাসিক বৈপ্লবিক বিজয়, তার স্রোতধারা বিভিন্ন দেশে দেশে প্রবাহিত হয়ে সাম্যবাদী বিপ্লবের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত ও সুসংহত করেছে। সামন্তবাদ পুঁজিবাদ উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মহান জাতীয়তাবাদী সানিয়াতসেন ও পরবর্তীকালে মার্কসবাদী লেনিনবাদী মাওসেতুংয়ের মহান নেতৃত্বে চীনের শোষিত মেহনতি মানুষের যে ঐতিহাসিক বৈপ্লবিক বিজয়, তা বিশ্বের শোষিত অত্যাচারিত মেহনতি মানুষের মুক্তিসংগ্রাম ও সাম্যবাদী বিপ্লবের অনুপ্রেরণা হয়ে দেখা দিয়েছে। মহান হোচিনমিনের নেতৃত্বে ভিয়েতনাম, কিমইলসুংয়ের নেতৃত্বে উত্তর কোরিয়া, ফিদেল ক্যাস্ট্রোর নেতৃত্বে কিউবা, পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসহ বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের শোষিত-মেহনতি মানুষের যে বিজয়, তাও মুক্তিসংগ্রাম ও সাম্যবাদী বিপ্লবের ইতিহাসে প্রেরণার উৎস হয়ে রয়েছে। একইভাবে ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর সুমহান নেতৃত্বে বাঙালি শোষিত-বঞ্চিত-অত্যাচারিত মেহনতি মানবগোষ্ঠী পাকিস্তানি স্বৈরতান্ত্রিক বর্বর শাসক-শোষকদের কবল থেকে মুক্ত হয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছে।

এ ব্যতীত লিবিয়া, সিরিয়া ও ইরাকের শোষিত মেহনতি মানুষ সামন্তবাদী রাজতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদের শাসন-শোষণ থেকে মুক্তিলাভ করেছে। অতিসাম্প্রতিককালে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দোসর, ইরানের অভিশাপ সামন্তবাদী পুঁজিবাদী শাহীতন্ত্রের স্বৈরতান্ত্রিক শাসন-শোষণের কবল থেকে ইরানের মেহনতি শোষিত মানুষ বিপ্লবী আয়াতুল্লা খোমেনীর নেতৃত্বে এক ঐতিহাসিক গণবিপ্লবে জয়লাভ করেছে, মুক্ত হয়েছে সামন্তবাদ পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের শাসন-শোষণ থেকে আফগানিস্তানের মেহনতি শোষিত জনগণ, মুক্ত হয়েছে কম্বোডিয়ার শোষিত মেহনতি মানুষ। তাছাড়া এশিয়া আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে দেশে শোষিত মেহনতি মানুষের স্বাধীনতা-মুক্তি তথা সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশবাদ পুঁজিবাদ বর্ণবৈসম্যবাদের কবল থেকে মুক্তিলাভের লক্ষ্যে যে সংগ্রাম বিদ্রোহ ও বিপ্লব হয়েছে এবং হচ্ছে, একে এককথায় শ্রেণীসংগ্রাম হিসেবে আখ্যায়িত করা চলে। এ বিদ্রোহ, এ সংগ্রাম, এ আন্দোলন, এ বিপ্লব... স্বাধীনতা ও মুক্তির বিপ্লব, এসবই হচ্ছে শোষিত বঞ্চিত অত্যাচারিত নিপীড়িত শ্রমজীবী

মেহনতি মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম– একে এক কথায় শ্রেণীসংগ্রাম হিসেবে আখ্যায়িত করা চলে। এ সংগ্রাম পুঁজিবাদ, ধনতান্ত্রিক প্রথা, আধাসামন্তবাদ, উপনিবেশবাদ, বর্ণবৈষম্যবাদ, আধিপত্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। আর এ সংগ্রামের মূল লক্ষ্য মেহনতি শ্রমজীবী সর্বহারা শোষিত বঞ্চিত মানুষের সমষ্টিগত ভাগ্যোন্নয়ন-কল্যাণ-সমৃদ্ধি ও তাদের প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসন তথা একটি শোষণহীন দুর্নীতিমুক্ত সমাজ বা সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠাকরণ।

স্বাধীন বাংলাদেশে শ্রেণীসমাজ ও শ্রেণীসংগ্রাম বিদ্যমান। এখানে সাম্রাজ্যবাদের সেবাদাস রাজনৈতিক টাউট, মোল্লাতন্ত্র, উঠতি ধনিক পুঁজিপতিদের পাঁয়তারা, বিদেশী বহুজাতিক শোষণ, আমলাতান্ত্রিক কার্যক্রম, স্বাধীনতাবিরোধীচক্রের ষড়যন্ত্র ও আধাসামন্তবাদী শোষণ এবং প্রতিক্রিয়াশীল-প্রতিবিপ্লবীচক্রের অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ ইত্যাদিতে সৃষ্ট বাংলাদেশে শ্রেণীসমাজ এবং শোষিত বঞ্চিত মেহনতি শ্রমজীবী মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা– তথা শোষণমুক্তি মানবাধিকার গণতন্ত্র, শ্রেণীদ্বন্দ্বের ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট শ্রেণীসংগ্রামকে চিহ্নিত করে, ব্যাপক বাঙালির সমষ্টিগত ভাগ্যোন্নয়ন ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠার মহান লক্ষ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক-আওয়ামী লীগ' বা বাকশালের মাধ্যমে একটি বৈপ্লবিক রাজনৈতিক আর্থসামাজিক প্রশাসনিক কর্মসূচি প্রদান করেছিলেন।

স্বাধীন বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় বঙ্গবন্ধু : দেশী-বিদেশী স্বাধীনতাবিরোধীদের ষড়যন্ত্র

'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' এই ঐতিহাসিক বজ্রঘোষণার (৭ মার্চ ১৯৭১) মহানায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি পাকিস্তানের জিন্দানখানা থেকে মুক্তিলাভ করে বিজয়ী বীরের বেশে স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে প্রত্যাবর্তন করেন।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে বর্বর পাকবাহিনীর মহাবিভীষিকাময় রক্তাক্ত গণহত্যার প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু ঐ রাতে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। রেডিও ও অয়ারলেসে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার বজ্রঘোষণাটি ইথারে ইথারে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে বাংলাদেশের সর্বত্র ছাত্র শ্রমিক কৃষক আনসার পুলিশ ইপিআর ও বেঙ্গল রেজিমেন্ট সৈনিক-মুক্তিযোদ্ধারা যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বিপুলবিক্রমে স্বাধীনতা রক্ষার মহাসমরে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঐতিহাসিক ঘোষণা ঢাকাস্থ পাকবাহিনীর রেডিও-অয়ারলেসেও ধরা পড়ে। এর কিছুক্ষণের মধ্যে পাকবাহিনী বঙ্গবন্ধুকে তাঁর বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যায়। বঙ্গবন্ধুর পূর্বনির্দেশ মোতাবেক ১৯৭০-এর নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরা ও মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানকে প্রতিহত ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে সর্বাত্মক মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা ও সংগঠনের লক্ষ্যে প্রতিবেশী ভারতের মাটিতে আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকে। মানবতার খাতিরে ভারত তাদের সীমান্ত খুলে দেয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সর্বাত্মক সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে দেয়।

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল ভারতের আগরতলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করে তাঁর অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে গঠিত হয় প্রবাসী বিপ্লবী বাংলাদেশ সরকার। ১৭ এপ্রিল বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার সুবিশাল আম্রকাননকে মুজিবনগর নামকরণ করে বিপ্লবী সরকার আত্মপ্রকাশ করে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও পাকিস্তানের অখণ্ডতাকে কেন্দ্র করে সারা বিশ্ব দুটি যুধ্যমান শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের পক্ষে সর্বাত্মক সমর্থন

দান করে ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ ও বিশ্বজনমত। অপরদিকে পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, সৌদি আরবসহ অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্র ও পুঁজিবাদী বিশ্ব। অবশেষে দীর্ঘ ন'মাসব্যাপী সর্বাত্মক যুদ্ধে মুজিবনগর বিপ্লবী সরকারের নেতৃত্বে বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্রবাহিনীর যৌথকমান্ডের কাছে পাকবাহিনী ঢাকায় ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে। ৩০ লক্ষ বাঙালি ১৭ হাজার ভারতীয়দের এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয় স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতি, বাঙালি জাতির জনক, মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবন্ধু তখনও পাকিস্তানের হাতে বন্দী।

মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী বীর বাঙালির রণহুংকার, ভারত-সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বিশ্ব জনমতের চাপের মুখে পাকিস্তান সরকার ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে সসম্মানে মুক্তি দিয়ে লন্ডনে পাঠিয়ে দেয়। লন্ডন থেকে দিল্লী হয়ে বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান ফিরে আসেন ১০ জানুয়ারি তাঁর চির ভালবাসার ধন বাংলাদেশের মাটিতে। বঙ্গবন্ধুর এই ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ তার স্বাধীনতার পূর্ণতা লাভ করে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান কাঠামোর মধ্যে এদেশটি স্বাধীনতা লাভ করলেও সুদীর্ঘ ২৪ বছরের পাকিস্তানী শাসনে মূলতঃ বাংলাদেশ পশ্চিম পাকিস্তানের একটি উপনিবেশে পরিণত হয়। পাকিস্তানী স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ও বল্গাহীন শোষণে নিষ্পেষিত বাঙালি জাতি তাই প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জনের স্বপ্ন দেখতে পায়। আর জাতির এ স্বপ্নের প্রতিবিম্ব হিসেবেই আবির্ভূত হন শেখ মুজিবুর রহমান।

পাকিস্তানি শাসক-শোষকগোষ্ঠী বাংলাদেশকে চিরপদাবনত করার লক্ষ্যে প্রথমেই আঘাত হানে এদেশের ভাষার ওপর। বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানি উর্দু ভাষার মধ্যে বিলীন করে এদেশের মাটি ও মানুষকে তাদের শাসন-শোষণের লীলাক্ষেত্রে পরিণত করার চক্রান্তের বীজ বপন করা হয় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের তথাকথিত প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা' ঘোষণার তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ ওঠে বাঙালি ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের কণ্ঠে। আর এ প্রতিবাদের 'প্রতীক' হিসেবে বেরিয়ে আসেন শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের প্রতীকও তিনি। সেই থেকে পাকিস্তানি শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী বিপ্লবী কণ্ঠস্বর হিসেবেও মুজিবের আবির্ভাব ঘটে।

পাকিস্তানি শোষণের বিরুদ্ধে ১৯৫৪-এর ঐতিহাসিক যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৫২-এর শিক্ষা-সাংস্কৃতিক আন্দোলন, ১৯৬৬-এর ঐতিহাসিক ৬ দফা ভিত্তিক বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের মধ্যমণি হিসেবেও মুজিব বেরিয়ে আসেন। ফলে পাকিস্তানি শাসক-শোষকচক্র মুজিবকেই তাদের এক নম্বর শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে। বাঙালি জাতিকে ধ্বংস ও জাতির বিপ্লবী-পুরুষ শেখ মুজিবকে তাই একের পর এক মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে হেনস্তা করার ধারাবাহিক নির্যাতনের এক পর্যায়ে পাকিস্তানকে ধ্বংস ও ইসলামকে নির্বাসনসহ ভারতের সহায়তায় পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার এক দেশদ্রোহী মামলা 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' দায়ের করে পাকিস্তানি শাসকচক্র মুজিবকে ফাঁসিতে ঝুলানোর এক মহাষড়যন্ত্র আঁটে।

১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিরুদ্ধে বাঙালি জাতি শেখ মুজিবের মুক্তি ও পাকিস্তানের লৌহমানব জেনারেল আইয়ুবের পতনের দাবিতে আন্দোলন-সংগ্রামে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ১৯৬৯ সালে সেই আন্দোলন প্রবল গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হলে শাসকগোষ্ঠী বাধ্য হয়ে শেখ মুজিবকে মুক্তি দেয় ও মামলাটি প্রত্যাহার করে নেয় এবং অবশেষে জেনারেল আইয়ুব পদত্যাগ করে জেনারেল ইয়াহিয়ার হাতে শাসনভার অর্পণ করেন।

বাংলাদেশের সুদীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিবিম্ব শেখ মুজিবকে বাংলার মানুষ 'বঙ্গবন্ধু' খেতাবে ভূষিত করে। 'বঙ্গবন্ধু' খেতাবে অনুপ্রাণিত হয়ে মুজিব এবার বাংলাদেশের সর্বাত্মক স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে অবতীর্ণ হন।

এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯৭০ সালে পাকিস্তানব্যাপী সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। নির্বাচনের ফলাফলে পাকিস্তানি কায়েমী শাসক-শোষকগোষ্ঠীর অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। শেখ মুজিবের হাতে শাসন ক্ষমতা অর্পণের অর্থই পাকিস্তান বিতাড়ন। শুরু হলো ক্ষমতা হস্তান্তর না করার প্রাসাদ চক্রান্ত। এ অবস্থায় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলার মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠলো। তাঁর নির্দেশে ১৯৭১-এর ১ মার্চ থেকে শুরু হলো পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রমনা রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) স্মরণকালের বৃহত্তম মহাসমাবেশে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির সর্বাত্মক মুক্তি ও স্বাধীনতা অর্জনের উদাত্ত আহ্বান সম্বলিত জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণদান করেন। ভাষণের স্তরে স্তরে তিনি বলেন : 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে',.....'আমি যদি হুকুম দিবার না পারি, তোমরা সংগ্রাম চালিয়ে

যাবে',....'রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু বন্ধ করে দেবে' জাতীয় একটি সর্বাত্মক জনযুদ্ধভিত্তিক গেরিলা লড়াইয়ের দিকনির্দেশনা দান করেন। এবং সর্বশেষে স্বাধীনতা অর্জনের এক উদ্দীপ্তময় আহ্বান জানান: 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।'

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ও বাঙালি জাতির মহাজাগরণে দিশাহীন হয়ে পাকিস্তানি শাসকচক্র কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়ে আলাপ-আলোচনার জন্যে বাংলাদেশে আসে। শাসক ইয়াহিয়া ও তার সকল কুমন্ত্রণাদাতা জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর সাথে আলাপ-আলোচনার অজুহাতে যে বাঙালি জাতির স্বাধীনতার স্পৃহা ধ্বংস ও জাতিকে অস্ত্রশক্তিবলে বিলীন করার চক্রান্তে মেতে উঠেছে তা বঙ্গবন্ধুর বুঝতে বাকি রইলো না। তিনিও পাকিস্তানি শাসকচক্রের সাথে আলাপ-আলোচনার পথ খোলা রেখে গোপনে গোপনে দেশের সর্বত্র প্রতিরোধ রচনা করতে থাকেন।

এমনি অবস্থার মধ্য দিয়ে এলো ২৫ মার্চ। ইয়াহিয়া-ভুট্টোর গণহত্যার তাৎক্ষণিক জবাব দিলেন বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করে। তারপর শুরু হলো বাংলাদেশের ঐতিহাসিক মুক্তিযুদ্ধ।

সুতরাং বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের একক নেতৃত্ব যেমন ঐতিহাসিক কারণে বঙ্গবন্ধুর ওপর বর্তে ছিল, তেমনি স্বাধীন বাংলাদেশের বহু ত্যাগে অর্জিত স্বাধীনতাকে অর্থবহ ও সুসংহত করে তার সুফল ব্যাপক জনগণের জীবনে প্রতিফলিত করার লক্ষ্যে আর্থসামাজিক সাংস্কৃতিক মুক্তি তথা একটি শোষণহীন গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক 'সোনার বাংলা' প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সেই একই নেতৃত্ব ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই বর্তায় বঙ্গবন্ধুর গতিশীল নেতৃত্বের ওপর।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরপরই তাইতো একটা সীমাহীন বিপর্যস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশের শাসনভার তিনি শূন্যহাতে গ্রহণ করলেন। মুজিবনগরে প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী সরকারের রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থার স্থলে ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি মন্ত্রিপরিষদ শাসন ব্যবস্থার প্রচলনের মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হন। সুপ্রিম কোর্টের সাবেক বিচারপতি, মুজিবনগর সরকারের আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর আবু সাঈদ চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব দেয়া হলো। বিপ্লবী সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদকে যথাক্রমে শিল্প ও অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব দেয়া হলো। এবার যাত্রা হলো শুরু।

কিন্তু যাত্রা শুরুর লগ্নে ছিলো না কোনো দেশের সাথে কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক। দেশীয় ও বৈদেশিক তহবিল একেবারে শূন্য। আত্মসমর্পণের পূর্বে পাকবাহিনী ও তাদের সহযোগীরা দেশী-বিদেশী মুদ্রা ও সোনাদানা লুটপাট করে। খাদ্যশস্য লুটপাটসহ তাতে অগ্নিসংযোগ করে। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধানতম তিনটি উপায় পাট, চা ও চামড়া গুদামে অগ্নিসংযোগ করে। অর্থাৎ পাকবাহিনী ও তার সহযোগী রাজাকার দালালগোষ্ঠী তাদের পরাজয় অবধারিত জেনে বাংলাদেশ যাতে সহজে শিরদাঁড়া উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে, সে-জন্যে যাবতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাবলীকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়। অপরদিকে দীর্ঘ দশটি মাসে যুদ্ধজনিত পরিস্থিতিতে কৃষকরা কোনো ফসল উৎপন্ন করতে পারেনি।

অপরদিকে আকাশ নৌ ও স্থল পথ অচল ও বিধ্বস্ত। হাজার হাজার রাস্তাঘাট শহর বন্দর গঞ্জ হাট বাজার গ্রামসহ পুল-কালভার্ট-ব্রীজ সম্পূর্ণ ধ্বংস। শিল্প-কলকারখানা ধ্বংস। পাকবাহিনী কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত অবাঙালি মালিকদের ফেলে যাওয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত শিল্প-কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সমস্যাসহ এসবের শ্রমিক-কর্মচারীদের পুনর্বাসনের সমস্যা। সরকারী অফিস-আদালতের অব্যবস্থাসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে সমস্যা। প্রশাসনযন্ত্র বিপর্যস্ত। আনসার পুলিশ বিডিআর ও সামরিক বাহিনী বিপর্যস্ত। স্কুল কলেজ মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় বিধ্বস্ত। ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী স্বদেশাগত এক কোটি ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসনের সমস্যা। পালিয়ে ও লুকিয়ে থাকা রাজাকার আলবদর দালাল ও চোর-ডাকাতের হাতে ছড়িয়ে থাকা অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারসহ প্রায় ৩৭ হাজার পাক দালালদের নিয়ে সমস্যা। ৯৩ হাজার পাক যুদ্ধবন্দী ও ৫ লক্ষ আটকে পড়া পাকিস্তানিদের নিয়ে সমস্যা। বাংলাদেশের মাটিতে প্রায় লক্ষাধিক ভারতীয় মিত্রবাহিনীর অবস্থান। পাকিস্তানে আটকে পড়া ৪০ হাজারের মতো সামরিক বাহিনীর সদস্যসহ ৪ লক্ষ বাঙালিদের দেশে ফেরত আনার সমস্যা। কৃষকদের বীজ, সার ও চাষাবাদের যন্ত্রপাতি ও হালের বলদজনিত সমস্যা, তাদের খাওয়া-পরা মেটানোর সমস্যাসহ ইত্যাকার হাজারো সমস্যা-সঙ্কুল পরিবেশকে মোকাবিলা করার দায়-দায়িত্ব নিয়ে বঙ্গবন্ধু দেশের হাল ধরলেন।

দেশবাসীর আহার বাসস্থান শিক্ষা চিকিৎসা কর্মসংস্থান ও সার্বিক আর্থসামাজিক পুনর্বাসনের মহাসাগরসম সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু তাঁর আত্মবিশ্বাস ও দেশবাসীর ওপর প্রবল আস্থাকে সম্বল করে অগ্রসর হতে থাকলেন।

এ অবস্থার মধ্য দিয়েও অবাধ গণতান্ত্রিক রাজনীতির প্রচলন করলেন। দেশকে একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে মাত্র ন'মাসের মধ্যে তিনি জাতিকে বিশ্বের অন্যতম একটি সেরা শাসনতন্ত্র উপহার দিলেন। দেশ পরিচালনার মূল লক্ষ্য হিসেবে চারটি মৌল আদর্শ গ্রহণ করা হলো যা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সার্বিক ফলশ্রুতি, তাহলো ঃ গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ।

বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশের অভ্যুদয়, বঙ্গবন্ধুর মুক্তি, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের শাসনভার গ্রহণ এবং রাষ্ট্রপরিচালনার মূল আদর্শের বাস্তবায়ন এবং বিশ্বরাজনীতিতে মুজিবের মতো বিশাল ব্যক্তিত্বের সমাজতান্ত্রিক ও জোটনিরপেক্ষ শিবিরে অবস্থান ইত্যাদি বিষয়াবলীতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধকালীন বৈরিতার রেশ ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, সৌদি আরবসহ পুঁজিবাদী বিশ্ব এবার অর্থনৈতিক অস্ত্র প্রয়োগ করলো বঙ্গবন্ধু সরকারের বিরুদ্ধে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠনে যেখানে অর্থই হলো এর কার্যকরি সমাধান, এ স্তরে মার্কিন সমর্থিত পুঁজিবাদী বিশ্ব বাংলাদেশের সাহায্যের মধ্যে নিত্যনতুন শর্তারোপ ও বিভিন্ন প্রকার চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। এমন কি জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের প্ররোচনায় সৌদি-মুসলিম বিশ্ব ও সমাজতান্ত্রিক গণচীন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রবল বাধার প্রাচীর গড়ে তোলে। তারা মূলতঃ পাকিস্তানের স্বার্থে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পুনরায় অবস্থান গ্রহণ করে। এ অবস্থায় ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের সাহায্য-সহযোগিতা থেকে বাংলাদেশ নিদারুণভাবে বঞ্চিত হতে থাকে।

এ অবস্থায় ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়নসহ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ, বিভিন্ন মানবতাবাদী সাহায্য সংস্থা, জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক রেডক্রস সমিতিসহ কতিপয় বন্ধুভাবাপন্ন দাতাদেশ যৎসামান্য সাহায্য-সামগ্রী নিয়ে বাংলাদেশের পাশে এসে দাঁড়ায়। এই যৎসামান্য সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে বঙ্গবন্ধুকে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হতে হলো।

অপর দিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, চৈনিক হঠকারী নেতৃত্ব ও সৌদি আরবের গোপন সাহায্যে বলিয়ান হয়ে মুজিববিরোধী জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) ও কয়েকটি অতিবামপন্থী রাজনৈতিক দল পরাজিত দালাল রাজাকার আলবদরদের তাদের দলে স্থান দিয়ে দল ভারি করে এবং ঐসব স্বাধীনতাবিরোধীদের সাথে একজোট হয়ে জনপ্রিয় মুজিব সরকারের বিরুদ্ধে নানান ধরনের অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতায় লিপ্ত হয়ে জাতীয় সমস্যাসমূহকে আরো মারাত্মকভাবে ভারাক্রান্ত করে তুলতে থাকে। এতকিছু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অবর্ণনীয় সমস্যাসমূহের পরও পূর্ণ গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক

অধিকার প্রদান করা হলো যা সশস্ত্র বিপ্লবের পরে বা মুক্তিযুদ্ধের পরে কোনোকালে কোনোযুগে কোনোদেশে কখনো দেয়া হয়নি। অথচ বঙ্গবন্ধু তার ব্যতিক্রম। তিনি সকলকে পূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক রাজনীতি চর্চার অবাধ অধিকার প্রদান করলেন। এদিক দিয়ে বঙ্গবন্ধুর অবদান বিশ্বের ইতিহাসে একটি বিরল দৃষ্টান্ত।

এই বিশাল ও ব্যাপক গণযুদ্ধ সাধারণ মানুষের সকল চেতনাকে বিকশিত ও আলোকিত করে প্রখর করেছে। সাধারণ মানুষ তাদের অধিকার সম্পর্কে খুবই সচেতন হয়ে পড়েছে। যুদ্ধকালীন সময়ে জাতীয়তাবাদের চেতনা, ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা ও সাম্যবাদের স্ফূরণ এবং গণতান্ত্রিক মানসিকতার উন্মেষে গোটা জাতি উদ্বুদ্ধ হয়ে পড়ে। ফলে বাঙালি জাতি তাদের মনের সকল কালিমা অন্ধত্ব ও কুসংস্কারকে বিসর্জন দিতে সক্ষম হয়। ফলশ্রুতিতে জাতীয় সার্বিক কর্মকাণ্ডে জাতি তাদের ভূমিকা পালনের জন্য তৎপর হয়ে পড়ে। কিন্তু জাতীয় আর্থসামাজিক বিপর্যয় তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে বিশাল বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

অপরদিকে বিভিন্ন সাহায্যদাতা দেশ ও সংস্থাসমূহ তাদের নিজ নিজ রাজনৈতিক দর্শন ও আর্থসামাজিক ব্যবস্থাকে সাহায্যদানের পূর্বশর্ত হিসেবে গ্রহণ করার জন্যে বাংলাদেশের ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। প্রচলিত ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক পরিণতি সাধারণ মানুষের জীবনকে কীভাবে শোচনীয় বিপর্যয়ের মধ্যে নিপতিত করে তার নিদারুণ প্রমাণ পাকিস্তান কাঠামোয় আবদ্ধ বাঙালি জাতির ভাগ্যবিপর্যয়। এ অবস্থাকে সামনে রেখে বঙ্গবন্ধু তাঁর শাসন ব্যবস্থায় গ্রহণ করলেন সমাজতান্ত্রিক পদক্ষেপ। ব্যাপক জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে তাই সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে সকল প্রকার ব্যাংক, বীমা, বৃহৎ শিল্প-কলকারখানা, পরিত্যক্ত সম্পত্তি, বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি জাতীয়করণ করে জনগণের মালিকানায় ন্যস্ত করলেন। শোষণের অন্যতম ক্ষেত্রে ভূমিব্যবস্থাকে পুনর্বিন্যাস করে পরিবার প্রতি ১০০ বিঘা জমির সিলিং বেঁধে দিয়ে অতিরিক্ত ও সরকারী খাসজমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে বন্টন করে দিলেন। কৃষিশ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণসহ শ্রমিক-কর্মচারী-কর্মকর্তাদের বেতনের তারতম্যের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনলেন এবং জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ক্ষেত্র যথা খাদ্য, কৃষি, বিদ্যুত, ওয়াসা ও বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডসহ শিক্ষা ও চিকিৎসাখাতে সরকারী ভর্তুকি প্রদান করলেন। এভাবে জনজীবনের সর্বত্র একটা সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার

মাধ্যমে দেশী-বিদেশী শোষণের বিষদাঁত উপড়ে ফেলার কার্যক্রম গ্রহণ করলেন বঙ্গবন্ধু ।

বঙ্গবন্ধু এভাবে একটি বৈপ্লবিক কর্মসূচি নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানান জটিল সমস্যা সমাধানে আত্মনিয়োগ করলেন । কিন্তু এরই পাশাপাশি অল্প কিছুদিনের মধ্যে পাকিস্তানি ধ্যানধারণার রাজনীতিক, সামরিক-বেসামরিক আমলা, ধনিক-বণিক, পুঁজিবাদের অন্ধ সমর্থক-দালাল, তথাকথিত বামপন্থী-সাম্যবাদী-সর্বহারা রাজনৈতিক দল এবং ক্ষমতার সাথে জড়িত একটি প্রতিক্রিয়াশীল-প্রতিবিপ্লবী অপশক্তিগুলোর পশ্চাতে মার্কিন-চীন-সৌদি সাম্রাজ্যবাদ মদদ যুগিয়ে নানান ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে দেশের রাজনৈতিক আর্থসামাজিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে একটি নাজুক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। ঐসব সাম্রাজ্যবাদ ও পরাজিত পাকিস্তানি শাসক-শোষকদের এদেশীয় সেবাদাস ও মুক্ত অর্থনীতির ধারক-বাহক পেটি বুর্জোয়া শক্তি একযোগে বঙ্গবন্ধুর সমাজতান্ত্রিক বৈপ্লবিক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে তৎপর হয়ে উঠলো। ঐ অপশক্তি অর্থ দিয়ে প্রশাসনিক অধিকাংশ আমলা ও সামরিক বাহিনীর পাকিস্তান ফেরত অমুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা ও ক্ষমতার সাথে সম্পৃক্ত কিছু রাজনৈতিক কর্মীদের কিনে ফেলতে থাকে। তারা তাদের সমর্থক ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর মাধ্যমে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করতে থাকে। অর্থের বিনিময়ে টাউট মোল্লা-মাওলানা/রাজাকার-আলবদর ধর্মগোষ্ঠীকে হাত করে তাদের দিয়ে বিভিন্ন ধর্মীয় জলসা-সেমিনার ও অন্যান্য অনুষ্ঠানাদির নামে সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি দর্শন-চেতনার বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু করে এবং এ সকল দর্শনকে ইসলামবিরোধী কুফরি মতবাদ বলে বিষোদগার করতে থাকে। মুজিববিরোধী রাজনীতিক ও এই সব ধর্মীয় মোল্লাচক্র বঙ্গবন্ধু, তাঁর আত্মীয়-স্বজন, অনুসারী, নেতা-কর্মীদের নামে নানান অপবাদ দিতে থাকে। এমন কি তারা দেশের প্রাণশক্তি মুক্তিযোদ্ধা ছাত্র ও যুবকদের দুষ্কৃতকারী, হাইজ্যাকার, নারীহরণকারী ইত্যাকার অপবাদে ভূষিত করতে থাকে। সাম্রাজ্যবাদের মদদপুষ্ট স্বাধীনতাবিরোধী এই সব গণবিরোধী অপশক্তি নিজেরাই ব্যাংক ডাকাতি, পাটের গুদামে অগ্নিসংযোগ, কলকারখানায় অন্তর্ঘাত, রেললাইন তুলে ফেলে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ সৃষ্টি, খাদ্যশস্য লুটপাট, নারীনির্যাতন প্রভৃতি কাযকলাপ করে বঙ্গবন্ধু সরকারকে হেয়প্রতিপন্ন করার কারসাজি করে, অথচ তারাই আবার এসবের জন্যে মুজিববাদীদের ওপর দোষারোপ করে। জাসদের গণকণ্ঠ, মাওলানা ভাসানীর হককথা, অন্যান্য কতিপয় পত্র-পত্রিকা, এমন কি প্রভাবশালী

ইত্তেফাক পত্রিকা এ জাতীয় অপপ্রচারে লিপ্ত হয়। মুজিববিরোধী হোঁচট খাওয়া রাজনীতিক-বুদ্ধিজীবী-লেখকদের মধ্যে আবুল মনসুর আহমদ, বদরুদ্দিন ওমর, আহমদ শরীফসহ নব্য বামপন্থী লেখক-সাহিত্যিক-কবিরাও এ অপপ্রচারে শরীক হন। শরীক হন সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের সেবাদাস অন্যান্য কতিপয় রাষ্ট্রের প্রচার মাধ্যম ও কিছু সাংবাদিকও। এ অবস্থার মধ্যে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বয়ং হেনরী কিসিঞ্জার সাহেব, যিনি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় সরাসরি পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন এবং পাকিস্তানের পরাজয়কে যিনি তাঁর ব্যক্তিগত পরাজয় বলে একদা খেদোক্তি করেছিলেন, সেই কিসিঞ্জার সাহেব ওয়াশিংটনে বসে বসে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নানান বোলচাল করে যাচ্ছিলেন, তাঁরই এদেশীয় সেবাদাসদের দ্বারা সৃষ্ট বাংলাদেশের আর্থিক দুর্গতির সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশকে 'তলাবিহীন ঝুঁড়ি' বলে উপহাস করেন। কিসিঞ্জারের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে এদেশীয় অপশক্তি ঐ উপহাস নানান রংচং মেখে বক্তৃতামঞ্চ আর খবরের কাগজের খোরাক হিসেবে ব্যবহার করতে থাকে। এ প্রসংগে বাংলাদেশের ডিগবাজি খাওয়া রাজনীতিক, উচ্চাভিলাষী ধনিক-বণিক ও বিশেষচক্রের দ্বারা সৃষ্ট রাজনৈতিক দলের শ্রেণী চরিত্র ও কার্যকলাপের ওপর যৎকিঞ্চিত আলোকপাতের প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি।

১৯৪৯ সালে শাসক মুসলিম লীগ সরকারের গণবিরোধী কার্যকলাপ, বিশেষ করে পাকিস্তানি পাঞ্জাবী শোষক-প্রতারকচক্রের বাঙালিবিরোধী শাসন-শোষণের প্রতিবাদে একই দলের একটি প্রগতিশীল অংশ মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে 'আওয়ামী মুসলিম লীগের' পতাকাতলে জড়ো হয়। তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সিংহভাগেরই আগমন ঘটেছিল ধনিক বণিক শিল্পপতি ও আধা সামন্তবাদী পরিবার থেকে। এদিক থেকে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল কাশেম ফজলুল হক, মাওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিব ব্যতিক্রম ছিলেন। এঁদের আগমন ঘটেছিল পেশাজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে।

মুসলিম লীগ সরকার তথা পাকিস্তানের কায়েমী ধনিক-বণিক শাসক-শোষক শ্রেণীর স্বৈরাচারী শাসন-শোষণ, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব সর্বোপরি পূর্ববাংলার প্রতি বৈষম্যের কারণে পূর্ববাংলার ঐসব নেতা-কর্মীরা মাওলানা ভাসানীর দলে এসে ভিড় জমাতে থাকেন। শোষকগোষ্ঠীর সাথে প্রতিযোগিতায় কুলিয়ে উঠতে পারছিলো না, ভবিষ্যতের সোনালীস্বপ্নে বিভোর হয়ে তাই এদেশীয় ধনিক ও উঠতি ধনিকশ্রেণীর একটি বিরাট অংশ এই নবীন দলে ভিড় জমায়। আবার ১৯৫৫-৫৭ সালে এ দলের নেতৃত্বের কোন্দলের কারণে

সোহরাওয়ার্দী-মুজিবের নেতৃত্বে ব্যাপক জনতাকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে সাম্প্রদায়িকতাবর্জিত নতুন রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের জন্ম হলো। সোহরাওয়ার্দীর প্রখর সুশিক্ষিত ব্যক্তিত্ব, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং শেখ মুজিবের প্রবল সাংগঠনিক দক্ষতার ফলশ্রুতিতে অচিরে পূর্ববাংলার জনগণ ব্যাপকভাবে আওয়ামী লীগের পতাকাতলে জড়ো হতে থাকলো। আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তায় মুগ্ধ হয়ে তাই এদেশের উঠতি ধনিক শ্রেণীর বিরাট অংশও জড়ো হলো এদলের মধ্যে সোনালিস্বপ্নে বিভোর হয়ে।

তবে একথাও অনস্বীকার্য যে, আওয়ামী লীগে আগত ধনিকশ্রেণী বাঙালি জাতীয়তাবাদী চিন্তাচেতনায় উজ্জীবীত ছিলেন এবং বাঙালি জাতির প্রতিটি আন্দোলনে এরাও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা পালন করেন। তবে এদের শ্রেণীচরিত্র ও উদ্দেশ্য-লক্ষ্য বিষয়ে বঙ্গবন্ধু পূর্ণভাবে সজাগ ছিলেন। তিনি হৃদয় দিয়ে বুঝে ছিলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদীচক্র রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্র, শিল্প-ব্যাংক-বাণিজ্য ও সামরিক বাহিনীতে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে আছে। সর্বোপরি তারা বাঙালিবিদ্বেষী। এই শক্তিশালী ধুরন্ধর শাসক-শোষকগোষ্ঠীর কবল থেকে বাঙালিকে মুক্ত করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতি। দলের ভেতর কারা শোষক-ধনিক, কারা শোষিত-সর্বহারা, কারা সুবিধাবাদী-মতলববাজ, এ জাতীয় শ্রেণীসত্তা বিচারের অবকাশ তৎকালীন পাকিস্তান রাজনীতির বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ছিলো না। বাঙালি জাতির সর্ব শ্রেণীস্তরের সমন্বয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চিন্তাচেতনার আলোকে বিভিন্নভাবে গণতান্ত্রিক নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ নির্মাণ ও পাকিস্তানি শোষকদের কবল থেকে বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতিকে মুক্তকরণের সংগ্রামমুখর কার্যক্রমের মধ্যে বাঙালি শোষক-শোষিতের প্রশ্নও তাই ছিলো গৌণ। মূলতঃ বঙ্গবন্ধু সর্বস্তরের বাঙালিদের জাতীয় ঐক্যের বেদিমূলে বলিয়ান করে 'বাঙালি জাতীয়তাবাদে'র অগ্নিমন্ত্রে উজ্জীবিত করে স্বাধিকার থেকে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করে মুক্তবাংলার মাটিতে বসে একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক শোষণহীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক চিন্তাধারা গ্রহণ করেছিলেন। এ জন্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলোতে জাতির মধ্যে কোনোরূপ বিভেদ-বিভক্তি সৃষ্টিকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। এক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু মহামতি লেনিনের পথ অনুসরণ করেছিলেন। লেনিন বলেছেন, বিভিন্ন শ্রেণীর সমন্বয় সাধন ও পুঁজিবাদী সমাজের ইট-কাঠ দিয়ে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই গড়তে হবে নতুন দেশ, নতুন সমাজ, নতুন দিগন্ত। তদ্রূপ বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন যে, এদের অর্থাৎ ধনিক-পুঁজিবাদীদের সাথে নিয়েই তিনি একটি

নতুন দেশ-সমাজ গড়বেন। হিংসা-বিভেদ, জবরদস্তি ও রক্তপাতমূলক কার্যকলাপের ঘোর বিরোধী ছিলেন তিনি। ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততা দিয়েই তিনি সকল স্তরের বাঙালিদের একতাবদ্ধ করতে চেয়েছেন। তিনি আরো বিশ্বাস করতেন যে, বাংলাদেশ কেবল বাঙালির দেশ, বাঙালি একটি বৃহৎ পরিবার। এই পরিবারে ভালো মানুষ যেমন আছে, তেমনি খারাপ মানুষও আছে; শোষক আছে, শোষিত আছে; জ্ঞানী-গুণী আছেন, অজ্ঞানী-মূর্খও আছে; চোর-ডাকাত-বাটপাড় ধরার লোক যেমন আছে, তেমনি ঐসব লোকজনও রয়েছে। এসব নিয়ে এই বাঙালি পরিবার। 'আমরা সকলে পরের তরে'– এ চেতনার একটি পরিবার সমাজ। এভাবে বাঙালি জাতির ওপর চিরন্তন বিশ্বাসের বলে বলিয়ান হয়ে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে শোষক-শোষিতের প্রশ্ন তুলে জাতিকে বিভক্ত করেননি। ফলে আওয়ামী লীগ হয়ে দাঁড়ায় এদেশের জাতীয়তাবাদী, সমাজতন্ত্রী ও পুঁজিবাদীদের একটি প্লাটফরম বা রাজনৈতিক সংস্থা। এক কথায় আওয়ামী লীগ বহু শ্রেণীভিত্তিক রাজনৈতিক সংস্থা (মালটিক্লাস অরগানাইজেশন) হিসেবে পরিগণিত হয়।

অপরদিকে মুসলিম লীগ ছিলো সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদ তথা শাসক-শোষকদের প্লাটফরম। বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্তানের ধনিক বণিক শিল্পপতি আমলা-জেনারেল, সামন্তবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীলচক্রের সম্মিলিত রাজনৈতিক সংগঠন। ঐসব চক্রের স্বার্থে তথা তাদেরই পরামর্শে মুসলিম লীগ পরিচালিত হতো। পূর্ববাংলার ২/৪টি ধনিক পরিবার দালালির মাধ্যমে তাদের সাথে ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণ করেছিলো। বাকি উঠতি পুঁজিপতি বা ধনিকগোষ্ঠী ভবিষ্যত ক্ষমতার মঞ্চে আরোহন করার লক্ষ্য নিয়ে আওয়ামী লীগের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পর্ক গড়ে তোলে। এ ব্যতীত আরো কতিপয় রাজনৈতিক সংগঠন যেমন জামাতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী, পিডিপি, প্রভৃতি ইসলামপন্থী-পুঁজিবাদী দল শাসক ও দেশী-বিদেশী ধনিক-বণিকদের পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে অবস্থান করলেও মূলতঃ এরা ছিলো শাসক ও শোষকশ্রেণীর বি-টিম। এদের কাজই ছিলো আওয়ামী লীগের বাঙালি জাতীয়তাবাদী চিন্তাচেতনা ও বামপন্থী সমাজতান্ত্রিক দলগুলোর দর্শনের বিরোধিতা করা। এরা ইসলামের ছত্রছায়ায় জাতীয়তাবাদ ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে ইসলামবিরোধী আল্লাহবিরোধী নাস্তিকতাবাদের দর্শন বলে জনগণের মাঝে ধূম্রজাল ছড়াতো, যাতে শাসক-শোষকচক্রের বিরোধী সংগঠন আওয়ামী লীগ ও বামপন্থীদলের প্রতি জনগণ ঝুঁকে না পড়ে।

সমাজতান্ত্রিক বা বামপন্থী রাজনৈতিক দলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দল যেমন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি, পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি, সর্বহারা পার্টি, পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি প্রভৃতি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদী রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর মধ্যে একমাত্র পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির দুটি উপদল (ভাসানী-মোজাফফর) ব্যতীত অন্যান্য দলগুলো ছিলো নিষিদ্ধ। তারা আন্ডারগ্রাউন্ডে ঐসব সংগঠন পরিচালনা করতো। শাসক-শোষক ও ইসলামওয়ালারা ছিলো তাদের প্রতি খড়গহস্ত। এদের মধ্যকার মস্কোপন্থী দলগুলো মূলতঃ আওয়ামী লীগের ছত্রছায়ায় তাদের রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করতো। অপরদিকে পিকিংপন্থী দলগুলো পাকিস্তানি শাসক-শোষকদের বিরুদ্ধে যত না গলাবাজি করতো, তারচে' বেশি গলাবাজি করতো আওয়ামী লীগের জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে। তারা আওয়ামী লীগকে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের দালাল হিসেবেও আখ্যায়িত করে। মূলতঃ ন্যাপ (ভাসানী ও কতিপয় সর্বহারা উপদলসমূহের বামপন্থী-পিকিংপন্থী দলের নেতারা) পাকিস্তানি শাসক-শোষকদের সাথে তাদের মুরুব্বী চীনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সূত্র ধরে বিশেষ করে আওয়ামী লীগ বিরোধিতাই রাজনৈতিক লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে। রাতের বেলা গ্রাম্যধনিকদের গলাকাটা আর দিনের বেলা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালানোই ছিলো তাদের মূল রাজনীতি। পর্দার অন্তরালে এরা সাম্রাজ্যবাদ (মার্কিন) ও পাকিস্তানি শাসক-শোষকদের নিকট থেকে ঐ রাজনীতি পরিচালনার জন্যে অঢেল অর্থকড়ি লাভ করতো বলে শোনা যেতো। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ চীনের সাথে সম্পর্ক নিবিড় করার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের শেষদিকে বেশ অগ্রসর হয়। এক্ষেত্রে মূলতঃ পাকিস্তান সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করে। এ সুযোগে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সমাজতন্ত্রকে হিংসাবিদ্বেষ, হানাহানি, রক্তপাত, গলাকাটা, ধর্মবিরোধী নাস্তিকতার দর্শন হিসেবে চিহ্নিত ও চিত্রিত করার লক্ষ্যে ঐসব চৈনিকপন্থী সর্বহারা-সমাজতন্ত্রীদের দিয়ে ঐসব কার্যক্রম সুচারুরূপে করতে সক্ষম হয়। মূলতঃ এরা সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের অর্থ খেয়ে সমাজতন্ত্রের নামাবলী আউড়ে প্রকারান্তরে সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করার কার্যক্রমে লিপ্ত হওয়াসহ গণবিরোধীচক্র হিসেবে সমাজতন্ত্রীদের চিহ্নিত করে। বঙ্গবন্ধু তাই ঐসব চৈনিকপন্থীদের 'পেন্টাগনপন্থী সমাজতন্ত্রী' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এরা যে পেন্টাগনপন্থী তার প্রমাণ এরা দেয় আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে। কারণ তাদের মুরুব্বী চীন-মার্কিনও মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করেছিলো। ফলে পাকিস্তান-বাংলাদেশেও

তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক দল ও এসবের নেতা-কর্মীরা তাই সঙ্গতকারণে জনগণের সমর্থন পায়নি। ঐসব কথাকথিত সমাজতন্ত্রী ও ইসলামপন্থীদের কার্যকলাপ তাই জনবিরোধী, স্বাধীনতাবিরোধী কার্যক্রমেই প্রতিভাত হয়েছে। মূলতঃ পিকিংপন্থী ও ইসলামপন্থীরা এক ও অভিন্ন উদ্দেশ্যে তাদের কার্যকলাপ পরিচালনা করেছে বাঙালি জাতির বিরুদ্ধে। এরা উভয়ই মূলতঃ প্রতিক্রিয়াশীলচক্র। এই দুই প্রতিক্রিয়াশীলচক্র কেবলমাত্র সমাজতন্ত্রকে নস্যাত করার লক্ষ্যে ইসলাম ও সমাজতন্ত্রের নাম ব্যবহার করেছে। এই দুই চক্র, ইসলাম ও পিকিংপন্থী সমাজতন্ত্রীরা তাই বাংলাদেশের স্বাধীনতার শত্রু, প্রগতি ও উন্নয়নের শত্রু; এরা সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের পেইড এজেন্ট।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের সাথে সাথে পাকিস্তান আমলের এদেশীয় উঠতি ধনিক পুঁজিবাদীচক্র ও অন্যান্য কায়েমী স্বার্থান্বেষীরা অনিবার্য কারণেই বহুদিনের লালিত কামনাকে বাস্তবায়িত করার কাজে আদাজল খেয়ে নেমে পড়ে। এ সুযোগ আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের মোড়লরা পূর্ণভাবে গ্রহণ করে উঠতি ধনিকশ্রেণীর পেছনে এসে দাঁড়ায়। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ যে পরাজয়ের গ্লানি সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের কপালে লেপটে দিয়েছে সেই কালিমা মোচন ও পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণকল্পে এবার তারা এদেশীয় উঠতি ধনিক ও অন্যান্য সুবিধাবাদীচক্রের মাধ্যমে তাদের কালো থাবা বিস্তার করে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু এই সব উঠতি ধনিক-সুবিধাবাদী চক্রের লালসাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে সমাজতান্ত্রিক আর্থবৈষয়িক কর্মসূচি গ্রহণ করলেন। উঠতি ধনিকশ্রেণী অবশ্য বঙ্গবন্ধু ও তাঁর বিশিষ্ট অনুসারীদের পুঁজিবাদ পরিহার করার বিপদ সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছিলেন। প্রত্যুত্তরে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন ঃ এক সাগর রক্তে কেনা বাংলাদেশকে পুঁজিবাদের রক্তচোষা বাঁদুড়দের হাতে তুলে দিতে পারি না। তিনি শাসনতান্ত্রিক তথা রাষ্ট্রীয় মৌল আদর্শ থেকে পুঁজিবাদকে ঝেঁটিয়ে বিদায় দিয়ে সমাজতন্ত্রের দিকদর্শন প্রদান করলেন।

উঠতি ধনিকশ্রেণী প্রমাদ গণলো। মুজিবের দর্শন-কর্মসূচির মধ্যে তারা তাদের মৃত্যুবাণ দেখতে পেল। ফলে তারা তাদের মতলব হাসিলের লক্ষ্যে সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষকতায় মুজিব সরকারকে হেয় ও উৎখাতের লক্ষ্যে অতি পুরানো চালটি চালালো। তারা স্বাধীনতাবিরোধী পলাতক মুসলিম লীগ, জামাত, নেজামে, পিডিপি, ভাসানীন্যাপ, চৈনিকপন্থী সর্বহারা-সমাজতন্ত্রী পার্টি, রাজাকার আলবদর আলশামস, হতাশাগ্রস্ত মুক্তিযোদ্ধা, প্রশাসনিক দালাল আমলা, উচ্চাভিলাষী সামরিক কর্মচারী, সমাজের দাগী

ডাকাত গুণ্ডা, মোল্লা-মাওলানা, টাউট রাজনীতিক, ব্যবসায়ী প্রভৃতি শ্রেণীর সাথে যোগাযোগ গড়ে তোলে। বঙ্গবন্ধু সরকারের সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচিকে হেয়প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে এবার তারা নেপথ্যে মদদ দিয়ে কিছুসংখ্যক হতাশাগ্রস্ত মুক্তিযোদ্ধাদের দিয়ে গঠন করলেন প্রথম বিরোধী দল জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)। এদের লক্ষ্য বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র। তারপর তারা শুরু করলো জ্বালাও-পোড়াও, ব্যাংক লুট, কলকারখানায় অগ্নিসংযোগ, হত্যা-গুম ইত্যাদি জাতীয় নাশকতামূলক কার্যকলাপ। জনগণকে এভাবেই তারা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের চেহারাটা দেখালো। সমাজতান্ত্রিক আদর্শের এ চেহারা দেখে সমাজতন্ত্রের প্রতি মানুষ বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলো। সেই ঢেউ গিয়ে পড়লো বঙ্গবন্ধুর সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচির ওপরও। সারা দেশে যেন ঢেউ জাগলো, থামাও সমাজতন্ত্র। এভাবেই অতি অল্পসময়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ ও এদেশীয় উঠতি পুঁজিবাদীচক্র বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করলো! তাদের চক্রান্তমূলক কারসাজির ফলে দেশের প্রতিটি স্তরে অবিশ্বাস হানাহানি রেষারেষি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে লাগলো। জাতীয় ঐক্যের বেদীমূলে ফাটলের সৃষ্টি হলো। চারদিকে শুরু হলো সীমাহীন স্বেচ্ছাচারিতা, দুর্নীতি, চোরাকারবারী, ফটকাবাজারী, কালোবাজারী, হাইজ্যাকিং, নৈরাজ্য আর নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির হলাহল। আর এসবের পশ্চাতে আসল ঘুঁটি চালাতে থাকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, চীনসহ পরাজিত শক্তি ও এদেশীয় উঠতি ধনিক-পুঁজিবাদীচক্র।

৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের কারণে ফসল উৎপাদন হয়নি, ৭২-এ মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধে জ্বালানী তেলসহ অর্থনৈতিক অচলাবস্থা, ৭৩ সালে প্রবল বর্ষণ-বন্যা এবং ৭৪ সালে দু'বার প্রলয়ংকর বন্যার প্রকোপসহ মার্কিন ঘেষা আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার আর্থিক অসহযোগিতা এবং দেশের অভ্যন্তরের স্বাধীনতাবিরোধীচক্রের নানাবিধ চক্রান্তের কারণে স্বাধীনতা-উত্তর সার্বিক খাদ্যাভাব ৭৪-এ এসে দুর্ভিক্ষের রূপ নেয়। দেশে চরম মুদ্রাস্ফীতিও ঘটে। এ সুযোগ গ্রহণ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। দুর্ভিক্ষাবস্থাকে আরো কৃত্রিম উপায়ে চাঙ্গা করার হীনলক্ষ্যে তারা তাদের সেবাদাস ও ভাড়াটে সাংবাদিকদের দিয়ে দেশী-বিদেশী পত্রপত্রিকা ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমের আশ্রয় নেয়। এদেশের চরম ডানপন্থী পত্রিকা ইত্তেফাক, মাওলানা ভাসানীর বামপন্থী হককথা, চৈনিকপন্থী এনায়েতউল্লাহ খানের হলিডে, বিভ্রান্ত জাসদের গণকণ্ঠসহ সরকারী মালিকানাধীন দৈনিক বাংলার বামপন্থী কলামিস্ট নির্মল সেন ও কিছুসংখ্যক পেইড লেখক-কবিও এ অপপ্রচারণায় লিপ্ত হয়। এর মধ্য দিয়ে দেশে-বিদেশে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর প্রগতিশীল

সরকারের ভাবমূর্তি দারুণভাবে ক্ষুণ্ন হয়। শুধু অপপ্রচারণার বিষবাষ্পই নিক্ষেপ নয়, দেশের খাদ্যাভাবকে মোকাবিলা করার লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালের প্রথমদিকে নগদ মূল্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বঙ্গবন্ধু যে চাল ক্রয় করেন, তা সরবরাহ দিতে গড়িমসি করা হয়। উপরন্তু খাদ্যশস্য বোঝাই জাহাজকে যান্ত্রিক গোলযোগের অজুহাতে আটলান্টিক মহাসাগরে নোঙ্গর করিয়ে রাখা হয়। এ সবকিছু করা হয় দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করার হীন লক্ষ্যে। মার্কিন সরকারের এ চক্রান্তের আভাসও দিয়েছেন আন্তর্জাতিক খাদ্যনীতি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক ডঃ জাস্ট ফারল্যান্ড। ১৯৯২ সালের ৭ মার্চ ঢাকায় এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, '১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ ছিল মনুষ্যসৃষ্ট। খাদ্য উৎপাদন কম হওয়ার ফলেই শুধু দুর্ভিক্ষ হয়নি, তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার ও মার্কিন প্রশাসনের মধ্যকার মতবিরোধের কারণে খাদ্যসাহায্য বন্ধ হয়ে যায়। ফলে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য যে, ডঃ ফারল্যান্ড ১৯৭২-৭৫ সালে ঢাকাস্থ বিশ্বব্যাংক মিশনের আবাসিক প্রধান ছিলেন।

৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত দেশী-বিদেশী স্বাধীনতাবিরোধীচক্র তাদের কালোহাত প্রসারিত করেছিল আমাদের খাদ্য মন্ত্রণালয়েও। বঙ্গবন্ধু এর মধ্য দিয়েও প্রায় ৬ লক্ষ টন খাদ্যশস্য দেশী-বিদেশী নানাসূত্র থেকে সংগ্রহ করেছিলেন যাতে সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষ মোকাবিলা করা যায়। ঐ ৬ লক্ষ টন খাদ্যশস্য ছিলো খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব আবদুল মোমেন খান ও সাইলো পরিচালক মারুফ মোরশেদের নিয়ন্ত্রণে। মুসলিমলীগার মোমেন খান ও আলবদর সদস্য মারুফ মোরশেদ স্বাধীনতাবিরোধীচক্রের পেইড এজেন্ট হিসেবে ঐ দুর্ভিক্ষ সৃষ্টিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। তারা যেখানে খাদ্যাভাব সেখানে না পাঠিয়ে অপ্রয়োজনীয় স্থানে খাদ্যশস্য সরবরাহ এবং খাদ্যশস্য আত্মসাতের মাধ্যমে দুর্ভিক্ষকে প্রকট করে তোলেন। তারই পুরস্কারসরূপ জেনারেল জিয়া ঐ খাদ্য সচিব মোমেন খানকে পরবর্তীকালে খাদ্যমন্ত্রী বানিয়ে ছিলেন। ঐ মোমেন-মারুফের কুকীর্তি দেখার দুর্ভাগ্য আমার হয়েছিল। আমি (লেখক) ঐ সময় সাইলোতে একজন তদারককারী হিসেবে চাকরি করতাম। বিশেষ করে সাইলো পরিচালক মারুফের সর্বনাশা কার্যকলাপ তথা খাদ্য নিয়ে তালবাহানা, আত্মসাতের হোলিখেলা ইত্যাদি দেখা ও বুঝার দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির শিকার আমাকেও হতে হয়েছিল। বাধ্য হয়ে আমি, অতি অভিমানভরে সরকারী চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে আসি। ঐ মোমেন-মারুফসহ তাদের যাবতীয় অপকর্মের মন্ত্রণাদাতা-সহকর্মীদের দুর্ভিক্ষকালীন কার্যকলাপসহ দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির অন্যতম মহানায়ক মারুফ মোরশেদের অপকীর্তি বিষয়ে আমার রচিত 'বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের

নেপথ্যে' গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ঐ দুর্ভিক্ষে ২৭ হাজার লোক প্রাণ হারায়। কোটি কোটি মানুষ দুর্ভোগ পোহায়।

এভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার এদেশীয় পরাজিত সেবাদাসরা বঙ্গবন্ধুর ওপর ৭১-এর পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে থাকলো। তারা তাদের এজেন্টদের দিয়ে বিভিন্ন জাতীয়করণকৃত শিল্প-কলকারখানায় নানা জঘন্য কার্যকলাপ চালাতে থাকে। ফলে চারদিক থেকে জনমনে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। লুটপাট, হাইজ্যাক, আত্মসাত ও চোরাকারবারী-মুনাফাখোরীর মাধ্যমে এক শ্রেণীর লোক রাতারাতি আঙ্গুল ফুলে কলা গাছে পরিণত হলো। সকলস্তরের দুর্নীতিবাজরা সীমাহীন সম্পদের পাহাড় গড়ে চরম প্রাচুর্য্যের বন্যায় গা ভাসিয়ে দিলো, অপর দিকে সমাজের ব্যাপক নিরীহ জনসাধারণ চরম দারিদ্র্য ও হতাশার তিমিরে হাবুডুবু খেতে লাগলো। চারদিক থেকে যেন অমানিষার কালোতে জাতি নিঃস্ব নির্জীব ও চেতনাহীন হয়ে পড়তে লাগলো। এসব কিছু হলো এদেশীয় স্বাধীনতাবিরোধী, পুঁজিবাদ-ধনবাদের অন্ধসমর্থক উঠতি ধনিক, দুর্নীতিবাজসহ সমাজের সর্বস্তরের কালপ্রিটচক্র ও তাদের নেপথ্য পৃষ্ঠপোষক সাম্রাজ্যবাদের কারসাজিতে।

যে গণতান্ত্রিক কর্মসূচি নিয়ে একেবারে শূন্যহাতে বঙ্গবন্ধু আত্মপ্রত্যয় ও বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তথাকথিত মুক্ত গণতন্ত্রের সুযোগ নিয়ে সমাজের সর্বরাজনৈতিক অঙ্গনের পুঁজিবাদী ও তথাকথিত বাম হঠকারী রাজনৈতিক ভ্রষ্টাচার, উঠতি ধনিক-ব্যবসায়ী, প্রতিক্রিয়াশীল-প্রতিবিপ্লবী স্বাধীনতাবিরোধী মার্কিন-চৈনিক-সৌদি-পাকপন্থী এবং উচ্চাভিলাষী দুর্নীতিবাজদের চক্রান্তে তা বানচালের উপক্রম তো হলোই, উপরন্তু বঙ্গবন্ধুর ভাবমূর্তি অনেকখানি ক্ষুণ্ন হয়ে গেল। তাঁর প্রগতিশীল জনগণতান্ত্রিক সরকারের ভিতও কেঁপে উঠলো। তবুও সাতকোটি নিঃস্ব দরিদ্র হতাশাগ্রস্ত জাতি বঙ্গবন্ধুর প্রতি আস্থা হারায়নি। অবর্ণনীয় দুঃখ-দরিদ্রতার তিমিরে হাবুডুবু খেয়েও জাতি তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে একটু টু-শব্দ করেনি, বিক্ষোভ মিছিল করেনি। বলেনি, বঙ্গবন্ধু ক্ষমতা ছাড়ো। তারা তাঁর কাছে দুঃখ-কষ্টের জন্যে কোনো অভিযোগও করেনি। তারা বোধ হয় বঙ্গবন্ধুর অবস্থা বুঝতে পেরেছিল। বুঝতে পেরেছিলেন বঙ্গবন্ধুও জাতির হৃদয়বীণার করুণ সুরের আবেদন। তিনি এ স্তরে এসে নিজের অতীত জীবন ও তাঁর চিরভালোবাসার ধন বাঙালি চিরশোষিত ভাগ্যাহত মানুষের পাণ্ডুর মুখের দিকে একটু তাকালেন।

বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবন-যৌবনের মধুর ১৪টি বছর নিঃসীম অন্ধ কারাগারে বিসর্জন দিয়ে বাঙালি জাতির চিরকল্যাণের চিন্তায় বসে বসে যে রাজনৈতিক

আর্থসামাজিক প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার ছক এঁকে ছিলেন এবং মুক্ত বাংলার মাটিতে তা বাস্তবায়ন করার কাজে আত্মনিয়োগ করে ছিলেন, তা যখন সাম্রাজ্যবাদ ও তার এদেশী দুর্বৃত্তচক্রের কারসাজিতে বানচাল হতে লাগলো, তখনি তিনি দেশী-বিদেশী ঐ সব চক্রের মোকাবিলা ও বাঙালি জাতির সার্বিক কল্যাণে এবার এক চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। প্রকৃত আর্থসামাজিক মুক্তির চ্যালেঞ্জ, প্রকৃত গণতান্ত্রিক সাম্যবাদী সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার এক বৈপ্লবিক চ্যালেঞ্জ, 'দ্বিতীয় বিপ্লব' বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ। সর্বাত্মক বিপ্লবের এক কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারি শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন ঘটিয়ে প্রথমে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার এবং ২৪শে ফেব্রুয়ারি 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' বাকশাল নামক একক জাতীয় দলীয় ব্যবস্থার প্রচলন ঘটালেন।

ঐ কর্মসূচিকেই 'দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি' বা 'শোষিতের গণতন্ত্র' বলে আখ্যায়িত করা হলো। বঙ্গবন্ধু এ কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলার মাটি থেকে সাম্রাজ্যবাদের কালো থাবা ও তাদের সেবাদাস স্বাধীনতাবিরোধী পুঁজিবাদী প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিবিপ্লবী ও সর্বস্তরের দুর্নীতিবাজদের উৎখাত করে বাংলার শোষিত ভাগ্যাহত মানুষের সার্বিক রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন।

দ্বিতীয় বিপ্লবের রাজনৈতিক আর্থসামাজিক প্রশাসনিক ও এর সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য কর্মসূচির সমন্বিত একক ব্যবস্থাকে বঙ্গবন্ধু অভিহিত করেছিলেন 'শোষিতের গণতান্ত্রিক একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা' রূপে। এ ব্যবস্থায় দেশী-বিদেশী সর্বপ্রকার শোষণ ও প্রতিপত্তিকে চিরতরে উৎখাতের আয়োজন করা হয়েছিলো।

কিন্তু যে শোষিত নিপীড়িত বৃহত্তম সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু বাকশাল কর্মসূচি প্রদান করেছিলেন তার অন্তর্নিহিত ভাবধারা ঐ শোষিত নিপীড়িত মানুষ কতোটুকু অনুধাবন করতে পেরেছিলো জানি না, তবে দেশীয় উঠতি শোষক কায়েমী স্বার্থান্বেষী স্বাধীনতাবিরোধীচক্র ও আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদী শক্তি ঐ কর্মসূচির মধ্যে তাদের মৃত্যুবীজ আবিষ্কার করেছিলেন। তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, শেখ মুজিব তাদের বিষদাঁত উপড়ে ফেলার ব্যবস্থা করছেন। ফলে তারা শংকিত হয়ে পড়ে। বাংলাদেশে তারা তাদের শোষণ-প্রভাব-প্রতিপত্তিকে প্রবহমান রাখার লক্ষ্যে, তথা প্রবলভাবে তাদের অবস্থান সংহত করার লক্ষ্যে তারাও চরমতম চক্রান্তের অন্ধগলিতে আশ্রয় নেয়। ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের জাল বিস্তার করে অবশেষে মুজিবের বিরুদ্ধে

তারা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এক ভাড়াটিয়া অস্ত্রধারী দুস্কৃতকারীদের লেলিয়ে দেয়। বঙ্গবন্ধু নিহত হলেন। সামরিক জান্তার শাসনের নামে মূলতঃ দেশের সকল ক্ষমতা চলে যায় ঐ কায়েমী দেশী-বিদেশী শোষক-প্রতারক-লুটেরা ও স্বাধীনতাবিরোধীচক্রের কালো হাতের মধ্যে। কী সেই হত্যাকাণ্ডের মধ্যে ঐ চক্রের নিষ্ঠুরতম জিঘাংসা যে, বঙ্গবন্ধুর সাথে তাঁর স্ত্রী-পুত্র-পুত্রবধূসহ তাঁর ৮ বছরের মাসুম বাচ্চা রাসেলও তাদের হাত থেকে রেহাই পেল না! সেই সাথে ঐ একই দিন নিহত হলেন তাঁর ভগ্নিপতি মন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাত, ভাগ্নে যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মনি ও তাঁদের পরিবার-পরিজন এবং বঙ্গবন্ধুকে রক্ষা করতে এগিয়ে-আসা তাঁর সামরিক সচিব কর্নেল শাফায়াত জামিল। বিদেশে অবস্থানের কারণে বেঁচে গেলেন বঙ্গবন্ধুর দু'কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা।

এমনিভাবে কিংবদন্তীর মহানায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জীবনের করুণ যবনিকাপাত সংঘটিত হলো।

বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধবিরোধী সামরিক-বেসামরিক আমলাচক্রের কার্যকলাপ

বঙ্গবন্ধুর ভাবমূর্তি খর্ব, তাঁকে হেয় ও তাঁর সরকারকে জনবিচ্ছিন্নকরণের চক্রান্তে লিপ্ত থাকা সামরিক-বেসামরিক প্রশাসনের স্বাধীনতাবিরোধী গণবিরোধী পাকিস্তানিমনা আমলাচক্রের কার্যকলাপ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর নির্লিপ্ততা সত্যিই বেদনাদায়ক। ঐ চক্রটি সচিবালয় ও ডিজিএফআই দপ্তরের সুরম্য অট্টালিকার শীতাতপ কক্ষে বসে বসে দিনের পর দিন বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে চক্রান্তের জাল বুনেছে। তারা প্রশাসনের অভ্যন্তরে তাদের অনুসারী, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী, ধর্মীয় রাজাকারচক্র, অসৎ ব্যবসায়ী, সাবেক শিল্পপতি, উঠতি ধনিকশ্রেণী, সকল স্তরের বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতাবিরোধী দুষ্কৃতকারীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে নানান মিথ্যাচার-অপপ্রচারণা, অন্তর্ঘাত, লুটপাট, রাহাজানি, গুম-হত্যাযজ্ঞ, চোরাচালানি, মজুদদারী, চুরি-ডাকাতি নারীধর্ষণ ইত্যাকার জঘন্য কার্যকলাপ চালিয়ে সাধারণ্যে সার্বিক ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সরকারকে ব্যর্থ করার অপপ্রয়াস চালায়। এসবের মধ্য দিয়ে একটা বিশৃংখল পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করাই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। গোটা পাকিস্তান আমলে এই গণবিরোধী আমলাচক্র সর্বসময় ক্ষমতার অধিকারী ছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তথা বঙ্গবন্ধু-আওয়ামী লীগই প্রথমবারের মতো সেই ক্ষমতা থেকে তাদেরকে উচ্ছেদ করেছে। এ কারণেই তাদের যাবতীয় গোস্বা ও বিদ্বেষ তাই মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে। অপরদিকে মুক্তিযুদ্ধের সময় তাদের সার্বিক পরাজয়ের গ্লানিতেও তারা ছিল আচ্ছন্ন। সেই পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণে তাই তারা ছিল সদা তৎপর। স্বাধীনতার পর কিছুদিন মুক্তিযোদ্ধাদের ধাক্কা সামলে কোনপ্রকার প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকার মধ্য দিয়ে সময় ও সুযোগ মতো অত্যন্ত পরিকল্পিত উপায়ে কার্যক্রমে নেমে পড়ে। দেশীয় স্বাধীনতাবিরোধীচক্রসহ তাদের বৈদেশিক প্রভুরা তাদের পেছনে যাবতীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে। তারই পর্যায়ক্রমিক চক্রান্তের ফলশ্রুতিতে অত্যন্ত সূক্ষ্মতার সাথে সৃষ্টি হলো ১৯৭৪ সালে এক দুর্ভিক্ষ। এবং একই চক্রান্তের ধারাবাহিকতায় সংঘটিত হলো ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড ও আওয়ামী লীগের ক্ষমতাচ্যুতি।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সামরিক-বেসামরিক আমলাদের অধিকাংশই অংশগ্রহণ করেননি। সামরিক বাহিনীর (পাকিস্তানি) বাঙালি অফিসারদের মধ্যে সম্ভবত শতকরা ১০% এবং বেসামরিক অফিসারদের মধ্যে শতকরা ৩০% ভাগ মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এদের মধ্যে কিছুসংখ্যক যুদ্ধের ময়দান থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করেছিলেন। আবার কিছুসংখ্যক প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে।

স্বাধীনতার পর প্রশাসন চালু হলো। পাকিস্তান থেকে সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ফিরে এলেন। দেখা গেল সামরিক-বেসামরিক উভয় অঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধা-অমুক্তিযোদ্ধাদের অনুপাত সম্ভবত ৩ ঃ ৯৩! ঐ অমুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে আমলাচক্রের প্রকৃত হোতাদের অবস্থান ছিল, যারা ছিল মনে-প্রাণে পাকিস্তানি এবং বঙ্গবন্ধু-আওয়ামী লীগ বিরোধী। এদের সাথেই পাকিস্তান, সৌদি আরব, চীন ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যোগাযোগ ছিল।

স্বাধীনতার পর বিভিন্ন তত্ত্বাবিজ্ঞমহল থেকে এদের সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুকে সাবধান করে দেয়া হয়েছিল। তাঁরা ঐসব মতলববাজদের চাকরি থেকে অবসর দেয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। স্বাধীনতার পর তাদের চক্রান্তমূলক কার্যকলাপ তথা ৭৪ এর দুর্ভিক্ষ ও আইন শৃঙ্খলার অবনতি বিষয়ে এদের সংশ্রব, তাঁর ইমেজ খর্ব ও তাঁর সরকারকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্রে এদের জড়িত থাকার খবরাখবর বঙ্গবন্ধুর কাছে এসে পৌঁছলেও তিনি সেসবকে নির্বিকার চিত্তে হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর বিশাল পিতৃহৃদয়ের স্নেহশীলতা ও পরমতম আস্থাশীলতা তাঁকে যেন অন্ধ করে রেখেছিল। ৭৪-এর দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির অন্যতম প্রধান নায়ক খাদ্যসচিব আবদুল মোমেন খান ও খাদ্য সাইলো পরিচালক মারুফ মোরশেদের চক্রান্তের বিষয়ে আমি (লেখক) নিজেও বঙ্গবন্ধুকে অবহিত করেছিলাম। আমি তখন সাইলোতে একজন তদারককারী হিসেবে কর্মরত ছিলাম। ঐ দুই দুর্নীতিবাজসহ অন্যান্য স্তরের মতলববাজদের সম্পর্কে কেউ বঙ্গবন্ধুর কাছে নালিশ জানালে প্রায়শই তিনি হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, 'ও ঠিক হয়ে যাবে, ওরা ভুল বুঝতে পারবে। ... ওরাও তো আমার বন্ধু, এমনকি সন্তানতুল্য।... ওরা কি বোঝে না যে, পাকিস্তান থাকলে ওরা বড় জোর সেকশন অফিসার/ডেপুটি সেক্রেটারী পর্যন্ত হতে পারতো। একজন আর্মির লোক মেজর/কর্নেল হতে পারতো। তারপর বলতো, আচ্ছা এবার বাড়ি যাও, আচ্ছা এবার এবাউটটার্ন হও। এখন ওরা সচিব হচ্ছে, জেনারেল হচ্ছে।..... ।' এ জাতীয় মন্তব্য আমি নিজেও শুনেছি।

কিন্তু 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী'। ঐ চক্রটি তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অঙ্গ বিদেশীশক্তির দালালি, দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে তাদের অনুচরগিরির লাইসেন্স নেয়ার কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়ে। বিনিময়ে লাভ করে অঢেল অর্থ। এরা মানুষ নামধারী এক পৈশাচিক বিকৃত মানসিকতাসম্পন্ন গণবিরোধীচক্র, যাদের মধ্যে দেশপ্রেম, মানুষসেবা ও সমাজকল্যাণের কোনো লেশমাত্র নেই। এদের কাছে ক্ষমতা, অর্থ, লাল-নীল পানীয় ও নারীভোগই প্রথম ও শেষ চিন্তা-ধ্যান ও সাধনা।

এ জাতীয় একটি ভয়াবহ দানবচক্রের সম্পর্কে বিপুল অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিপ্লবী ডঃ ফিদেল ক্যাস্ট্রো একদা বঙ্গবন্ধুকে বলেছিলেন ঃ 'বন্ধু, তুমি ওদেরকে চেনো না, আমি চিনি। ওরা তোমাকে, তোমার দেশের সর্বনাশ করে ছাড়বে। তোমার প্রশাসনের খোল-নলচে সব গিলে খাবে।...বন্ধু, একবার কি ভেবে দেখেছো তুমি কী করেছো? তুমি একটি বিজয়ী প্রশাসনকে (মুজিবনগর প্রশাসন) পরাজিত (পাকিস্তানি প্রশাসন) প্রশাসনের কাছে ছেড়ে দিয়েছো।... ঝেঁটিয়ে বিদায় করো ঐ পাকিস্তানি জঞ্জাল। নইলে ওরা তোমাকেই আঘাত করবে, তোমার দেশবাসীকে গ্রাস করে ফেলবে।'

প্রত্যুত্তরে বঙ্গবন্ধু বলেন ঃ 'ক্যাস্ট্রো, আমি প্রতিহিংসা-প্রতিশোধে বিশ্বাসী নই। আমি মার্কসবাদী বিপ্লবী নই। আমি রবীন্দ্রনাথের মানসে গড়া এক কোমল হৃদয়ের বাঙালি।... রবীন্দ্রনাথ শিখিয়েছেন, মানুষের প্রতি বিশ্বাস রাখো। আমি সেই বিশ্বাস আর ভালবাসা দিয়ে সকল হৃদয়কে জয় করতে শিখেছি। ... আমি আমার মানুষকে ভালবাসি।.... ওরাই আমাকে বন্ধু-পিতার আসনে বসিয়েছে। পিতা হয়ে, বন্ধু হয়ে কারো প্রতি আমি নিষ্ঠুর হতে পারি না। হোক তারা অবাধ্য, হয়তো বা না বুঝে, কিছু লোভের বশে অন্যায় করে যাচ্ছে, কিন্তু ওরাও তো মানুষ, একদিন সব বুঝবে, সুযোগ দিচ্ছি বুঝবার জন্যে।...' (একদল বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিক সাংবাদিকদের সাথে ৭৪-এর শেষদিকে আলাপচারিতায় এ কথাগুলো বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন। সেখানে আমিও উপস্থিত ছিলাম)।

পিতৃতুল্য মহান বঙ্গবন্ধুর অপার কৃপায় উদারতায় বদান্যতায় ওরা, আমলারা, পাকিস্তানি দালালরা জীবন পেয়েছে, ছায়া পেয়েছে, চাকরি পেয়েছে, অপরাধের ক্ষমা পেয়েছে। তাদের প্রতি কী তাঁর আস্থা, কী তাঁর বিশ্বাস, কী তাঁর ভালবাসা ও মমত্ববোধ। ভাবলেই অবাক হতে হয়। কিন্তু প্রতিদানে তিনি কি পেয়েছেন? তারা বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে, বাঙালি জাতির বিরুদ্ধে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরুদ্ধে, স্বাধীনতার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে শুধুমাত্র অর্থ ও ক্ষমতার লালসায়।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুক্তিযুদ্ধ তথা বিপ্লবের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে যে, মুক্তিযুদ্ধ-বিপ্লবের বিরোধিতা করা, বানচাল করা, প্রতিবিপ্লব ও প্রতি-আক্রমণ করা, বিপ্লবের থেকে দূরে থাকা, বিরোধীশক্তিকে যে-কোনভাবে সহায়তা করা, হত্যা, ধ্বংস প্রভৃতি কার্যকলাপকে যুদ্ধাপরাধের সামিল হিসেবে গণ্য করে তাদেরকে চিরতরে উচ্ছেদ করা হয়েছে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তাদেরকে উচ্ছেদ তো করেনইনি, উপরন্তু তাদেরকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক স্তরেও নিয়োগ করেছেন, বহাল রেখেছেন, পদোন্নতি দিয়েছেন। তিনি তাঁর হৃদয়ের চিরাচরিত উদারতা দিয়ে, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের দ্রুত সার্বিক পুনর্গঠনের লক্ষ্যে তাদেরকে ক্ষমা করেছিলেন এই ভেবে যে, ওরা অভিজ্ঞতায়-মেধায় সমৃদ্ধ। এই মানবিক ও বিচক্ষণ মূল্যায়ন থেকেই বঙ্গবন্ধু তাদেরকে বুকে টেনে নিয়েছিলেন। তিনি নিজের স্বার্থ, ক্ষমতা ও নিরাপত্তার কথা ভাবলে প্রথম সুযোগেই তাদেরকে উৎখাত করতে পারতেন। করেননি। দেশের প্রয়োজনের কথা ভেবে করেননি। তাদের অভিজ্ঞতা-মেধাকে দেশের কাজে লাগানোর চিন্তা থেকেই এ আত্মঘাতি ক্ষমা প্রদর্শন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর পরম স্নেহ বিশ্বাস ও আস্থায় লালিত সেই সামরিক-বেসামরিক দালাল আমলারা চক্রান্ত করে ৭৪-এর দুর্ভিক্ষ ডেকে এনেছে, ৭৫ সালে তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করার পথ প্রশস্ত করেছে। একেই বোধহয় বলে নিষ্ঠুর নিয়তি। বঙ্গবন্ধুকে এভাবে সরিয়ে দিয়ে সেই আমলারা নিজেদের মধ্যে অর্থ-সম্পদ লুটপাট ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে ভাগাভাগি করে নিয়েছে। জীবনে যিনি যা কল্পনাও করেননি, বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তা-ই হতে পেরেছেন; অবাধে যা-ইচ্ছে তা-ই করে যাচ্ছেন; দেশটাকে নিজেদের পৈতৃক সম্পত্তিতে পরিণত করেছেন। আজীবন লালিত অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করেছেন।

এক্ষণে আমরা ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ সৃষ্টিকারী কতিপয় বেসামরিক-সামরিক কর্মকর্তাদের কার্যকলাপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি।

আব্দুল মোমেন খান নামক একজন সাবেক ইপিসিএস ছিলেন ১৯৭৪ সালে খাদ্য ও বেসামরিক চলাচল মন্ত্রণালয়ের সচিব। এই মোমেন খান ছিলেন একদা সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর কুখ্যাত আবদুল মোনায়েম খানের একান্ত সচিব। একটি কট্টর মুসলিম পরিবারে মোমেন খানের জন্ম। ১৯৭১ সালে তিনি ছিলেন পাকবাহিনীর একজন বিশ্বস্ত দালাল। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর উদারতায় অন্যান্য দালাল অফিসারদের মতো তিনিও চাকরিতে বহাল হন। তিনি ছিলেন কোলকাতায় বঙ্গবন্ধুর সহপাঠী। বঙ্গবন্ধু পুরাতন

সম্পর্কের কারণে, তাকে নিজের লোক মনে করে, পরম আস্থার সাথে সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব বানিয়ে ছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে মোমেন খান অন্তত বন্ধুত্বের প্রতিদানে তাঁর আস্থাকে সম্মান করবেন।

কিন্তু 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী'– এই সনাতন কুনীতির ধারক পাকদালাল মোমেন খান বঙ্গবন্ধুর আস্থাকে সম্বল করে অত্যন্ত সুকৌশলে তাঁর সরকারের ইমেজ ধ্বংস করার চক্রান্তে মেতে ওঠেন। দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে হাত মিলিয়ে তিনি দুর্ভিক্ষ সৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছিলেন। তাকে ৭৪-এর দুর্ভিক্ষের দেশীয় মহানায়ক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পাকিস্তানি ও সিআইএর চর মোমেন খানের কার্যকলাপ নিম্নরূপ ঃ

মোমেন খান তার চক্রান্ত বাস্তবায়নের জন্যে তার বহুদিনের সহচর ও কুকর্মের সাথী, ভারত প্রত্যাগত ময়নুল হক নামক একজন সেকশন অফিসারকে তার একান্ত সচিব নিয়োগ করেন। ময়নুল হকও ছিলেন একজন পাকিস্তানি দালাল। ময়নুল হকের কাজ ছিল খাদ্য প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের পাক অনুচরদের খুঁজে বের করা এবং মোমেন খানের কাছে নিয়ে আসা। এ পর্যায়ে খাদ্য প্রশাসনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ সাইলো পরিদপ্তরের ডেপুটি ডাইরেক্টর ইঞ্জিনিয়ার মারুফ মোরশেদের সাথে মোমেন খানের সংযোগ ঘটে। গোটা খাদ্য বিভাগের পাকদালাল তথা মুক্তিযুদ্ধবিরোধীদের নেতৃত্বে ছিলেন ঐ মারুফ মোরশেদ। মারুফ মোরশেদ ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পুরো নয় মাস পাকসরকারের চাকরি করেছেন, পাকবাহিনীকে খাদ্যশস্য সরবরাহ করেছেন। তিনি ছিলেন আবার দুর্ধর্ষ আলবদর বাহিনীর সক্রিয় সদস্য। মুক্তিযুদ্ধে যে-সকল কর্মচারী অংশ নিয়েছিলেন, তিনি তাদের নাম-ঠিকানা পাকবাহিনীকে সরবরাহ করেন। খাদ্য-সাইলোর মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক-সাহায্যকারীদের পাকবাহিনীর হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন, চাকরিচ্যুত করিয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধা বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডেও তিনি সক্রিয় ভূমিকা রাখেন বলে জানা যায়।

মারুফ মোরশেদের আলবদরী-রাজাকারী কার্যকলাপের একটা বিবরণ দিয়েছেন সাইলোর একজন সুপারভাইজার আবদুল খালেক খান। আবদুল খালেক ঐতিহাসিক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কথিত কমান্ডো বাহিনীর সদস্য ছিলেন। তিনি জানিয়েছেন, 'চট্টগ্রাম সাইলোতে কর্মরত ছিলাম। ১৯৭১-এর মার্চে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করি। ২৬, ২৭ মার্চ পাকবাহিনী চট্টগ্রামে নারকীয় গণহত্যা চালানো শুরু করলে পায়ে হেঁটে পালিয়ে ঢাকায় চলে আসি। মার্চ মাসের বেতন তুলতে

পারিনি। পরিবারে অর্থসংকট চলছে। ভাবলাম বেতনের টাকাটা তুলে আনতে পারলে তা বাসায় দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে ভারতে চলে যাবো। ঢাকার সাইলো প্রধান কার্যালয়ে টেলিফোন করে ডেপুটি ডাইরেক্টর মারুফ মোরশেদকে পেলাম। মার্চ মাসের বেতনটা ঢাকাতেই পাওয়া যাবে কিনা জিজ্ঞেস করতেই তিনি জানালেন যে, পাওয়া যাবে। তিনি পরের দিন সকাল ৮ টায় অফিসে যেতে বললেন।

সেদিন ছিল ১৭ এপ্রিল। অফিসে গিয়ে মারুফের সাথে দেখা করলাম। সেখানে আরো দেখতে পেলাম সাইলো সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার ফজলে রাব্বী, ইএমই আনিসুজ্জামান ও ম্যাকানিক্যাল ফোরম্যান আফতাবকে। আমরা সকলে যখন মারুফের কক্ষে অবস্থান করছিলাম, হঠাৎ সেখানে এসে হাজির হলো পাকসৈন্য ও পুলিশের একটি দল। আমাদের চারজনকে মারুফ পাকসৈন্যদের হাতে সোপর্দ করলেন। আমি ও আফতাব, আমরা সাধারণ কর্মচারী, মারুফের ইংগিতে কিনা জানি না, আমাদের দুজনকে মুক্তিবাহিনী বলে গালাগাল করে রাইফেলের বাট দিয়ে বেদম প্রহার করে। তারপর গাড়িতে উঠায়। সেই ৩৭-৩৮ বছর আগের প্রহারের বেদনা এখনও আমার মাজা ও পিঠে লেপটে রয়েছে।

পাকবাহিনী আমাদের তেজগাঁও বিমান বন্দরে নিয়ে গেল। আমাদের হাতকড়া পরানো হয়েছিল। সেখান থেকে সোজা পতেঙ্গা। পতেঙ্গা নামতেই পাক-নৌবাহিনী আমাদেরকে পেটাতে পেটাতে নিয়ে গেল নৌঘাঁটিতে। প্রতিদিন আমাদেরকে তারা সাইলোতে নিয়ে যেতো, সাইলো অপারেট করে খাদ্যশস্য সরবরাহ করানো হতো, আবার নিয়ে আসতো ঘাঁটিতে। নৌবাহিনী দিনের পর দিন আমাদের ওপর যেভাবে অত্যাচার নির্যাতন করতো তা আজো আমার চোখে বিভীষিকাময় হয়ে আছে। ...

দেশ স্বাধীন হওয়ার সাথে সাথে দেখা গেল মারুফ মোরশেদ লম্বা লম্বা চুল আর দাঁড়ি দিয়ে এক্কেবারে পাক্কা মুক্তিযোদ্ধা সেজে গেলেন। তার অন্যান্য সহযোগীদেরও একই অবস্থা।...

কুমিল্লার প্রভাবশালী নেতা খোন্দকার মোশতাক, কাজী জহিরুল কাইউম, মিজানুর রহমান চৌধুরী, তাহেরউদ্দিন ঠাকুরের সাথে দেখা গেল মারুফের দারুণ সখ্যতা। তাদেরই ছত্রছায়ায় অল্পকালের মধ্যে মারুফ পুনরায় স্বমূর্তিতে আবির্ভূত হলেন। সাইলোকে ব্যক্তিগত লুটপাটের কারখানা বানিয়ে নিজের সহযোগী, আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে স্বর্গরাজ্য তৈরি করলেন। বেছে বেছে চাকরিচ্যুত করে নিজ জেলার লোকদের সরকারী কোটা ভেঙে নিয়োগ করা শুরু করলেন। স্বাধীনতার দুই বছরের মধ্যে এভাবে দেখা গেল সাইলো কর্মচারীদের শতকরা ৭০% ভাগই তার কুমিল্লা জেলার লোক, যারা

তারই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন। আমার চাকরিটাও কায়দা করে খেয়েছেন ঐ মারুফ মোরশেদ। তারপরই শুরু হলো মারুফের চক্রান্ত। মোমেন খানের সাথে মিলিত হয়ে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির চক্রান্ত।...

ভাবতেই পারি না, আমরা মুক্তিযোদ্ধারা আজ রাস্তায় সর্বহারার মতো ঘুরছি, আর ঐ আলবদর-রাজাকার মারুফ মোরশেদরা আমাদের ত্যাগের ওপর দাঁড়িয়ে বহাল তবিয়তে দুর্নীতি আর চক্রান্তের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা কামিয়ে দেশটাকে ভোগের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করেছেন। এর কি কোনো প্রতিকার হবে না?

১৯৭৪ সালের প্রারম্ভে স্বাধীনতাবিরোধী, প্রতিক্রিয়াশীলচক্র, প্রতিবিপ্লবী জাসদ, সর্বহারা ও পলাতক আলবদর-রাজাকার, অন্যান্য স্তরের দুর্নীতিবাজ ও প্রশাসনিক আমলাদের কারসাজিতে প্রশাসন অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়ে। এ সুযোগে মারুফ মোরশেদ ও তার সহযোগীরা খাদ্য বিভাগের মুক্তিযোদ্ধা ও সৎকর্মচারীদের চক্রান্ত করে চাকরিচ্যুত করতে থাকে। এসব দেখে এবং পূর্বাপর তার কার্যকলাপের প্রমাণ পেয়ে খাদ্যসচিব মোমেন খান মারুফকে কাছে টেনে নেন। ১৯৭৪ সালের প্রথম দিকে অতি কলাকৌশল ও চক্রান্তের বেড়াজালে অত্যন্ত সৎ ও প্রতিভাবান ইঞ্জিনিয়ার সাইলো পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমানকে চাকরি থেকে সরিয়ে দিয়ে মোমেন খান মারুফকে ভারপ্রাপ্ত সাইলো পরিচালক করেন। মারুফের এই পদোন্নতির পেছনে ছিল তার আত্মীয় মন্ত্রী খোন্দকার মোশতাকের আশীর্বাদ। মারুফের চেয়ে সিনিয়র ও প্রতিভাবান আরো ২-৩ জন ইঞ্জিনিয়ার থাকলেও 'মামার জোরে' ও চক্রান্তের হোতা মোমেন খানের কারণে তাকেই সাইলো পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়।

মারুফ মোরশেদ বঙ্গবন্ধু-খুনী কর্নেল খোন্দকার রশিদের এককালীন সহপাঠী ছিলেন। পারিবারিকভাবে তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাও ছিল। রশিদের মামা মোশতাক। সেই সুবাদে মারুফও মোশতাককে মামা বলে সম্বোধন করতেন বলে একটি সূত্রে জানা যায়। এভাবেই মারুফ মোশতাকের আশীর্বাদ পেয়ে যান। এভাবেই মোশতাক রশিদ-ফারুকের সাথে মারুফের সংযোগ ঘটে। তাদের সাথে যোগ দিলেন খাদ্যসচিব মোমেন খান। এবং শেষ পর্যায়ে এই চক্রের সাথে জেনারেল জিয়ার সংযোগ ঘটে। এ বিষয়ে পরে আসছি।

খাদ্য প্রশাসনের মোমেন-মারুফচক্র কিভাবে খাদ্যশস্য নিয়ে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টিতে ভূমিকা পালন করেছিলেন তার সামান্য বিবরণ দিয়েছেন খাদ্য অধিদপ্তরের সাবেক ও বতর্মান কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। এদের অধিকাংশই মুক্তিযোদ্ধা। তাদের বক্তব্যে জানা যায়, দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির আগে ও পরে সরকারী

খাদ্য গুদাম তথা ৪টি সাইলো, ১২টি সিএসডি ও কয়েক শত এলএসডি গুদামে ৬ লক্ষ টন খাদ্যশস্য মজুদ ছিল। ঐ মজুদ খাদ্যশস্য দিয়ে দেড়-দুই মাসকালীন দুর্ভিক্ষকে সহজেই মোকাবেলা করা যেতো। সঠিক সময় ও স্থানে ঐ খাদ্যশস্য সরবরাহ করলে সংকট পুরোপুরি মোকাবিলা করা না-গেলেও অত লোকের মৃত্যু হতো না।

মোমেন-মারুফচক্র প্রথমতঃ পরিবহনের অপ্রতুলতার দোহাই পেড়ে খাদ্যশস্য সরবরাহে বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয়তঃ যা-ও-বা সরবরাহ করা হতো তার মধ্যেও ছিল নানান চক্রান্ত। যেমন যেখানে খাদ্যশস্য জরুরি প্রয়োজন সেখানে না পাঠিয়ে অপ্রয়োজনীয় স্থানে পাঠিয়ে দুর্ভিক্ষকে চাঙ্গা করা হয়। মালামাল পাঠানোর ব্যাপারে মোমেন-মারুফ তাদের সহযোগী ডিসি/এসসি/এসি ফুড-দের দিয়ে ডিও তৈরি করে পাঠাতো। এই ডিও-এর মধ্যে ছিল ঘাপলা। খাদ্যশস্য সরবরাহের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা ঐ ডিও অনুসরণ করতেন। ডিও তৈরি করে পাঠানো হতো, দেখা যেতো যেখানে মানুষ খাদ্য সংকটে পতিত, সরকারী নীতিমালায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেসব স্থানে পাঠানোর বদলে অপ্রয়োজনীয় স্থানের ওপর ডিও আসতো।

তৃতীয়তঃ দেশের বিভিন্ন স্থানে রেল-নৌ-স্থলযানে খাদ্যশস্য প্রেরণ করা হলেও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যেতো পথিমধ্যে সর্বহারা-জাসদ ও ডাকাতদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিয়ে মোমেন-মারুফের মনোনীত পরিবহন ঠিকাদাররা তা আত্মসাত করে নিয়ে যেতো। তাদের বিরুদ্ধে কোনোই ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। নামকাওয়াস্তে থানায় ডায়েরী করা হয়েছে, আর দোষ দেয়া হয়েছে সর্বহারা-ডাকাতদের ওপর। এভাবে তারা আসলে ঠিকাদারদের কাছ থেকে মোটা অংকের ভাগ পেয়েছে। বিশেষ করে নদীপথে নৌকোয় মালামাল প্রেরণের সময় মালামাল পাচার করে দিয়ে নৌকো ডুবিও দেখানো হয়েছে। গন্তব্যস্থানে খাদ্যশস্য এজন্যে পৌঁছায়নি। অপরদিকে বিশেষ করে মারুফের সহযোগী কিছু কর্মচারী ১৯৭৪ সালে নারায়ণগঞ্জ সাইলো থেকে হাজার হাজার টন খাদ্যশস্য কালোবাজারে পাচার করেছে, সেই পাচারের মালামালে যাতে ঘাটতি ধরা না পড়ে তার জন্যে মাঝে-মধ্যে নষ্ট মালামালের তালিকা তৈরি করেছে, নষ্ট মালামাল নদীতে ফেলে দেয়া হয়েছে, এমনতর ভুয়া প্রতিবেদন তৈরি করে হিসেবের মধ্যে রেখে দেয়া হয়েছে। এ ব্যতীত দিনে-দুপুরে পুকুর চুরির মারাত্মক ঘটনাও ঘটেছে। যেমন সরবরাহকৃত হাজার হাজার টন গমের শত শত বৈধ চালান অফিস থেকে চুরিও হয়েছে, সেই সাথে ঐ হাজার হাজার টন গম আত্মসাতও করা হয়েছে।

খাদ্য গুদামে ও পরিবহন ব্যবস্থার মধ্যে শক্তিশালী নিরাপত্তা বাহিনী ব্যবহার করা হলেও 'সরিষার মধ্যে ভূতের' ব্যাপার ঘটে। এমনও ঘটনার কথা শোনা যায় যে, বার্জে মালামাল যাচ্ছে, পাহারা দিচ্ছিলো নিরাপত্তা বাহিনীর লোকেরা। নদীর মধ্যে চোরাকারবারীদের কাছে গম বিক্রি করে দিয়ে সহসা তারা তুমুল গোলাগুলি শুরু করে দিল। গোলার আঘাতে দুটি বার্জের একটি আস্তে আস্তে পানিতে ডুবে গেল। থানায় ডায়েরী করা হলো যে, দুষ্কৃতকারীরা গম অপহরণ করতে এসে গোলা ছুঁড়েছে, ফলে বার্জটি ডুবে গেছে। স্রোতের তোড়ে মালামাল ভেসে গেছে। ইত্যাদি।

এসবের মধ্যেও ছিল মোমেন-মারুফের কারসাজি। বিশেষ করে ঐ নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে মারুফের চক্রান্ত কাজ করেছে।

১৯৭৪ সালে মেজর ইকবাল হোসেন চৌধুরীর নেতৃত্বে একদল সেনাবাহিনীকে সাইলোর নিরাপত্তার দায়িত্ব দেয়া হয়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক খাদ্য বিভাগের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন যে, মেজর ইকবাল খাদ্যশস্য নিরাপত্তার দায়িত্ব ও খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কে এতই পারদর্শিতা (!) অর্জন করেছিলেন যে, বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম একজন মেজরকে খাদ্য উপমন্ত্রী বানিয়েছিলেন আর খাদ্যসচিব মোমেন খানকে করেছিলেন খাদ্যমন্ত্রী। ১৯৭৪-এর খাদ্যসচিব মোমেন খানকে খাদ্যমন্ত্রী বানিয়ে পুরস্কৃত করেই বিএনপির মনের খায়েশ মেটেনি। তারই ধারাবাহিকতায় খালেদা জিয়া সরকার মোমেন-পুত্র মঈন খানকে মন্ত্রী বানিয়ে জিয়া বংশপরম্পরার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং মোমেন পরিবারকে পুরস্কৃত করেন। এতেই বুঝা যায় যে, ১৯৭৪-এ মোমেন খান বিএনপির জন্যে কী কাজটি করেছিলেন। এসব কিসের আলামত? কারণ মোমেন খান ও মেজর ইকবাল অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দুর্ভিক্ষকে বাংলাদেশে সয়লাব করে দিয়ে বঙ্গবন্ধুর ইমেজ ধ্বংস করে ছিলেন বলেই জিয়াচক্রের পক্ষে তাঁকে হত্যা করার পথ প্রশস্ত হয়েছিল। মেজর ইকবাল ছিলেন সেনাবাহিনী উপপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়ার একজন বিশ্বস্ত স্টাফ অফিসার। ১৯৭৪ সালে কৌশলে জিয়া মেজর ইকবালকে খাদ্য বিভাগে পাঠান। ফলে মেজর ইকবাল জিয়ার-মিশন সাকসেসফুল করতে মোমেন-মারুফের সাথে হাত মেলান। তারই পুরস্কার হিসেবে মোমেন-ইকবালকে মন্ত্রিত্ব পদে জিয়া অধিষ্ঠিত করেছিলেন। মেজর ইকবালকে পরবর্তীকালে জেনারেল এরশাদও খাদ্যমন্ত্রী বানিয়েছিলেন। এরশাদের পতনের পর খালেদা জিয়া সরকার তার বিরুদ্ধে ২ লক্ষ টন থাই চাল ক্রয়ের দুর্নীতির অভিযোগে মামলা করেছিলেন। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে সেই মামলার আর কোন খবর নেই।

মূলতঃ সামরিক বাহিনীর উচ্চাভিলাষীচক্রের সাথে দেশী-বিদেশী চক্রান্তের ধারাবাহিকতায় মোমেন-মারুফচক্রের সংযোগ গড়ে ওঠে এবং তারা একত্রে মিলেমিশে বঙ্গবন্ধু-আওয়ামী লীগকে হেয় ও দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে উৎখাতের জন্যে নানাভাবে চক্রান্তের জাল বুনেছিল।

জেনারেল জিয়ার খাদ্যমন্ত্রী মোমেন খান ও মেজর ইকবাল তাদের চক্রান্তের প্রধান কার্যনির্বাহী মারুফ মোরশেদকে এবার সাইলো পরিচালক পদে পদোন্নতি দিলেন। ১৯৭৪-এর দুর্ভিক্ষের অন্যতম প্রধান হোতা ও বিশাল আত্মসাত-দুর্নীতির নায়ক মারুফ মোরশেদ প্রশাসনিক মহলে 'কোটিপতি কর্মকর্তা' হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন। ১৯৯২ সালের এপ্রিল পর্যন্ত তিনি খাদ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক হিসেবে দোর্দণ্ডপ্রতাপের সাথে বহাল ছিলেন। তার বিরুদ্ধে বহু লোমহর্ষক আত্মসাত ও দুর্নীতির অভিযোগ খাদ্য মন্ত্রণালয়সহ দুর্নীতি দমন বিভাগ ও অন্যান্য সরকারী উচ্চস্তরে স্তূপীকৃত অবস্থায় জমা থাকলেও কোটি টাকা ও খুঁটির জোরে সব কিছুই চাপা পড়ে আছে। ১৯৯২ সালের এপ্রিল মাসে খালেদা সরকারের সাবেক প্রতিমন্ত্রী নূরুল হুদার কৃপায় মারুফ মোরশেদ নিয়ম-কানুন ছাড়াই সরকারের যুগ্মসচিব পদে পদোন্নতি পেয়ে যান। পরে সংস্থাপন মন্ত্রণায়ে নিয়োজিত হন। উল্লেখ্য যে, সাবেক প্রতিমন্ত্রী নূরুল হুদা ও মারুফ মোরশেদের গ্রামের বাড়ি চাঁদপুর জেলায় এবং তারা পারস্পরিক আত্মীয়ও বলে জানা যায়। ফলে তার বিরুদ্ধে বহু মারাত্মক অভিযোগের কিছু প্রমাণিত হলেও তার কিছুই হয়নি। কারণ মারুফ মোরশেদ যে 'কোটিপতি কর্মকর্তা' বলে বহুল পরিচিত। খেলাপী ঋণের কোটিপতিদের ফাইল যেভাবে খালেদা সরকার ফ্রিজে ফেলে রেখেছেন, ঐ একই ফ্রিজে মারুফের ফাইলও ফ্রিজড হয়েছিল। তবে বিষয়টি একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝা যাবে যে, খালেদা জিয়ার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পশ্চাতে মারুফ মোরশেদের অবদান রয়েছে। কারণ মারুফদের কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে যেমন জেনারেল জিয়ার ভাগ্য খুলে গিয়েছিল, সেই সৌভাগ্যের ধারাবাহিকতায় খালেদা জিয়ার ভাগ্যদেবীও সুপ্রসন্ন হয়েছে। সুতরাং খালেদার সৌভাগ্যের নেপথ্য নায়কদের অন্যতম ব্যক্তিই হচ্ছেন মারুফ মোরশেদ।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের চার কুচক্রী ও অন্যান্য সহযোগী

মোশতাক, জিয়া, ফারুক ও রশিদ। এই চার কুচক্রীকে সাধারণত বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের দেশীয় নেতৃত্ব বলা হয়ে থাকে। এই নেতৃত্বের পেছনে যেমন স্বাধীনতাবিরোধী-মুজিববিরোধী রাজনৈতিকচক্র সর্বপ্রকার ইন্ধন যুগিয়েছেন তেমনি তৎকালীন আওয়ামী লীগের কিছু নেতৃবৃন্দও তাদের সাথে ব্যক্তি-গোষ্ঠীস্বার্থে চক্রান্ত করেছে। আর এদের পেছনে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছে বাংলাদেশ স্বাধীনতার শত্রু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, সৌদি আরব, ইরান, পাকিস্তান ও তাদের অন্যান্য তাবেদার দেশ।

বিশেষ করে উপরোক্ত চার কুচক্রী কীভাবে একে অপরের সাথে একত্রিত হয়ে ঐ পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছিল, সে-বিষয়ে এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, এরা মূলতঃ একে অপরের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-গুরুজন। মোশতাকের ভাগ্নে রশিদ। রশিদের ভায়রা ফারুক। আর ফারুক-রশিদের সামরিক গুরু ছিলেন জিয়া। অপরদিকে মোশতাক-জিয়ার মূল সংযোগ স্থাপিত হয় ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়। মোশতাক ছিলেন সে-সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী। জিয়া ছিলেন একজন বিতর্কিত মুক্তিযোদ্ধা। তিনি ছিলেন পাকবাহিনীর একজন অনুগত মেজর। ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ বাঙালি নিধনযজ্ঞে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সোয়াত জাহাজ থেকে খালাস করে আনার লক্ষ্যে গমন করলে পথিমধ্যে মুক্তিযোদ্ধারা জিয়াকে আটক করে এবং মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করতে বাধ্য করে। অতঃপর তিনি মুক্তিযুদ্ধকে বানচাল করার লক্ষ্যে খোন্দকার মোশতাকের মার্কিনী ফরমুলা অনুযায়ী পাকিস্তানের গণ্ডিতে কনফেডারেশনের আওতায় থাকার চক্রান্ত করেন। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে মোশতাকের সহযোগী তার একই কুমিল্লা জেলার অধিবাসী কাজী জহিরুল কাইয়ুম, মিজানুর রহমান চৌধুরী, তাহেরউদ্দিন ঠাকুর, পররাষ্ট্র সচিব মাহাবুব আলম চাষী প্রমুখ ঐ চক্রান্তে মোশতাককে সহযোগিতা করেন। ঐ চক্রান্তের বিস্তৃতি ঘটে মুক্তিযুদ্ধের কিছু নেতৃস্থানীয় সৈনিকদের মধ্যেও। মেজর জিয়া, মেজর মীর শওকত আলীসহ তাদের সাথী-সহযোগী অফিসাররাও কনফেডারেশন গঠনে মোশতাক ফরমুলাকে সমর্থন করে বলেও বিভিন্ন গ্রন্থে ও বিভিন্ন মুক্তিযোদ্ধা সূত্রে জানা গেছে। সামরিক অঙ্গনে এক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেন মেজর জিয়াউর রহমান। এমনকি জিয়া তৎকালীন মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি কর্নেল ওসমানীকে কমান্ডিং চীফ থেকে সরিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র আঁটেন। এ লক্ষ্যে তিনি সেক্টর কমান্ডার

মেজর শফিউল্লাহর সহায়তাও কামনা করেন। এ তথ্যটি মেজর শফিউল্লাহ (অবঃ) বিভিন্ন সময় সাক্ষাতকারে প্রকাশ করেছেন (সূত্র বাংলাদেশ ঃ জেনারেল জিয়ার রাজনীতি, পৃষ্ঠা ৩৪-৩৫)। শুধু এটুকুই নয়। মেজর জিয়া তার সুন্দরী স্ত্রীকে পাকবাহিনীর কাছে রেখে যান। প্রমাণ রেখে যান যে, তিনি সুযোগ মতোই আবার পাকবাহিনীতে ফিরে আসবেন। অপরদিকে বেগম জিয়া (খালেদা) পুরো নয় মাস পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে নানাভাবে সহযোগিতা প্রদান করেন বলেও আরেক সেক্টর কমান্ডার আবু ওসমান চৌধুরী ২৬ মার্চ ১৯৯৪ সমন্বয় কমিটি আয়োজিত জনসমাবেশে এ তথ্য পেশ করেন, যা ২৮ মার্চের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছে। এমনকি বেগম জিয়া স্বামীর পক্ষে পাকবাহিনীর কাছ থেকে প্রতি মাসে মেজর জিয়ার বেতন গ্রহণ করেছিলেন বলেও বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়। বেগম খালেদা জিয়া যে বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী একজন দালাল তারও প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৯১ সালে নির্বাচনের পর স্বাধীনতাবিরোধী জামাতে ইসলামীর সহায়তা নিয়ে সরকার গঠন করার মধ্য দিয়ে। এখানেই শেষ নয়, তিনি তাঁর স্বামী জেনারেল জিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করে স্বাধীনতাবিরোধী পাকদালাল আবদুর রহমান বিশ্বাসকে রাষ্ট্রপতি, হুমায়ুন খান পন্নীকে ডেপুটি স্পীকার, ৬ টাকার রাজাকার নামে বহুলখ্যাত আবদুল মতিন চৌধুরী, ব্যারিস্টার সালাম তালুকদার, ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা, ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার, ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া, চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ, মেজর জেনারেল মজিদুল হক (অবঃ), মেজর আবদুল মান্নান, লেঃ কর্নেল মোস্তাফিজুর রহমান প্রমুখকে তাঁর মন্ত্রিসভায় স্থান দিয়েছেন। তাঁর স্বামী জেনারেল জিয়া রাষ্ট্রপতির পদ দখল করে অনুরূপ পাকিস্তানি দালাল রাজাকার যেমন শাহ আজিজুর রহমানকে প্রধানমন্ত্রী, বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে উপরাষ্ট্রপতি, ব্যারিস্টার সুলতানউদ্দিন খান ও শামসুল হুদা চৌধুরীকে স্পীকার, মশিউর রহমান যাদু মিয়াকে সিনিয়র মন্ত্রীসহ নরঘাতক আব্দুল আলিম, মাওলানা মান্নান, এনায়েতউল্লাহ খান, আবদুর রহমান, আবদুল বাতেন প্রমুখকে মন্ত্রীসহ দালাল আইন বাতিল করে নরঘাতক গোলাম আযম, হামিদুল হক চৌধুরী, কাজী কাদের, পাবনার চোরা মতিন, আলবদর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, দোলোয়ার হোসেন সাঈদী, পীর আবু সালেহ, হাসমতউল্লাহ প্রমুখ রাজাকার-দালালদের পাকিস্তান থেকে ফেরত এনে তাদের নাগরিকত্ব প্রদান, সমাজে পুনর্বাসন ও জেল থেকে মুক্ত করে দেন।

অতি স্বাভাবিকভাবেই দেখা যাচ্ছে যে, জেনারেল জিয়ার মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলতে কিছুই ছিল না। তেমনি চেতনা নেই খোন্দকার

মোশতাকের মধ্যেও। দুজনেই মূলতঃ পাকিস্তান প্রেমে মজে ছিলেন। দুজনে তাই একাত্তরে পাকিস্তান কনফেডারেশনের জন্যে চক্রান্ত করেছেন, তেমনি দুজনে ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করেছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ-চেতনা উদ্দীপনাময় স্লোগান 'জয় বাংলা' বিসর্জন দিয়েছেন, রাষ্ট্রীয় চার মৌলনীতিমালাকে ভুলুণ্ঠিত করেছেন। করেছেন পাকিস্তানি চেতনাকে পুনর্বাসন এবং সর্বস্তরের স্বাধীনতাবিরোধীদের পুনর্বাসন। এক্ষেত্রে মোশতাক ও জিয়া গুরু-শিষ্যের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

অপরদিকে মোশতাক-রশিদ-ফারুক একে অপরের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। মোশতাকের ভাগ্নে রশিদ। রশিদ ও ফারুক আপন ভায়রা। অন্যদিকে রশিদ-ফারুক জিয়ার শিষ্য। জিয়া ছিলেন রশিদ-ফারুকের সামরিক প্রশিক্ষক। উপরোক্ত সূত্র ধরেই এই চার কুচক্রী আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ সরকারকে হেয়করণসহ বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের চক্রান্তে নেতৃত্ব প্রদান করেন।

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর তাই এ চার কুচক্রীর রাজনৈতিক প্রধান খোন্দকার মোশতাক রাষ্ট্রপতি এবং সামরিক প্রধান জেনারেল জিয়া প্রধান সেনাপতি ও মেজর রশিদ-ফারুক একধাপ পদোন্নতি লাভ করে রাষ্ট্রপতির দেহরক্ষী হয়েছিলেন। এক্ষণে ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই এ চার কুচক্রীর ওপর একটি যৎকিঞ্চিত প্রতিবেদন দেয়া হলো।

খোন্দকার মোশতাক আহমদ

খোন্দকার মোশতাক ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রী ছিলেন। মুজিবনগর বিপ্লবী সরকারের প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

১৯৪৯ সালে শাসক মুসলিম লীগের প্রথম বিরোধী দল হিসেবে মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হলে শেখ মুজিব ভাষা আন্দোলন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের আন্দোলনে নেতৃত্বদানের অপরাধে কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থায় ঐ দলের যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। মোশতাক হন সহকারী সম্পাদক। চির নিচুতার প্রতীক মোশতাকের এখান থেকেই মুজিবের প্রতি ইতরতার জন্ম। ১৯৫৬-৫৭ সালে মাওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ ছেড়ে ন্যাপ গঠন করলে মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ও শেখ মুজিব যথাক্রমে আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হন। ১৯৫৫ সালে সোহরাওয়ার্দী, তর্কবাগীশ ও মুজিবের উদ্যোগে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ

দেয়া হলে মোশতাক শেখ মুজিবের প্রতি প্রতিহিংসাবশত এর বিরোধিতা করে আওয়ামী লীগ থেকে সরে পড়েন। ১৯৬৬ সালে মুজিব আওয়ামী লীগের সভাপতি হন। মোশতাক তখন একজন নো-হয়ার নেতা। অগত্যা অনেক অনুরোধ-উপরোধ করে আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। মুজিব তাকে এ দলের ৫ নং সহ-সভাপতি করেন।

১৯৭৪-এর দুর্ভিক্ষের পটভূমি সৃষ্টি ও ১৯৭৫ হত্যাকাণ্ডসমূহের আন্তর্জাতিক চক্রান্ত বাস্তবায়নে দেশীয় মহানায়ক। আজীবন মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএর বিশ্বস্ত সেবাদান-অনুচর এই মোশতাক ছিলেন ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনাকারী মুজিবনগর প্রবাসী বিপ্লবী বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। সিআইএর পরিকল্পনা অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধ বানচাল করে পাকিস্তান কাঠামোর একটি অশুভ রাজনৈতিক সমাধান বের করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুকে ট্রামকার্ড হিসেবে ব্যবহারের চক্রান্ত ফাঁদেন। বঙ্গবন্ধুর প্রতি বাঙালি জাতির ভালবাসাকে পুঁজি করে মুক্তিযুদ্ধকালীন কঠিন দিনগুলোতে তিনি ও তাঁর সহযোগীরা স্লোগান তোলেন : 'বঙ্গবন্ধুর মুক্তি, না বাংলাদেশ'? অর্থাৎ 'বঙ্গবন্ধু' নামকে সামনে রেখেই পাকিস্তানের সাথে কনফেডারেশনের ফর্মুলা বের করে স্বাধীনতাকে নস্যাত করতে তিনি উঠেপড়ে লাগেন। এ সময় কোলকাতা ও নয়াদিল্লীতে মার্কিন কূটনীতিকদের সাথে তাঁর একাধিকবার বৈঠকের তথ্য ফাঁস হয়ে যায়। মোশতাক, তাঁর সচিব মাহাবুব আলম চাষী, কাজী জহিরুল কাইয়ুম, এমআর সিদ্দিকী, মিজানুর রহমান চৌধুরী, তাহেরউদ্দিন ঠাকুর প্রমুখ প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দ অতি গোপনে ও দ্রুততার সাথে যুদ্ধরত সেনামুক্তিযোদ্ধা ও জনতার মধ্যে ঐ ধরনের ফর্মুলা প্রচার করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। সেনাবাহিনীতে মেজর জিয়াসহ আরো কতিপয় কর্মকর্তা মোশতাকী ফর্মুলা গ্রহণ করে অনিশ্চয়তাকে দ্রুত মীমাংসার লক্ষ্যে তৎপরতায় লিপ্ত হন। পাক সামরিক বাহিনীর এই সব অফিসাররা চাকরির অনিশ্চয়তা ও স্বাধীনতা অর্জনের সুদীর্ঘ কঠিন সংগ্রামের আশঙ্কায় মোশতাকী ফর্মুলার মধ্যে সমাধান দেখতে পেয়েছিল। মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি কর্নেল ওসমানী মেজর জিয়াকে এ চক্রান্তমূলক তৎপরতায় ও অন্যান্য কার্যকলাপে জড়িত হওয়ায় তাকে মুক্তিযুদ্ধ থেকে অব্যাহতি দেন ও অন্যান্য চক্রান্তের অভিযোগে তাকে পাকড়াও করার নির্দেশও দেন। অপরদিকে বাংলাদেশ সরকার মোশতাকের ষড়যন্ত্র ধরতে পেরে তাকে পররাষ্ট্র মন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দেন। এভাবেই বিপ্লবী সরকার মার্কিন চক্রান্তকে নস্যাৎ করে দেয়।

স্বাধীনতার পর খোন্দকার মোশতাক বঙ্গবন্ধুর কাছে সুদীর্ঘ সময়ের বন্ধুত্বের দাবিতে ক্ষমাপ্রার্থনা করলে তিনি তার স্বভাবসুলভ হৃদয়ের টানে ক্ষমা করে দেন, মন্ত্রিসভায় স্থান দেন। ক্ষমতায় ঢুকেই তিনি তাঁর সহযোগীদের সাথে নতুন করে চক্রান্ত শুরু করেন। স্বাধীনতাকে অপাংতেয়, বঙ্গবন্ধুকে হেয় ও উৎখাতের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার জাল বুনে সামরিক-বেসামরিক আস্থাভাজন কর্মকর্তা, রাজনীতিক, ব্যবসায়ী, সাবেক শিল্পপতিসহ বঙ্গবন্ধুবিরোধী জাসদ, সর্বহারা, নিষিদ্ধ ঘোষিত জামাত-মুসলিম লীগারদের সাথে সিআইএর পৃষ্ঠপোষকতায় একজোট হয়ে নেতৃত্ব প্রদান করেন।

১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু খাদ্য সংকট দূরীকরণের জন্যে মিশর ও অন্যান্য মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোতে খোন্দকার মোশতাককে পাঠান। কিন্তু খাদ্য-অর্থ সংগ্রহের পরিবর্তে তিনি সেসব দেশের মার্কিন সমর্থিত শাসক, পাক-চীন-মার্কিন রাষ্ট্রদূতদের সাথে চক্রান্ত করে আসেন। তাইতো আমরা দেখতে পাই যে, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর তিনিই হন খুনী সরকারের রাষ্ট্রপতি। সংবিধান মোতাবেক তিনি আদৌ রাষ্ট্রপতি হতে পারেন না। কারণ তখনও সংবিধান বাতিল করা হয়নি। রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে উপ-রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে জাতীয় সংসদের স্পিকার, স্পিকারের অনুপস্থিতিতে দেশের প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পেতে পারেন, আমাদের সংবিধানও তাই বলে। অথচ অন্যান্য ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান অবস্থায়ই একজন বাণিজ্যমন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক অবৈধভাবে রাষ্ট্রপতির পদটি দখল করেন। এ অবৈধতাকে দেশে চ্যালেঞ্জ করতে কেউ যেমন এগিয়ে এলেন না, তেমনি ঐ অবৈধ মোশতাককে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে মেনে নিলেন সভ্য গণতন্ত্রের পীঠস্থান মার্কিন সরকার স্বয়ং। তারই ইংগিতে চীন-সৌদি আরব-পাকিস্তান তাৎক্ষণিকভাবে অবৈধ রাষ্ট্রপতি মোশতাককে সর্বাত্মকভাবে সমর্থন ও সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করতে এগিয়ে এল। অর্থাৎ তাদের চক্রান্তের ফলশ্রুতি মোতাবেক ঐ নির্মম হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় এবং মোশতাককে ক্ষমতার মসনদে বসায়।

আজীবন বকধার্মিক, সিআইএর চর, কুটিল হৃদয়ের অধিকারী মোশতাক বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের মূল রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রদান করেন এবং বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর অবৈধভাবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি এমনই একজন জঘন্য চরিত্রের অধিকারী যে, রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হয়েই ভাগ্নিকে বিয়ে করেন। প্রথম ফাইলটিতে প্রথম আদেশ দিয়ে বিএডিসির

নিম্নমান সহকারী তার এক ভাইপোকে সিনিয়র এক্সিকিউটিভ করে টিসিবিতে নিয়োগ করেন। রাষ্ট্রপতি হয়ে তিনি ঘোষণা করলেন যে তার পিতা মরহুম খবিরউদ্দিন একজন কামেল পীর ছিলেন। সরকারী ইট বালু সিমেন্ট রড দিয়ে সম্পূর্ণ সরকারী খরচে রাতারাতি তার পীরবাবার মাজার পাকা করেন। এ অপরাধে পরবর্তীকালে তাঁর প্রধান সেনাপতি ও রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়ার সামরিক ট্রাইবুনালে তাঁর ৭ বছর কারাদণ্ড হয়। একেই বলে 'পাপ বাপকেও ছাড়ে না'। মাত্র ৮৩ দিনের মাথায় জেনারেল খালেদ মোশাররফ মোশতাককে ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং যে জেনারেল জিয়াকে সাথে নিয়ে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছিলেন, পরবর্তীকালে তারই প্রতিদ্বন্দ্বী জেনারেল জিয়ার হাতে তিনি নাজেহাল হন। খোন্দকার মোশতাক ১৯৭৫-এর ২৬ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সামরিক নেতৃত্ব জিয়া-ফারুক-রশিদসহ সকল ঘাতকদের ঐ হত্যাকাণ্ডের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রদানের লক্ষ্যে কুখ্যাত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করেন এবং ঘাতকদেরকে 'সূর্যসন্তান' বলে অভিহিত করেন।

লেঃ জেনারেল জিয়াউর রহমান

লেঃ জেনারেল জিয়া। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডসহ সামরিক বাহিনীর প্রায় ৬ হাজার অফিসার-সৈনিক হত্যাকাণ্ডের সামরিক নায়ক। এক নির্দয় নিষ্ঠুর ও কুটিল চক্রান্তের নায়ক। নিজের চোখকে তিনি সর্বদা কালো চশমা দিয়ে ঢেকে রাখতেন যাতে তার সর্পিল দৃষ্টি কেউ অনুধাবন করতে না পারে। তিনি এমনই একজন মানুষ ছিলেন যিনি একহাতে নরহত্যা করে অপর হাতে আহার করতে পারতেন। পোশাক-আষাকে কেতদুরস্ত, বাহ্যিক শান্তশিষ্ট সুশীল ব্যবহার প্রদর্শন করলেও অন্তরে ছিল তার বিষ! নিজের স্বার্থোদ্ধার ও ক্ষমতাকে নিষ্কণ্টক করার লক্ষ্যে, সেনাবাহিনীর এক ইউনিটের সাথে আরেক ইউনিটের সংঘর্ষ বাঁধিয়ে পরে সংক্ষিপ্ত বিচারপ্রহসনে তাদেরকে ফাঁসিতে লটকিয়ে দিতেন। ১৯৭৭ সালে বিমান বাহিনীকে নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে প্রায় ধ্বংস করে ফেলেন। কারণ বিমান বাহিনী তাকে সমর্থন করতো না– এই তাদের অপরাধ।

লেঃ জেনারেল জিয়ার সবচেয়ে বড় অপকীর্তি, তিনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে মুছে ফেলে দেশকে পাকিস্তানের সাথে পুনঃএকত্রিকরণের জন্যে যাবতীয় রাজনৈতিক ও সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি পাকবাহিনীর দালাল রাজাকার আলবদরদের বিচারের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু প্রণীত দালাল আইন

বাতিল, তাদের জেল থেকে মুক্তি ও নাগরিকত্বচ্যুতদের নাগরিকত্ব প্রদান করেন। তাদের মধ্য থেকে রাজাকার শাহ আজিজকে প্রধানমন্ত্রীসহ রাজাকার আবদুল মান্নান, আবদুল আলিম, মশিউর রহমান, আবদুর রহমান, আবদুল বাতেন, এনায়েতউল্লাহ খান, খোন্দকার আবদুল হামিদ প্রমুখকে মন্ত্রীসহ ৩৩০ সদস্যবিশিষ্ট সংসদের তার ২১০ সাংসদের মধ্যে প্রায় পৌনে দু'শতই ছিল রাজাকার-দালাল। তিনি বাঙালি জাতীয়তাকে বাংলাদেশীকরণের মাধ্যমে পাকিস্তানে পালিয়ে যাওয়া লুটেরা শিল্পপতি-ব্যবসায়ী শোষকদের নাগরিকত্ব দিয়ে জাতীয়করণকৃত শিল্পকারখানা তাদের হাতে তুলে দেন। এদেশীয় উঠতি ধনিক ও পাকিস্তানি লুটেরাচক্রের হাতে দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের লুটপাটের ওপর ছেড়ে দেন এবং নিজেও কালো চশমার কালোতে নিজের চোখ ঢেকে রেখে তাদের কাছ থেকে কমিশন-ঘুষ লুটেন। অথচ ওপরে ওপরে নিজেকে ছেঁড়া গেঞ্জি ও ভাঙা একটি সুটকেসের অধিকারী হিসেবে পরিচিত করে গেছেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পরপরই দেখা গেল তাঁর ছেঁড়া গেঞ্জি ও ভাঙা সুটকেস থেকে বেগম খালেদার আমেরিকান জর্জেট, ফ্রান্সের সিফন, পাকিস্তানি ওড়না, কাশ্মিরী শাল ও বিদেশী কসমেটিকসহ বিউটি পার্লারিং সামগ্রী বেরিয়ে এলো। এক্ষণে খালেদা জিয়া পরিবার বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান ধনাঢ্য পরিবার।

সেই লেঃ জেনারেল জিয়া। ১৯৭১-এর এক অখ্যাত ও অজ্ঞাত মেজর জিয়া। ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে পাকবাহিনীর বিভীষিকাময় গণহত্যার প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু যখন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে মেজর জিয়া পাকবাহিনীর অনুগত হয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে অবস্থিত সোয়াত জাহাজ থেকে বাঙালি নিধনের মারণাস্ত্র খালাস করতে যাচ্ছিলেন। আর ঠিক ঐ একই সময় পাকবাহিনী চট্টগ্রামে সবচেয়ে সিনিয়র আর্মি লেঃ কর্নেল এমআর চৌধুরীসহ ১০০০ বাঙালি সৈন্যকে হত্যা করছিল। পাকবাহিনীর বাঙালি হত্যার প্রতিবাদে এবং বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার আদেশানুযায়ী বাঙালি ক্যাপটেন রফিকুল ইসলাম, ক্যাপটেন এসএ ভূইয়া, ক্যাপটেন অলি, ক্যাপটেন খালিকুজ্জামান তাদের অধীনস্থ সৈন্যদের নিয়ে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। আর মেজর জিয়া তখন সোয়াত থেকে অস্ত্রশস্ত্র খালাস করে বাঙালি হত্যায় ব্যবহার করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সোয়াতে যাওয়ার পথে তিনি বিদ্রোহী ক্যাপটেন অলি ও ক্যাপটেন খালিকুজ্জামানের দ্বারা বাধাগ্রস্ত হন। তাঁদের আহ্বানে বাধ্য হয়ে

সাড়া দেন। চট্টগ্রামে সবচেয়ে সিনিয়র বাঙালি সামরিক অফিসার হিসেবে যেখানে মেজর জিয়ার বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেয়ার কথা, সেখানে কিনা জুনিয়র অফিসাররা সর্বাগ্রে বিদ্রোহ করেন এবং সিনিয়র কর্মকর্তা মেজর জিয়াকে বিদ্রোহ করতে বাধ্য করেন। মূলতঃ মেজর জিয়ার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের পশ্চাতে তার নিজস্ব চেতনা কাজ করেনি, কাজ করেছে বিদ্রোহীদের চাপ। চাপের মুখে বিদ্রোহ করেছিলেন বলেই সুযোগ থাকলেও সুন্দরী স্ত্রী ও শিশুপুত্র তারেককে পাকঘাঁটিতে ফেলে আসেন। প্রকৃতপক্ষে এ কাজটির মাধ্যমে তিনি পাকবাহিনীকে বুঝিয়ে দিলেন যে, তিনি সময় ও সুযোগমত ফিরে আসবেন। এর প্রমাণ তিনি সেই সময় বারবার দিয়েছেন।

প্রথমতঃ ২৭ মার্চ মেজর জিয়া নিজেকে মুক্তিবাহিনীর স্বঘোষিত অস্থায়ী প্রধান সেনাপতি হিসেবে ঘোষণা দিয়ে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। তার আগে ২৬ মার্চ সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল হান্নান, পরবর্তীতে অধ্যাপক আবুল কাশেম সন্দ্বিপ প্রমুখ বঙ্গবন্ধু ঘোষিত স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। মেজর জিয়া তার ঘোষণায় ব্যক্তি পদমর্যাদার সাফাই গেয়ে মূলতঃ মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দখলের চক্রান্ত করেছিলেন। অবশ্য তাৎক্ষণিকভাবে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের চাপে তিনি 'অস্থায়ী সেনাপতি' পদটি বর্জন করে পরবর্তী ঘোষণাসমূহে কেবল বঙ্গবন্ধুর নামে ঘোষণা দেন।

দ্বিতীয়তঃ স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠের সুবাধে মেজর জিয়া নিজে মনে মনে একজন হিরো বনে যান এবং পরবর্তীতে যুদ্ধ-মাঠ থেকে নিজেকে আগরতলার নিরাপদ ছাউনিতে অবস্থান নিয়ে আগরতলাতে তড়িঘড়ি একটি সরকার গঠনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে প্ররোচিত করেন। তার ধারণা ছিল, তড়িঘড়ি একটি সরকার আগরতলাতে গঠন করতে পারলে তিনি প্রভাব খাটিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ বাগিয়ে নিতে পারবেন এবং সুযোগ মত মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দখল করে মনের লালিত মতলব হাসিল করতে পারবেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ শীর্ষ নেতারা মেজর জিয়ার উচ্চাভিলাষ গুঁড়িয়ে দেন। তারা ১০ এপ্রিল একটি বিপ্লবী সরকার গঠন করেন এবং ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে আনুষ্ঠানিকভাবে সরকার শপথ গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করে তাঁর অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে বিপ্লবী সরকার গঠন করা হয়। আওয়ামী লীগ এমএনএ কর্নেল ওসমানীকে সম্মিলিত মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি, আওয়ামী লীগ এমএনএ লেঃ কর্নেল আবদুর রবকে

সেনাবাহিনী প্রধান, গ্রুপ ক্যাপটেন এ. কে. খন্দকারকে সেনাবাহিনীর উপপ্রধান ও বিমান বাহিনী প্রধান করে সারা বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়।

তৃতীয়তঃ মেজর জিয়া একজন মুক্তিযোদ্ধা হলেও তিনি যুদ্ধ-মাঠ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেন। এবার তিনি সরাসরি কর্নেল ওসমানীকে উৎখাতের চক্রান্ত করেন। এ বিষয়ে অপর সেক্টর কমান্ডার শফিউল্লাহ ও মেজর মীর শওকত আলীর সাহায্য কামনা করেন। মেজর শফিউল্লাহ মেজর জিয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং এ বিষয়ে তাকে সাবধান করে দেন। এ চক্রান্তের খবর কর্নেল ওসমানীর গোচরীভূত হলে তিনি জুন মাসে জিয়াকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী থেকে অপসারণ করেন।

চতুর্থতঃ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী থেকে অপসারিত হওয়ার পর নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার অভিপ্রায়ে আরেকটি চক্রান্ত করেন। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ডের বাইরে এবার তিনি তার অনুগত সৈন্যদের নিয়ে একটি ব্যক্তিগত বাহিনী গড়ে তোলেন। জিয়া ফোর্স বা জেড-ফোর্স। মুক্তিযুদ্ধের সেই সময়কালীন পরিস্থিতিতে বিষয়টিকে দেশ-বিদেশে হালকা করার লক্ষ্যে কর্নেল ওসমানী কৌশলগত কারণে জেড-ফোর্সকে একটি ব্রিগেড হিসেবে ঘোষণা করে অপর দুটি ব্রিগেড সৃষ্টি করে মেজর শফিউল্লাহ ও মেজর খালেদকে দায়িত্ব দেন। ব্রিগেডদ্বয়ের নাম এস-ফোর্স (শফিউল্লাহ ফোর্স) ও কে-ফোর্স (খালেদ ফোর্স)।

পঞ্চমতঃ মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে। নভেম্বর ১৯৭১। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' (RAW : Research & Analitical Wing) খবর পায় যে পাক-সরকার বাংলাদেশ সরকারের উপ-রাষ্ট্রপতি (অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি) সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ, প্রধান সেনাপতি কর্নেল ওসমানী, কর্নেল রব (সেনাবাহিনী প্রধান) ও অন্যান্য বিশিষ্ট রাজনীতিক-মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করে মুক্তিযুদ্ধ বানচালের এক চক্রান্ত করছে। এ লক্ষ্যে পাকবাহিনীর দালাল বাঙালি-বাংলাদেশ-মুজিববিদ্বেষী কিছু বাঙালি সামরিক কর্মকর্তাদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তারা মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করবে এবং সময় ও সুযোগ মত ঐ চক্রান্ত বাস্তবায়িত করবে।

র-এর খবরে ভারত-বাংলাদেশ কমান্ড হুশিয়ার হয়ে যায়। ঠিক দেখা গেল নভেম্বরের শেষ দিকে পাকিস্তান গোলন্দাজ বাহিনীর দুই বাঙালি তরুণ অফিসার মুজিবনগর হেড কোয়ার্টারে হাজির হলেন। এদের নাম ক্যাপটেন ফারুক রহমান ও ক্যাপটেন খোন্দকার আবদুর রশিদ। বাঙালি হলেও তারা

ভালোভাবে বাংলায় কথাবার্তা বলতে পারেন না। তাছাড়া তাদের আচার-আচরণের মধ্যে নানান অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হচ্ছিলো। তারা তাদের আলাপ-আলোচনায় কর্নেল ওসমানী ও কর্নেল রব সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন। তারা নিজেদেরকে অত্যাধুনিক সামরিক প্রযুক্তি জ্ঞানের অধিকারী বলে জাহির করে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করেন। বাংলাদেশ সামরিক কমান্ড বিষয়ে তারা বিরূপ মনোভাবও দেখান। এতে করে তাদের প্রতি সন্দেহের সৃষ্টি হয়। কর্নেল ওসমানী তাদের হেডকোয়ার্টারে গ্রহণ করলেন না। তাদের গতিবিধির ওপর বরং লক্ষ্য রাখার জন্যে অধঃস্তনদের প্রতি নির্দেশ দেন। এ অবস্থায় ফারুক-রশিদ দিন কয়েক মুজিবনগরে ঘোরাফেরা করার পর হঠাৎ উধাও হয়ে গেলেন। কদিন পর কর্নেল ওসমানী খবর পান যে, ক্যাপটেন ফারুক-রশিদ নিজেদের আসল নাম গোপন করে অন্য নামে মেজর জিয়ার জেড-ফোর্সে যোগদান করেছেন। আরো খবর পাওয়া যায় যে, এ দুই ক্যাপটেন মেজর জিয়ার অধীনে একদা পাকিস্তানের রিসালপুর সামরিক একাডেমীতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন। অপরদিকে মেজর জিয়া হেডকোয়ার্টারের অনুমোদন না নিয়ে এ সন্দেহভাজন দুই ক্যাপটেনকে তার ব্রিগেডে, তাও আবার বেনামে গ্রহণ করেছেন।

এসব কারণে সরকার তথা মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন স্তরে বিভ্রান্তি ও গুঞ্জন শুরু হলে প্রধান সেনাপতি কর্নেল ওসমানী মেজর জিয়াকে হেডকোয়ার্টারে কয়েকবার রিপোর্ট করার নির্দেশ দেন। মেজর জিয়া সেসব নির্দেশ পালন করেননি। ফলে কর্নেল ওসমানী মেজর জিয়াকে ৩ বার গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেন। সূত্র : 'বাংলাদেশ ঃ জেনারেল জিয়ার রাজনীতি'।

স্বাধীনতার পর পাকিস্তান থেকে বঙ্গবন্ধু ফিরে এলেন। প্রথমে রাষ্ট্রপতি ও পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রধান সেনাপতি কর্নেল (জেনারেল) ওসমানীসহ অন্যান্য রাজনৈতিক ও সামরিক কর্মকর্তারা মেজর জিয়ার মুক্তিযুদ্ধকালীন চক্রান্তমূলক কার্যকলাপ তুলে ধরে তাকে সামরিক বাহিনী থেকে বহিষ্কারের আবেদন জানান। চিরস্নেহশীল ও সিংহহৃদয়ের বঙ্গবন্ধু উত্তরে বলেন, 'ও ছেলে মানুষ। না বুঝে বা কারো দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এখন আমি এসেছি, ও ঠিক হয়ে যাবে। ও যে আমার সন্তান তুল্য।' (সূত্র : জেনারেল ওসমানী)।

বঙ্গবন্ধু মুজিব জিয়াকে ক্ষমা করে দেন। জিয়া প্রতি রোববার ছুটির দিন বঙ্গবন্ধুর বাসায় এসে তাঁর পদধূলি নিতে থাকেন। তাকে দ্রুত পদোন্নতি

দেয়া হয়। বলা চলে রাতারাতি মেজর থেকে মেজর জেনারেল। তাকে সেনাবাহিনীর ডেপুটি চিফ অব স্টাফ করা হলো।

১৯৭২ সালের মে মাস। বঙ্গবন্ধুর কাছে খবর এলো যে জিয়া তার স্ত্রী খালেদা পুতুলকে গ্রহণ করছেন না। কুমিল্লা সেনানিবাসে কর্নেল জিয়া ময়নামতিতে কর্মরত একটি বিদেশী এনজিও-এর এক সুন্দরী তরুণীর সাথে ফষ্টিনষ্টি করছেন। খালেদা পাকবাহিনীর কাছে পুরো নয় মাস বন্দী ছিলেন। এ কারণে জিয়া খালেদাকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। বঙ্গবন্ধু হেলিকপ্টারে খালেদাকে চট্টগ্রাম সেনানিবাস থেকে ঢাকায় এনে নিজ বাসভবনে মেয়ে-আদরে রেখে জিয়াকে দেখা করার নির্দেশ দিলেন। জিয়া এলেন। বঙ্গবন্ধু বললেন, পুতুল আমার মেয়ে। ও অনেক নির্যাতন ও তিতিক্ষার শিকার হয়েছে। আমার বাংলার দু'লক্ষ মা-বোন একইভাবে নির্যাতিতা হয়েছে। তোরা যুদ্ধ করেছিস, এজন্যে তোরা বীর। আর আমার মা-বোনেরা-মেয়েরা এ দেশের স্বাধীনতার জন্যে নির্যাতন ভোগ করেছে। ওরা বীরাঙ্গনা। আমার মেয়ে বীরাঙ্গনা পুতুলের প্রতি তোমার আচরণ মনে করিয়ে দেয় যে, তুমি সত্যিকার মুক্তিযোদ্ধা নও। মুক্তিযুদ্ধকালীন অনেক অপকর্ম তুমি করেছো। আমি তোমাকে অবুঝ বলে ক্ষমা করেছি।... আজ যদি পুতুলকে গ্রহণ না করো তাহলে তোমার বিরুদ্ধে সেসব অভিযোগ আনা হবে, তোমার পদবী কেড়ে নেয়া হবে, চাকরিচ্যুত করা হবে এবং তোমাকে জেলে পাঠাতে বাধ্য হবো।' (সূত্র : মরহুম এটিএম সৈয়দ হোসেন, সরকারের তৎকালীন যুগ্মসচিব, যিনি বঙ্গবন্ধুর ভগ্নিপতি ছিলেন)। অতঃপর জিয়া খালেদা পুতুলকে গ্রহণ করেন। প্রীত হয়ে বঙ্গবন্ধু তাই জিয়াকে দ্রুত পদোন্নতি প্রদান করেন। অপরদিকে বিদেশী তরুণীটিকে তার দেশে পাঠিয়ে দেন।

বঙ্গবন্ধুর বদান্যতা এখানেই শেষ নয়।

১৯৭৫ সাল। বাকশাল গঠিত হলো। গঠনতন্ত্রে এ প্রভিশন রাখা হলো যে, তিনবাহিনী প্রধানগণ পদাধিকার বলে বাকশাল কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য হবেন। শুরু হলো মেজর জেনারেল জিয়ার বঙ্গবন্ধুর কাছে ছুটোছুটি। তিনি জানতেন বঙ্গবন্ধু তার প্রতি স্নেহশীল। কিন্তু সেনাবাহিনীর ডেপুটি চিফ হিসেবে বাকশালে তার জায়গা নেই। জিয়া অনেক অনুনয়-বিনয় করলেন। বঙ্গবন্ধু স্নেহভাজন জিয়ার প্রতি সদয় হলেন। গঠনতন্ত্রের ধারা পাল্টালেন। জিয়াকেও বাকশাল নির্বাহী পরিষদে অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন।

মেজর জেনারেল জিয়া। ভারতের মধ্যপ্রদেশ অঞ্চল থেকে আগত এক অতি সাধারণ উর্দুভাষী পরিবার থেকে যার আগমন ঘটেছে বলে জানা যায়।

তার দাদা মধ্য প্রদেশ থেকে ভাগ্যান্বেষণে বাংলাদেশের বগুড়াতে আসেন। বাগবাড়ি এলাকার এক জমিদার বাড়িতে মাছ সরবরাহ করতেন। কালক্রমে বাগবাড়িতে বসতি স্থাপন করেন এবং জেলে পেশায় জীবন কাটান। তাদের বংশের পদবী 'মণ্ডল'। ঐ মণ্ডল পরিবারের মনসুরুর রহমান মণ্ডলের প্রথম সন্তান জিয়া। ডাক নাম কমল। পুরো নাম জিয়াউর রহমান। ১৯৩৬ সালে বাগবাড়িতে বড় চাচা জহির মণ্ডলের ঘরে জিয়ার জন্ম। জিয়াদের কোনো ঘর-দোর ছিল না। তার বাবা চাকরি করতেন কোলকাতায় একটি কেমিক্যাল কারখানায়। পরিবার নিয়ে তিনি সেখানেই বসবাস করতেন। তাদের পারিবারিক ভাষা ছিল উর্দু। জিয়াকে কোলকাতার হেয়ার স্কুলে উর্দু মিডিয়ামে ভর্তি করা হয়। শিয়ালদহ রেলস্টেশনের একটি বস্তিতে তারা থাকতেন বলেও জানা যায়।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ হলো। জিয়ার বাবা মনসুরুর রহমান মণ্ডল অপশন নিয়ে পাকিস্তানের করাচিতে চলে যান। ভারত প্রত্যাগত মোহাজের বস্তিতেই স্থায়ী বসতি গড়ে তোলেন। জিয়া ১৯৫২ সালে করাচি থেকে এন্ট্রাস (ম্যাট্রিক)'পাস করেন। বাঙালি কোটায় ব্যর্থ হয়ে মোহাজের কোটা থেকে ক্যাডেট হিসেবে সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। ১৯৫৪ সালে তিনি কমিশন পান। তার বাবা-মা করাচিতে ইন্তেকাল করেন এবং করাচিতেই তাদের সমাধিস্থ করা হয়।

১৯৫২ থেকে ১৯৭১। এই উনিশ বছরের চাকরি জীবনে জিয়া মাত্র দেড় বছর বাংলার মাটিতে ছিলেন। এমনকি ১৯৩৬ সালে জন্মগ্রহণের পর থেকে ১৯৮১ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই বিরাট সময়ের মধ্যে একবারও জিয়া তার জন্মভূমি বাগবাড়ির মণ্ডল বাড়িতে ফিরে যাননি। যেমন ফিরে আসেননি তার বাবাও। অতএব বাংলাদেশের জলবায়ু-আবহাওয়া, মাটি-মানুষ এবং এদেশের মানুষের বাঁচা-মরার সংগ্রাম ও সাধনার সাথে জিয়ার কোনোই যোগাযোগ ছিল না। তিনি বাংলায় লিখতে-পড়তে জানতেন না। স্বাধীনতার পর বাংলায় নিজের নামের 'জিয়া' টুকু লিখতে শিখেছিলেন, সেই সঙ্গে কিছু কিছু শব্দ ও বাক্য ভুল বানানেও শিখেছিলেন। তবে পরবর্তীতে বাংলায় অশুদ্ধ শব্দ ও বাক্যে কথাবার্তা ও বক্তৃতা রপ্ত করেছিলেন। তারপরও যেটা সত্য তা হলো, তিনি বাঙালি ছিলেন না। বাঙালির প্রতি ছিল তার আজন্ম ঘৃণা ও বিদ্বেষ। তাইতো ক্ষমতা মুঠোয় পেয়েই তিনি 'বাঙালি'কে বেয়নেটমার্কা কলমের আঁচড়ে অশুদ্ধ শব্দে 'বাংলাদেশি' করে ছেড়েছেন। জিয়ার অশুদ্ধ ভাষায় নিজহাতে লেখা 'বাংলাদেশি' (প্রকৃত বানান

'বাংলাদেশী') লেখাটি 'জিয়াউর রহমান : আমার রাজনীতির রূপরেখা' নামক একটি সংকলনে লিপিবদ্ধ আছে।

বাঙালি-বাংলা বিদ্বেষী-এর অর্থ মুজিব-বিদ্বেষী। এরও প্রমাণ রয়েছে জিয়ার কার্যক্রমে! আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান অভিযুক্ত ছিলেন বঙ্গবন্ধু মুজিব। তাঁর সাথে সামরিক-বেসামরিক আরো ৩৪ জনকে অভিযুক্ত করা হয়। আগরতলা মামলার প্রধান তদন্তকারী ছিলেন বাঙালি লেঃ কর্নেল মোস্তাফিজুর রহমান। এই দলে আরো ছিলেন মেজর জিয়া, ক্যাপটেন আকবর, ক্যাপটেন সাদেকুর রহমান চৌধুরী। ঐ মামলার অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত (পরে যাকে নির্যাতনের মাধ্যমে প্রধান রাজসাক্ষী করা হয়) নৌবাহিনীর চীফ পেটি অফিসার মরহুম কামালউদ্দিন একদা আমাকে (লেখক) বলেছিলেন যে, তদন্তকার্য চলাকালীন একদিন ঐ লেঃ কর্নেল মোস্তাফিজ ও মেজর জিয়া বঙ্গবন্ধুর বন্দীশেলে ঢুকে তাঁকে দৈহিক নির্যাতন চালান। বঙ্গবন্ধু তাদের ধমক দেন। কিছুদিন পর মেজর জিয়া বঙ্গবন্ধুর ভয়ে বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানে বদলী নিয়ে চলে যান। বঙ্গবন্ধু মেজর জিয়ার ঐ আচরণ কোনোদিনই মনে রাখেননি। তবে জিয়া ও মোস্তাফিজ সর্বদাই বঙ্গবন্ধুকে মনে রেখেছিলেন। তাঁর সরকারকে হেয়, উৎখাত ও তাঁকে হত্যা করে দেশের ক্ষমতায়ই শুধু আরোহণ করেননি, বঙ্গবন্ধুর পবিত্র নামের ওপর নানান মিথ্যাচার চালিয়েছেন ব্যক্তিগতভাবে, দলীয়ভাবে এবং স্বাধীনতা-বিরোধীদের দিয়েও।

মেজর জেনারেল জিয়া ১৯৭৪ সালে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির পশ্চাতেও কার্যকরি ভূমিকা রাখেন। এ বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। তারপর ১৯৭৫ সালে কীভাবে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হলো এবং সেই হত্যাকাণ্ডে জিয়ার ভূমিকা কী সে-বিষয়েও এ গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে।

লেঃ কর্নেল ফারুক রহমান

লেঃ কর্নেল ফারুক রহমান। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে নভেম্বর মাসে পাকিস্তান সরকারের গুপ্তচর হিসেবে ভারতে অনুপ্রবেশ করেন। তখন তিনি ছিলেন পাকসেনাবাহিনীর একজন ক্যাপটেন। ১৯৭৪ সালে তিনি মেজর পদে পদোন্নতি লাভ করে গোলন্দাজ বাহিনীর লান্সার-এ যোগদান করেন।

লেঃ কর্নেল ফারুক বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত অবস্থায় পাকিস্তানের অনুচর হিসেবে বঙ্গবন্ধুর ইমেজ খর্ব, তাঁর সরকারকে

হেয়করণের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি এবং ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু, তাঁর পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও ৩ নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে জাতীয় চার নেতা যথাক্রমে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, মনসুর আলী ও কামরুজ্জামানের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মূল অপারেশনের নেতৃত্ব প্রদান করেন। বাংলাদেশে তিনি খুনী ফারুক বলে বহুল পরিচিত। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর খুনী মোশতাক রাষ্ট্রপতির পদ দখল করার পর পরই মেজর ফারুককে লেঃ কর্নেল পদে উন্নীত করেন।

লেঃ কর্নেল ফারুক। বর্তমান নওগাঁ জেলার এক অজ্ঞাত পীর পরিবারে তার জন্ম। অত্যন্ত গোঁড়া মুসলমান। নামের মধ্যেই তার পরিচয় মেলে। দেওয়ান ইশরাতুল্লাহ জাহান সৈয়দ ফারুকুর রহমান। তার বাবার নাম দেওয়ান ইশরাতুল্লাহ জাহান সৈয়দ আতাউর রহমান। তিনি পাক সেনাবাহিনীর মেজর-ডাক্তার ছিলেন। ১৯৪৫ সালে কর্নেল ফারুক ভারতের গুজরাটে জন্মগ্রহণ করেন। তার পূর্বপুরুষের আগমন ঘটেছিল ভারতের বিহার থেকে। ১৯৪৭ সালে তার বাবা অপশন নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে এসে নওগাঁতে বসতি স্থাপন করেন। তার পরিবারের ভাষা উর্দু।

১৯৬৪ সালে ফারুক রহমান পাকিস্তান বিমান বাহিনীর ভর্তি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের পর বঙ্গবন্ধুর হুমকিতে পাক সরকার পূর্ব পাকিস্তানিদের জন্যে ভর্তির নিয়ম-কানুন শিথিল করে। সেই সুযোগে ফারুক অন্যান্য অনেকের মতো সেনাবাহিনীতে প্রবেশ করেন। এ সময় পাকিস্তান মিলিটারী একাডেমীতে একজন প্রশিক্ষক ছিলেন মেজর জিয়া। এখান থেকেই মেজর জিয়ার সাথে ফারুকের পরিচয়। ১৯৭০ সালে ক্যাপটেন ফারুক আবুধাবীতে পাকিস্তানের পক্ষে আর্মড রেজিমেন্টে যোগদান করেন। ১৯৭১ সালে তাকে ফিরিয়ে এনে নভেম্বরের প্রথম দিকে ঢাকায় পোস্টিং দেয়া হয়। মুজিব-বাঙালি ও বাংলাদেশবিদ্বেষী এই ফারুককে পাক-সরকার তার অনুচর হিসেবে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ বানচাল করার এক মিশনে নিযুক্ত করে। এ বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

পাকিস্তান সরকারের সেই মিশন অবশেষে ১৯৭৫ সালে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে তিনি অন্যান্য চক্রান্তকারী-ঘাতকদের সাথে হাত মেলান। তিনি এ কর্মকাণ্ডে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে জড়িত করার দায়িত্ব পালন করেন।

খুনী ফারুক আরেক খুনী লেঃ কর্নেল খোন্দকার আবদুর রশিদের ভায়রা। রশিদের শ্যালিকার সাথে ফারুকের বিয়ের ঘটকালী করেন জেনারেল জিয়া। ১৯৭২ সালে। ফারুক খুনী মোশতাকেরও আত্মীয়।

লেঃ কর্নেল খোন্দকার আবদুর রশিদ

১৯৪৪ সালে খোন্দকার আবদুর রশিদ কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি থানার দশপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খুনী খোন্দকার মোশতাকের ভাগ্নে।

১৯৬৫ সালে রশিদ পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। ১৯৬৮ সালে ক্যাপটেন হন। মোশতাকের ঘটকালীতে ঐ বছরই রশিদ চট্টগ্রামের বিশিষ্ট শিল্পপতি ও মন্ত্রী এ.কে. খানের ছোটভাই এস. এইচ. খানের কন্যাকে বিয়ে করেন।

১৯৭১ সালে রশিদের কর্মস্থল ছিল পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে। মনেপ্রাণে মুজিব ও বাঙালি বিদ্বেষী। উপরন্তু বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধকালে পাক কনফেডারেশনের সমর্থক মোশতাকের ভাগ্নে এ কারণে পাক-সরকার রশিদকে তার অনুচর হিসেবে অপর অনুচর ও রশিদের একই ব্যাচের ক্যাপটেন ফারুকের সাথে নভেম্বরের প্রথম দিকে ঢাকাতে পোস্টিং দেয় এবং বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ বানচালকরণের মিশনে পাঠায়। রশিদ ও ফারুকের অনুপ্রবেশ বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

স্বাধীনতার পর এই দুই ক্যাপ্টেন রশিদ-ফারুক তাদের গুরু জেনারেল জিয়া এবং আত্মীয় খোন্দকার মোশতাকের সাথে ষড়যন্ত্রে অবতীর্ণ হন। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সময় রশিদ গোলন্দাজ বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদানসহ রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করেন। মোশতাক ক্ষমতায় আরোহণ করেই রশিদকে লেঃ কর্নেল পদে উন্নীত করেন।

উপরোক্ত প্রধান চার খুনী-কুচক্রীর সাথে সেনাবাহিনীতে কর্মরত ও নানান শৃঙ্খলাজনিত কারণে চাকরিচ্যুত ও অবসরপ্রাপ্ত অফিসার যেমন মেজর ডালিম, মেজর নূর, মেজর বজলুল হুদা, মেজর শাহরিয়ার, মেজর আজিজ পাশা, মেজর মহিউদ্দিন, মেজর শাহজাহান, মেজর মেহেদী প্রমুখের সংযোগ ঘটে এবং বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করার ক্ষেত্রে তারা ভূমিকা পালন করেন।

আরো কিছু সহযোগী

তাহেরউদ্দিন ঠাকুর। কুখ্যাত মোশতাকের অন্যতম সহযোগী, একই জেলার অধিবাসী। এক মানবরূপী দানব। এক অকৃতজ্ঞ ইতরপ্রাণী। ১৯৭১ সালে মোশতাকের সহযোগী হয়ে পাকিস্তান কনফেডারেশনের পক্ষে কাজ করেছিলেন। এক সময় তিনি ছিলেন ইত্তেফাকের বার্তা সম্পাদক। বঙ্গবন্ধুর

কারণেই মানিক মিয়া তাহের ঠাকুরকে তার পত্রিকায় ঠাঁই দিয়েছিলেন। এর পূর্বে ঠাকুরকে প্রতিদিন বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে পয়সা নিয়ে সংসার চালাতে হতো। পরম স্নেহে ও আস্থার সাথে তাহের ঠাকুরকে তিনি তথ্য প্রতিমন্ত্রী করেন। তথ্য মন্ত্রণালয়ের কাজ হলো সরকারের নীতিমালা ও কার্যক্রম দেশ-বিদেশে তুলে ধরা, অপপ্রচার ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্য-তৎপরতাকে নিয়ন্ত্রণ করা। কিন্তু মোশতাকের বিশ্বস্ত অনুচর ও সিআইএ'র সেবাদাস তাহের ঠাকুর অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে অপপ্রচার ও বিভ্রান্তির মাধ্যমে কীভাবে বঙ্গবন্ধুর ভাবমূর্তি খর্ব করে তাঁর সরকারকে হেয় ও উৎখাত করা যায়– সেই কার্যক্রমেই লিপ্ত থাকেন। তাঁর প্রভুদের কারসাজিতে সৃষ্ট-দুর্ভিক্ষের নানান বিকৃত ও বিভ্রান্ত তথ্য কীভাবে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল, যার নেপথ্যে ছিলেন এই তাহের ঠাকুর নিজেই। ইত্তেফাক, গণকণ্ঠ, হককথা, দৈনিক বাংলাসহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যেসব আজগুবি ও মিথ্যা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল এবং তার প্রভাবে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল সেসবের প্রতিকার তিনি না করে বরং অপপ্রচারের বন্যা যাতে সাগরের জলোচ্ছ্বাসের গতিতে সবকিছু তছনছ করে দেয়, সেই কাজেই তিনি ছিলেন লিপ্ত।

তিনি সরকারের তথ্য কার্যক্রমকে দু'ভাগে ভাগ করে দেশী কার্যক্রমের দায়িত্ব নিজের হাতে রেখে বৈদেশিক দায়িত্বটি অর্পণ করেন আইয়ুব মোনায়েমের প্রিয়পাত্র সাবেক তথ্য পরিচালক নাজিমউদ্দিন হাশিম নামক একজন সিএসপি আমলার হাতে। সিআইএর বিশ্বস্ত অনুচর ও সামরিক গোয়েন্দার তল্পিবাহক নাজিমউদ্দিন সে-সময়ে বিদেশে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ সম্পর্কে এমন একটি কৌশলী প্রচারণার বন্যা বইয়ে দেন, যার ফলে বিদেশীদের দৃষ্টিতে বাংলাদেশ অপাঙক্তেয় ও বঙ্গবন্ধু একজন ব্যর্থ শাসক হিসেবে পরিগণিত হন। নাজিমউদ্দিন হাশিম এভাবে সেদিন যে অবদান রেখেছিলেন তারই পুরস্কার হিসেবে জেনারেল এরশাদের সামরিক সরকার তাকে তথ্য উপদেষ্টা বানিয়ে ছিলেন।

সিআইএর চর সাবেক সিএসপি সদস্য মাহাবুব আলম চাষী। মোশতাকের আত্মীয় ও একই জেলার অধিবাসী। ১৯৭১-এ মোশতাক তাকে পররাষ্ট্র সচিব করেন। ১৯৬৭ সালে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে পাক সরকার তাকে চাকরিচ্যুত করে। মোশতাকের পররাষ্ট্র সচিব হিসেবে তিনিও পাক কনফেডারেশনের সপক্ষে নানান চক্রান্তে মেতে ওঠেন। মোশতাককে বহিষ্কার করার সাথে সাথে মুজিবনগর সরকার ঐ মাহাবুব আলম চাষীকেও

বহিষ্কার করেন। বঙ্গবন্ধুর বদান্যত্যয় মোশতাক মন্ত্রিপরিষদে ফিরে এলে চাষীও চাকরিতে পুনর্বহাল হন। মোশতাকের নানান চক্রান্তমূলক কার্যকলাপের নিত্যসঙ্গী মাহাবুব আলম চাষীও বঙ্গবন্ধুর ভাবমূর্তি বিনষ্টকরণ, ১৯৭৪-এর কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি ও ১৯৭৫ এ বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে কার্যকরি ভূমিকা পালন করেন। খোন্দকার মোশতাক রাষ্ট্রপতি হয়ে তার আজীবনের অপকর্মের সহচর এই চাষীকে সরকারের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারীরূপে পুরস্কৃত করেন। অনুরূপভাবে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের চীফ সেক্রেটারী এস. এম. শফিউল আজম, যিনি পর্দার অন্তরালে থেকে তার সহকর্মী আমলাদের দিয়ে বঙ্গবন্ধু প্রশাসনকে হেয়সহ বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কলকাঠি ঘুরান। তিনি জিয়াউর রহমানকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার জন্যে কার্যকরি ভূমিকা পালন করেন। তারই পুরস্কার হিসেবে জেনারেল জিয়া তাকে প্রথমে তার প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী এবং পরবর্তীতে মন্ত্রী বানান।

আরেক সিআইএর চর, প্রভাবশালী আমলা, পাক সামরিক শাসক আইয়ুব-ইয়াহিয়ার জাতীয় নিরাপত্তা গেয়েন্দা শাখার পরিচালক এবিএস সফদর। চাকরির ধারাবাহিকতায় পাকিস্তান ফেরত এই সফদরকে বঙ্গবন্ধু এনএসআই'র মহাপরিচালক করেন। সে-সময় তিনি জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থকে না দেখে সিআইএর উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের জন্যে ও নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের কাজেই বেশি ব্যস্ত ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে পরিচালিত ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা তো করেনইনি বরং তিনি নিজেও ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে হাত মেলান। কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি ও বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে তিনিও বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তীকালে জেনারেল জিয়া তাকে রাষ্ট্রদূত বানিয়ে পুরস্কৃত করেন।

এ ব্যতীত সামরিক গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের অধিকাংশ পাকিস্তান প্রত্যাগত কর্মকর্তারা দেশী-বিদেশী চক্রান্তকারীদের দ্বারা আর্থিকভাবে লাভবান ও ক্ষমতার অংশীদারিত্বের আশ্বাসের প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধুকে হেয়করণ, ১৯৭৪-এর দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি ও ১৯৭৫-এর নির্মম হত্যাকাণ্ডসমূহ সংঘটিত করার পশ্চাতে বিপুল ভূমিকা পালন করেন। কথিত আছে যে, মেজর ফারুক-রশিদচক্র সে স্থানে অবস্থান নিয়ে ঘাতকবাহিনীকে প্রস্তুত করছিলেন, অবৈধভাবে ট্যাংক ও আর্টিলারী বাহিনীকে মহড়ার নামে জড়ো করেছিলেন, সেই স্থান থেকে মাত্র ৫০-৬০ গজ দূরত্বে ছিল মিলিটারী ইনটেলিজেন্সের একটি ইউনিট। তারা যদি ঐ হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত না

থাকতেন তাহলে তাদের সার্বক্ষণিক প্রহরা ও গোয়েন্দা তৎপরতা ভেদ করে কী করে চোখের সামনে ঐ আয়োজনটি সম্পন্ন করছিলেন? একইভাবে ডিএফআই, এফইউআইসহ অন্যান্য গোয়েন্দা শাখা রাষ্ট্র সরকার ও সামরিক বাহিনীর নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলার কার্যক্রমে কোনো ভূমিকা পালন করেনি। করলে এত বড় বড় সব নির্মমতা সংঘটিত হলো কেমন করে? তাদের গোয়েন্দা চোখকে ফাঁকি দিয়ে কীভাবে ঘাতকবাহিনী বিপুল সাজে সজ্জিত হয়ে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করলো অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায়? মোট কথা পাকিস্তানিমনা সামরিক-বেসামরিক আমলারা, যারা ছিল সামগ্রিক আমলাদের সিংহভাগ, তারা তাদের অন্যান্য স্তরের সহযোগীদের সাথে একজোট হয়ে বঙ্গবন্ধুকে হেয়, জনবিচ্ছিন্নকরণ, তার বিরুদ্ধে নানান গোয়েবলসীয় অপপ্রচারণার বিষবাষ্প সৃষ্টি, ১৯৭৪-এর খাদ্য সংকটকে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষে রূপান্তরকরণসহ ১৯৭৫-এর বঙ্গবন্ধু ও জেল হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করার পশ্চাতে শক্তিশালী কার্যক্রম চালিয়ে ছিলেন। তাইতো সেই নেতৃস্থানীয় সামরিক-বেসামরিক আমলাদের তাদের পুরস্কারসরূপ মোশতাক-জিয়া-সাত্তার-এরশাদ ও খালেদা সরকার পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন লাভজনক স্তরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন– মন্ত্রীত্ব প্রদান করেছেন। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

বঙ্গবন্ধু হত্যা-পূর্ব
দেশী-বিদেশী রাজনৈতিক ও সামরিক চক্রান্ত

'বাংলাদেশ : দি আনফিনিসড রেভ্যুলেশন' গ্রন্থের রচয়িতা লরেন্স লিফসুলজ ১৯৭৯ সালে বঙ্গবন্ধুর ৪র্থ মৃত্যুবার্ষিকীতে লন্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকায় এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেন যে, ১৯৭৫ সালের এপ্রিল মাসে খোন্দকার মোশতাক ও তার রাজনৈতিক সহযোগীদের সাথে সামরিক বাহিনীর সংযোগ ঘটে। মূলত এ সংযোগ সামরিক বাহিনীর পক্ষে প্রথম ঘটান মেজর রশিদ, যিনি ছিলেন মোশতাকেরই ভাগ্নে, মেজর ফারুকের ভায়রা ভাই। মোশতাক ও ফারুক-রশিদচক্র যার যার দৃষ্টিকোণ থেকে বঙ্গবন্ধুকে উৎখাতের চক্রান্ত বহুপূর্ব থেকেই করে আসছিলেন।

এ পর্যায়ে ফারুক সামরিক নেতৃত্ব প্রদানের জন্যে ডেপুটি চীফ অব আর্মি স্টাফ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের সাথে দেখা-সাক্ষাত করেন। জেনারেল জিয়া এ ব্যাপারে বেশ ইন্টারেস্ট দেখান এবং অভ্যুত্থান করার জন্যে মতপ্রকাশ করেন। এভাবেই হত্যাকাণ্ডের রাজনৈতিক ও সামরিক সংযোগ স্থাপিত হয়। অপরদিকে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের অন্যতম প্রধান খুনী ফারুক-রশিদ বিদেশী পত্র-পত্রিকা ও টেলিভিশনে একাধিকবার দাবি করেছেন যে, আগস্ট হত্যাকাণ্ডের সাথে জিয়া সরাসরি জড়িত ছিল। এ তথ্যটি যখন তারা প্রকাশ করে তখন জিয়া বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির পদে সমাসীন ছিলেন। তিনি এর প্রতিবাদ করেননি। এমনকি ফারুক-রশিদকে দেশে পেয়েও এ ব্যাপারে তিনি আর অগ্রসর হননি। এতে প্রমাণিত হয় যে জেনারেল জিয়া ঐ হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিলেন। এ ব্যতীত ১৯৯৩-এর জানুয়ারিতে ফ্রিডম পার্টিতে ভাঙন ধরলে খুনী ফারুক-রশিদ একে অপরকে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের খুনী বলার সাথে সাথে জেনারেল জিয়াকেও হত্যাকাণ্ডের হোতা হিসেবে একাধিকবার মন্তব্য-বক্তব্যমালা পেশ করেছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কর্মকর্তারা ১৫ আগস্ট অভ্যুত্থান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তৎকালীন ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের সিআইএ প্রধান ফিলিপ চেরী ক্যু-র সাথে তার জড়িত থাকার বিষয়টি অস্বীকার করে বলেন, 'বাংলাদেশীরা নিজেরাই মুজিবকে উৎখাত করেছে।' তাদের সাথে মোশতাকসহ কতিপয় ব্যক্তির সংযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'কিছু রাজনীতিক আছেন যারা বিদেশী দূতাবাসে ধর্ণা দিয়ে থাকে।'

লিফসুলজ বলেন, 'ওয়াকিবহাল বাংলাদেশী ও বিদেশী কূটনীতিকরা দাবি করেন যে, মোশতাক, তার সহকর্মী ও সামরিক বাহিনীর লোকেরা এক বছরেরও বেশি সময় ধরে মুজিবহত্যার চক্রান্তে লিপ্ত ছিলেন। ঢাকাস্থ আমেরিকান দূতাবাসের জনৈক কর্মকর্তা ও দেশীয় সূত্রের মতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সর্বোচ্চমহল মুজিব হত্যার সম্মতি দিয়েছিল। হত্যাকাণ্ডের দু'মাস আগে থেকেই দেশীয় ব্যক্তিরা দূতাবাসের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করেছিল। .... ১৯৭৪ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত এ সমস্ত লোকের সাথে মার্কিন কর্মকর্তাদের অনেকগুলো বৈঠক হয়েছিল।'

ঐ প্রতিবেদনে বুঝা যায় যে, ঐসব বৈঠকে কোনো সামরিক কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিল না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে মেজর ফারুক নিজেই বলেছেন, তিনি ১৫ আগস্টে বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করেন যে, যখন তারা হত্যাযজ্ঞ সম্পন্ন করছিল ঠিক একই সময় মার্কিন দূতাবাসের অনেকগুলো গাড়ি শহরের এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছিল।

ফারুক নিজেকে হত্যাযজ্ঞের নায়ক হিসেবে প্রচার করলেও তার এ বক্তব্যেই প্রমাণিত হয় যে, তিনি এবং তার সহযোগীরা ছিলেন মূলতঃ ভাড়াটে খুনী বা কামলা। খোন্দকার মোশতাক-জিয়াচক্র এই ভাড়াটে খুনী-কামলাদের দিয়ে কাজ সমাধা করেছে। রশিদ বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করেন যে, যখন মোশতাককে বেতার কেন্দ্রে নিয়ে যান, তার আগেই তাহেরউদ্দিন ঠাকুর ও মাহবুব আলম চাষী সেখানে উপস্থিত। অপরদিকে তাহের ঠাকুর পশ্চিমা এক সংবাদদাতার কাছে এই মর্মে দাবি করেন যে, হত্যাকাণ্ডের দুদিন আগে তার বাড়িতে এ হত্যার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়।

মোশতাকচক্রের এ ধরনের একটি গোপন সভা সম্পর্কে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন লেখক-সাংবাদিক একটি চমকপ্রদ কাহিনী বলেছেন। সেই লেখক-সাংবাদিকের ভাষ্য : "১৯৭৫ সালের ১২ আগস্টের শেষ ১৩ আগস্টের শুরু। সম্ভবত রাত ১টা। পত্রিকা অফিসের কাজ সেরে আমি আমার বাসায় (ফার্মগেট ইন্দিরা রোডের পশ্চিম মাথায়) ফিরছিলাম পায়ে হেঁটে। ইন্দিরা রোডস্থ সাবেক পাসপোর্ট অফিসের পাশ দিয়ে পশ্চিম রাজাবাজারমুখী বাইলেনের কাছে আসতেই শাঁ করে আমার সামনে দিয়ে একটা লাল ডাটসান চলে গেল। অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম গাড়িতে মোশতাক, তাহের ঠাকুর ও অন্য আরেকজন। আমি নিজেকে একটা গাছের

আড়ালে লুকাই। আরেকটি গাড়ি আসছে ফার্মগেটের দিক থেকে। একই পথে গিয়ে ঢুকলো সাবেক পুলিশের আইজি মহিউদ্দিন দোহার বাড়িতে। স্বয়ং বোস্টার। তার সাথে আরো ২-৩ জন বিদেশী। আমার গায়ের লোমগুলো ততক্ষণে শিরশির করে উঠলো। এ কী দেখছি! তবে কি....। প্রতিদিনই তো নানান ষড়যন্ত্রের কথা কানে আসছে। এই কি তার...। আরেকটি গাড়ি এলো ৩-৪ জন সুঠামদেহী লোক। বাঙালি। কাউকে না চিনলেও একজনকে আমার চেনাচেনা মনে হলো তবে স্মরণ হচ্ছিল না। .... তারপর বেশ সময় কেটে গেল। আর কোনো গাড়ি এলো না। বুঝলাম আর হয়তো আসবে না। এবার আমি পায়ে পায়ে দোহা সাহেবের বাড়ির গেটে গেলাম। আমি তো এখানেরই বাসিন্দা।....বিরাট লোহার গেট। বন্ধ। অবাক হয়ে দেখলাম, বাসভবনের দোতলায় একটি কক্ষে বাতি জ্বলছে। গেটের পাশে একটুখানি ছিদ্রপথে দৃষ্টি দিতেই দেখলাম আমার পরিচিত বিহারী দারোয়ানটা টুলের ওপর বসে ঝিমুচ্ছে। মৃদু টোকা মারলাম। ভেতর থেকে ক্ষীণকণ্ঠ ভেসে এলো, কৌন?

খান সাব, দরওয়াজা খোলা। আমি বললাম।

কৌন হ্যায় এতনা রাত মে!

আমাকে তুমি চেনো। আমার ম্যাচ দরকার, সিগারেট....

তখনি গেটের মধ্যে ছোট দরজা খোলার শব্দ। খান মাথা এগিয়ে দিয়ে বললো, আরে আপনি!

আর বলো না, নেশা লাগছে, তাই।

খান হেসে ওঠে। রিপোর্টারদের নেশা একটু বেশি তো।

আমি হাসি। খান হাসে। সিগারেট ধরালাম। আমার অনেক দিনের পরিচিত খান। আমাকে বেশ সমীহ করে। আমি এতো রাতে ২-৩ টা গাড়ি ঢোকার কথা জিজ্ঞেস করতেই খান চাপাস্বরে বললো, আর বলবেন না! প্রায়ই এমনি রাতে এরা এ বাসায় আসে। কি করে কে জানে। ... তবে ভালই লাগে, আমাকে এরা ভাল বকশিস দেয়।

আমি আর কোনো কথা জানতে চাইলাম না। আমার যা জানার দরকার খান তা বলেছে, প্রায়ই রাতে এরা এখানে আসে, কি করে....।

খানকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি বাসায় ফিরে আসি। তখন রাত দেড়টা। আমার বাসা অর্থাৎ এক কক্ষের বাসা। বার বার ঘুরে ফিরে একটা প্রশ্নই ঘুরপাক খেতে লাগল, এ কি দেখলাম? তবে এতদিন যা শুনে এসেছি তাই নিজের চোখে দেখলাম। মোশতাক, তাহের ঠাকুর, বোস্টার আরো অপরিচিত কতিপয় মুখ। এরা কি ষড়যন্ত্রকারী? কিসের ষড়যন্ত্র? আমার ঘুম

চলে গেল।...কক্ষে তালা ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা। দুর্ধর্ষই ছিলাম। অনেক বড় বড় চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে এসেছি। এ কি কোনো চ্যালেঞ্জ? ওদেরকে তো আমিও চিনি। ওদের উদ্দেশ্য আর যাই হোক, নিশ্চয়ই কোনো অশুভের ইংগিত বহন করে আনছে। ইত্যাদি চিন্তা করতে করতে বন্ধু খালেকের বাসায় গিয়ে নক করলাম। রাত তখন ৩টারও ওপরে। খালেকও একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং বঙ্গবন্ধুর অনুসারী। তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে সব খুলে বললাম। তারপর সিদ্ধান্ত নিলাম, এক্ষণি বঙ্গবন্ধুর বাসায় যাবো, তাঁকে সব খুলে বলবো। ভাবী চা করে আনলেন। তিনিও সায় দিলেন। যেভাবেই হোক, এ সংবাদ তাঁকে জানাতেই হবে। ভাবী উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন।

.... তখন ভোর সাড়ে ৫টা। চারদিকে ফর্সা হয়ে উঠেছে। আমি ও খালেক বঙ্গবন্ধুর ৩২ নং সড়কের মুখে যেতেই দুজন পুলিশ এগিয়ে এলো। রাতে এ রোড বন্ধ। কিছুতেই ঢুকতে দিল না।.... আমি জানতাম বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের গেটে সেনাবাহিনীর লান্সারের একদল সৈন্য পাহারায় থাকে। সেখানে আমার চাচাতো ভাইও আছে। হাবিলদার। তার কথা বলতেই একজন পুলিশ চলে গেল তাকে খবর দেবার জন্যে।

.... হাবিলদার জহুর এলো। আমাদের নিয়ে গেল ওদের তাঁবুতে। তাকে বললাম, বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করতেই হবে। জরুরি কথা আছে।

জহুর জানালো, দেখা করার ব্যাপারে সে কোনো ভূমিকা রাখতে পারবে না। তবে প্রেসিডেন্ট সাহেব একটু পরে নিচে নেমে বাসভবন চত্বরে হাঁটবেন। .... নিচু ওয়ালের এ পাশে দাঁড়িয়ে যদি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারা যায়, তখন যদি ডাকেন।

আমরা তাই করলাম। নিচু ওয়ালের এপাশে দাঁড়িয়ে থাকলাম। সহসা বঙ্গবন্ধু নেমে এলেন। পরনে লুঙ্গি-পাঞ্জাবী। হাতে পাইপ। কয়েকবার এদিক ওদিক পায়চারী করার পর তাঁর দৃষ্টিতে আমরা পড়লাম। চারদিক বেশ ফর্সা হয়ে গেছে। আমি হাত উঠিয়ে সালাম দিতেই তিনি ম্লান হাসলেন। হাত ইশারায় ডাকলেন।... ল্যান্সাররা গেট খুলে দেয়। বঙ্গবন্ধু ততক্ষণে রাসেলের ছোট্ট দোলনার ওপর একটুখানি পা উঠিয়ে দিয়ে পাইপ টানছেন।... মুখখানি থমথমে। মনে হচ্ছিল রাতে ঘুম হয়নি। কাঁচাপাকা কয়েকগাছি চুল এসে পড়েছে কপালের ওপর। বঙ্গবন্ধুকে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল। আগের চেয়ে ঢেড় মোটা হয়েছে। মুখের রং লালচে উজ্জ্বল রক্তিম দেখাচ্ছিল।

কিরে মুক্তি, এত্তো সকালবেলা কী মনে কইরা? হাসি হাসি কণ্ঠে বললেন বঙ্গবন্ধু, দেইখা তো মনে হইতেছে রাইতে ঘুমাও নাই ।

আমি ও খালেক বঙ্গবন্ধুকে ঘিরে দাঁড়াই । তিনি দোলনার ওপর বসে দু'পায়ের ওপর ভর ছেড়ে দিয়ে আমার দিকে তাকালেন । আমি সংক্ষেপে গতরাতের ঘটনাবলী বলে গেলাম । সহসা তিনি প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, ওহ! ষড়যন্ত্র ষড়যন্ত্র! কি পেয়েছো তোমরা? তোমাদের কি আর কোনো কাজ নেই । এই নিয়ে আমাকে আর কত জ্বালাতন করবা । আমি তো একটা মানুষ! অতো অশণির কথা আর কতো শুনবো । .... ওসব আমি আর শুনতে চাই না ।.... অশান্তি, দুশ্চিন্তা আর হতাশার মধ্যে আর কতো হাবুডুবু খাবো? দেশটা কি আমার একার যে সবকিছুই একা আমাকে দেখতে হবে? তোমরা, ওরা, কি জন্যে আছো? বলেই বঙ্গবন্ধু উত্তেজনায় হাঁফাতে থাকেন ।

কিছুক্ষণ পর শান্ত ও কান্নাধরা কণ্ঠে বললেন, আমি জানিরে, তোরা আমারে কতো ভালোবাসোস । কিন্তু আমি বুঝি না, আমার গোয়েন্দা, পুলিশ আর সামরিক বাহিনী ওরা কি করে, ওদের কাজটা কি? আসলে কি জানিস, পাক ম্যান্ট্যালিটি বদলায়নি ।... তোরাই বল, আমি অহন কি করবো? বলেই তিনি সস্নেহের দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকালেন । তারপর বললেন, তোদের এ খবরের মতো আরো খবর প্রত্যেক দিন, ঘণ্টায় ঘণ্টায় আমাকে শুনতে হয় । কান আমার ঝালাপালা হইয়া গেছে । .... যেদিকে তাকাই, যার দিকে তাকাই দেখি আমার লোক । কাকে বিশ্বাস করবো, কাকে অবিশ্বাস করবো ।....

ঠিক তখনি অবাক চোখে দেখলাম খোন্দকার মোশতাক এসে হাজির । তার মুখে হাসি । আমরা তাকাই তার দিকে । বঙ্গবন্ধু তাকান । একরাশ হাসি হেসে বঙ্গবন্ধু বললেন, আসুন মন্ত্রী মহোদয় ।

আমি আর খালেক পড়ি কি মরি ত্রস্থপায়ে সে-স্থান ত্যাগ করি । গেটের বাইরে বেরিয়ে ফিরে তাকাতেই দেখি বঙ্গবন্ধু আমাদের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ।....”

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের রাজনৈতিক ও সামরিক চক্রান্তের সমন্বয়

দেশী-বিদেশী চক্রান্তে সৃষ্ট ১৯৭৪-এর দুর্ভিক্ষ বেশিদিন প্রলম্বিত হলো না। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর আওয়ামী লীগ অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে দুর্ভিক্ষকে মোকাবেলা করেন। তবুও স্বীকার করতেই হবে যে, ঐ দুর্ভিক্ষের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর ভাবমূর্তি অনেকখানি ক্ষুণ্ন হয়ে যায়। দুর্ভিক্ষের মধ্য দিয়ে অর্জিত তিক্ত অভিজ্ঞতা ও দেশের মানুষের সার্বিক অর্থনৈতিক মুক্তির বৈপ্লবিক চিন্তায় বঙ্গবন্ধুকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পদক্ষেপ নিতে হয়। শুরু হলো বাকশাল বা দ্বিতীয় বিপ্লব সম্পন্ন করার প্রক্রিয়া। এতে সাম্রাজ্যবাদ ও তার এদেশীয় সেবাদাসরা প্রমাদ গুনলো। তারা বুঝতে পারলো, শেখ মুজিব চরমতম পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছেন। তিনি তাদের শোষণ ও প্রতিপত্তি চিরতরে উৎখাতের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছেন। সাম্রাজ্যবাদ ও তার সেবাদাসরা দুর্ভিক্ষের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু সরকারকে দুর্বল করেছে সত্য কিন্তু পতন ঘটেনি। এ পর্যায়ে এসে তারা তাঁকে হত্যা করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এজন্যে ৫ কোটি মার্কিন ডলারের একটি তহবিলও গঠন করা হয়। এ বিষয়ে পরবর্তীতে আলোচনা করা হয়েছে।

বহুদিন পূর্ব থেকে হত্যা-চক্রান্তের জাল বুনে এর মধ্যকার দেশীয় রাজনৈতিক ও সামরিক ষড়যন্ত্রের হোতারা একটি কমান্ডে আসার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এ প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক চক্রান্তের নায়ক মোশতাকচক্রের সাথে মেজর রশিদ-ফারুকের সামরিকচক্রের মিলন ঘটে। আর এ মিলনের নেপথ্যে ছিল মোশতাক-রশিদের মামা-ভাগ্নে সম্পর্ক। মূলতঃ মোশতাক-রশিদ বহু পূর্ব থেকে ষড়যন্ত্র সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল। এন্থনী ম্যাসকারনহাস তার 'বাংলাদেশ : এ লিগ্যাসী অব ব্লাড' গ্রন্থে মোশতাক-রশিদের মিলনের প্রথম ঘটনাটি দেখিয়েছেন মাত্র ২ আগস্ট ১৯৭৫ তারিখে। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, রশিদ মোশতাকের সাথে পূর্ব নির্ধারিত এ্যাপয়ন্টমেন্ট অনুযায়ী মোশতাকের ঢাকাস্থ নিজস্ব বাসভবন আগামসিহ লেনে দেখা করেন। একজন রাজনীতিকের বাসায় একজন সৈনিকের আগমন বিষয়ে যাতে কারো মনে কোনো সন্দেহ না জাগে তার জন্যে রশিদ একখানি স্কুটার কেনার পারমিটের দরখাস্ত পকেটে রাখে। মোশতাক তাকে দোতলায় একটি কক্ষে নিয়ে যান। কিছুক্ষণ টুকিটাকি

বিষয়ে আলাপের পর মেজর রশিদ দেশের রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে প্রায় দু'ঘণ্টা আলোচনা করেন।

রশিদের স্মৃতিচারণ, 'আমরা কিছুক্ষণ রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করি। পরোক্ষভাবে জানতে চেয়েছিলাম এতে তিনি কি রকম বোধ করেন। পরে আমি তাকে বলেছিলাম, আওয়ামী লীগের প্রবীণ সদস্য ও শেখ মুজিবের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ লোক হিসেবে শেখের নেতৃত্বে কোনো উন্নতি জাতি প্রত্যাশা করতে পারে কিনা।'

জবাবে তিনি বলেন, 'না, তিনি তা মনে করেন না।'

'তাহলে তাকে আপনারা কেন পরিত্যাগ করছেন না' প্রশ্ন করায় তিনি বলেন, 'কাজটা সহজ নয়।'

আমি বললাম, 'দেশের এ পরিস্থিতিতে কেউ যদি তাকে জোর করে সরিয়ে দেয় তাহলে?'

মোশতাকের জবাব, 'দেশের জন্যে তাহলে ভাল হবে। কিন্তু কাজটা খুব কঠিন।'

আমি (ম্যাসকারনহাস) রশিদকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তিনি কি তাতে রাজি হয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ। তিনি রাজি হয়েছিলেন। এমনকি মোশতাক আমাকে এটাও জিজ্ঞেস করেছিলেন, কেউ যদি তাকে (মুজিবকে) সরিয়ে দেয় তাহলে তার তো একজন বিকল্প থাকতে হবে। তখন আমি তাকে বলেছিলাম, কেউ যদি এরকম ভেবে থাকে তাহলে তারা নিশ্চয়ই মুজিবের বিকল্প স্থির করেছে।' রশিদ বলল।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'মোশতাক কি তার কথা বুঝতে পেরেছিলেন?'

রশিদ জানায়, 'নিশ্চয়ই। আমি যখন তার সাথে আলাপ করতে গিয়েছি তখন নিশ্চয়ই তিনি এটা বুঝে থাকবেন। না বোঝার কথাও নয়।' মেজর রশিদের এ প্রস্তাব পেয়ে মেজর ফারুক বলে, 'তুমি ঠিকই করেছো, এটা তোমার ব্যাপার।'

উল্লেখ্য যে, খুনী সামরিকচক্র বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সামরিক ও রাজনৈতিক দিকটা ভাগ করে মেজর ফারুককে হত্যাকাণ্ডের অপারেশন আর রশিদকে রাজনৈতিক ও অন্যান্য সামরিক নেতৃত্বকে ট্যাকেল করার দায়িত্ব অর্পণ করে।

খুনীচক্রের শলাপরামর্শ

১২ আগস্ট। ১৯৭৫। ঢাকা সেনানিবাস। গলফ ক্লাব। মেজর ফারুক ও তার স্ত্রী ফরিদার তৃতীয় বিয়ে বার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠান। উচ্চ পর্যায়ের সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তারা আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন। যারাই সেদিন আমন্ত্রিত হয়েছিলেন সম্ভবত তারা সে-অনুষ্ঠানের কথা কোনোদিনই ভুলতে পারবেন না। কে জানতো ঐ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে খুনীচক্র একটি হৃদয় বিদারক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করার একটি উল্লাসঘন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। এটাকে বলা চলে খুনীদের মহাসম্মেলন।

ম্যাসকারনহাস বর্ণনা করেছেন, অনুষ্ঠানে সামরিক ব্যান্ডে আধুনিক বাংলা গানের সুর ভেসে আসছিল। ক্লাবের মধ্যে রান্না হচ্ছে। খাসির বিরিয়ানী, কাবাব, সুস্বাদু তরকারি এবং নানান ধরনের সালাদ। চারপাশে প্রচুর সামরিক লোকজন। চীফ অব জেনারেল স্টাফ ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ, রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু মুজিবের সামরিক সচিব ব্রিগেডিয়ার মাশহারুল হক এবং ডেপুটি চীফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন। জেনারেল জিয়ার উপস্থিতির বিষয়টি ম্যাসকারনহাস এড়িয়ে গেলেও ফারুকের লান্সার বাহিনীর জনৈক হাবিলদার সে-অনুষ্ঠানে একজন তদারককারীর ভূমিকা পালন করে, সে এই লেখককে এ তথ্য জানায়। উপস্থিত হয়েছিলেন মেজর রশিদ (ফারুকের ভায়রা) সহ তাদের সহযোগী বহু মেজর। চাকরিরত এবং চাকরিচ্যুত। সকলেই মেজর ফারুক ও তার স্ত্রী ফরিদাকে শুভেচ্ছা জানাতে এসেছেন, সঙ্গে নিয়ে আসেন নানান উপঢৌকন।

আনন্দ উল্লাসের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হলো। একে একে সকলেই বিদায় নিলেন। মেজর ফারুক তার ভায়রা মেজর রশিদকে একপাশে ডেকে নিয়ে বললেন, 'আমি এটা ১৫ তারিখেই করতে যাচ্ছি। শুক্রবার সকালে আমি মুজিবকে চিরদিনের মতো সরিয়ে দিতে চাই।'

রশিদ ভীতদৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকায়। তাদের কয়েক মাসের গোপন পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। রশিদ বিষয়টিতে মুষড়ে পড়লে ফারুক তাকে ভয় দেখায়, আমি ব্যর্থ হলে ওরা তোমাকেও ফাঁসিতে লটকাবে। রশিদ এতে রাজি হয় এবং আরো অফিসারদের সাথে নেয়ার প্রস্তাব করে।

১৩ আগস্ট। দুপুর আড়াইটায় মেজর রশিদ তার মামা খোন্দকার মোশতাকের সাথে তার আগামসিহ লেনস্থ বাসভবনে এক বৈঠকে মিলিত হয়। রশিদ মূলতঃ জানতে গিয়েছিল যে, মোশতাকের আগামী কিছুদিনের মধ্যে বাইরে যাবার কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা। জবাবে মোশতাক না-সূচক জবাব দেন। ধূর্ত শেয়াল চরিত্রের মোশতাক যে এই মেজরচক্রকে খেলাচ্ছেন সমস্ত ধরা-ছোঁয়ার ঊর্ধ্বে থেকে, তা এই সামরিক কামলাবাহিনী বুঝতেই পারছে না।

মোশতাক তাদের সঙ্গে আছেন, এ ধারণা বদ্ধমূল। কারণ, তিনি তো তারই আত্মীয়। এর পূর্বে মোশতাকের সাথে তার আলোচনার পর তিনি তাদের সমমনা মুজিববিরোধী আরো কিছু সামরিক অফিসারের সন্ধানে প্রবৃত্ত হন। রশিদ কর্মরত অফিসারদের ওপর পুরোপুরি আস্থা রাখতে পারছিলেন না। কাজেই সেনাবাহিনী থেকে চাকরিচ্যুত অফিসাররা তাকে সহায়তা করবে বেশি। তিনি জানতেন, বেশকিছু অফিসারকে নানান দুর্নীতি ও শৃঙ্খলাজনিত কারণে সেনাবাহিনী থেকে বিদায় দেয়া হয়েছে। তারা তো মানসিকভাবেই সরকারবিরোধী। এ পর্যায়ে রশিদের মনে প্রথম ধরা দেয় মেজর শরীফুল হক ডালিমের নাম। ডালিমকে কয়েক মাস আগে অবসর দেয়া হয়েছে তার ঔদ্ধত্বমূলক আচরণের কারণে। এই ডালিম সম্পর্কে রাজনৈতিক-সামাজিক অঙ্গনে নানান কাহিনী প্রচলিত আছে। অপপ্রচারকারীদের কেউ কেউ বলেন, শেখ কামাল নাকি ডালিমের স্ত্রীর প্রতি অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছিলেন। ডালিম বঙ্গবন্ধুর কাছে বিচার চাইতে গেলেই নাকি তিনি তাকে বরখাস্ত করেন। এ জাতীয় কাহিনী ছিল পরবর্তীতে ডালিম-ফারুকচক্রের ফাঁদানো গল্প। উদ্দেশ্য বঙ্গবন্ধুর ইমেজ ধ্বংস করা, তাকে হেয় করা। বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার কয়েক মাস পূর্ব থেকে এ কাহিনীটি সর্বমহলে চক্রান্তকারীদের কারসাজিতে সমালোচনার বস্তুতে পরিণত হয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ারও বেশ কিছুদিন পর আসল ঘটনা প্রকাশ পায়। প্রকৃতপক্ষে মুজিববিরোধী সামরিকচক্রটি বেশ কায়দা করে এ কাহিনী সাজিয়ে সামরিক বাহিনীতে বঙ্গবন্ধুবিরোধী একটা ধুম্রজাল সৃষ্টি করে, যেমন করা হয়েছিল রক্ষিবাহিনী ও অন্যান্য নানান বিষয়কে কেন্দ্র করে। ডালিমের সেই কাহিনীটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

ঢাকা ক্লাবের এক বিয়ের অনুষ্ঠানে ডালিম ও তার স্ত্রী যোগদান করে। ঐ অনুষ্ঠানে গাজী গোলাম মোস্তফার ছেলেও আমন্ত্রিত ছিল। শেখ কামালও আমন্ত্রিত হয়। গাজীপুত্রের সাথে একদা ডালিম স্ত্রীর গভীর প্রেম ছিল। সব জেনেও মেজর ডালিম তাকে জোর করেই বিয়ে করে। এই অনুষ্ঠানের মধ্যে

ঘটনাচক্রে ডালিম-স্ত্রী ও গাজীপুত্রের সাক্ষাত ঘটে। ডালিম একটু দূরে তার বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিচ্ছিল। হঠাৎ সে দেখতে পায় তার স্ত্রীর সাথে গাজীপুত্র কথা বলছে। শোনা যায় ডালিম এক উচ্ছৃঙ্খল বদমেজাজের যুবক। তার মাথা গরম হয়ে ওঠে। প্রায় দৌড়ে গিয়ে স্ত্রীকে এক হেঁচকা টানে সরিয়ে গাজীপুত্রের কলার চেপে ধরে ডালিম তাকে ঘুষি মারে। অপরদিকে সেও ডালিমের চুল ধরে টেনে মাটিতে ফেলে ফুটবলের মতো খেলতে থাকে। উভয়ের এই ঘুষি-লাথির মারামারি দেখে অনেকের মতো শেখ কামালও ছুটে আসে এবং গোলমাল থামায়। এক পর্যায়ে মেজর ডালিম স্ত্রীকে নিয়ে অনুষ্ঠান ত্যাগ করে সোজা গিয়ে হাজির হয় বঙ্গবন্ধু ভবনে। রাষ্ট্রপতি সবেমাত্র গণভবন থেকে বাসায় এসে ডাইনিং টেবিলে খানা খাচ্ছেন। ঐ মুহূর্তে হইচই করতে করতে ডালিম হাজির হয় সেখানে। ইনিয়ে বিনিয়ে নালিশ জানায়। বঙ্গবন্ধু খাওয়া রেখে ডালিমের বক্তব্য ধৈর্য সহকারে শোনেন এবং বিষয়টি তিনি দেখবেন বলে জানালেন। তাতেও ডালিমের রাগ পড়েনি। এক পর্যায়ে ডাইনিং টেবিলের ওপর বঙ্গবন্ধুর খাবার থালার কাছে সজোরে ঘুষি মেরে ডালিম চিৎকার করে ওঠে, এক্ষুণি বিচার না করলে এর পরিণাম ভাল হবে না! বঙ্গবন্ধুর ভাতের থালাটা আগেই ডালিমের থাবায় পড়ে গেছে। একবার তিনি সেদিকে তাকালেন, ছলছল চোখে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি কি একটা দেশের রাষ্ট্রপতি! .... কিছুদিন পর রাষ্ট্রপতির সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণের অভিযোগে সেনাবাহিনী থেকে মেজর ডালিমকে অবসর দেয়া হয়।

রশিদও ডালিমকে ভাল করেই জানে। উচ্ছৃঙ্খলতা যেখানে ডালিম আছে সেখানে। সময় পেলেই ডালিম সেনানিবাসে এসে শেখ মুজিব ও অনেকের বিরুদ্ধে নানান কুৎসা রটনা করে থাকে। সুতরাং ডালিমকে পাওয়া যাবেই বলে রশিদ নিশ্চিত হয়। ডালিম ইতিপূর্বে মেজর রশিদের আর্টিলারীতে কর্মরত ছিল। রশিদ ডালিমকে তার সাথে সাক্ষাত করার অনুরোধ জানায়।

ডালিম সকালবেলা (১৩ আগস্ট) রশিদের সেনানিবাস্থ বাসভবনে আসে। ডালিম তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু চাকরিচ্যুত মেজর নূরকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দেয়। রশিদ রাজি হয় এবং পূর্বনির্ধারিত সময় অনুযায়ী গভীর রাতে ডালিম নূরকে নিয়ে পুনরায় রশিদের বাড়িতে আসে। সেখানে এই তিন মেজর পুরো পরিকল্পনার বিষয়ে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা করে এবং বঙ্গবন্ধুর বিকল্প হিসেবে মোশতাককে মনোনীত করে। কিন্তু মোশতাককে পাওয়া যাবে, বিষয়টি সম্পর্কে মেজর নূরের মনে সংশয় দেখা দিলে রশিদ

তাকে আশ্বস্ত করার জন্য আগামী ১৪ আগস্ট বিকেল ৫টায় আণবিক শক্তি কমিশন কার্যালয়ের সামনে অপেক্ষা করতে বলে। নূরকে সে মোশতাকের বাড়িতে নিয়ে যাবে। নূর সম্মতি দেয়।

পরদিন নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে মেজর রশিদ সবিস্ময়ে দেখে যে মেজর নূরের পাশে আরেক চাকরিচ্যুত মেজর শাহরিয়ার দাঁড়িয়ে রয়েছে। শাহরিয়ার প্রথমেই রশিদকে অভ্যর্থনা জানায়। রশিদ আশ্বস্ত হয় এবং অতঃপর তারা তিন মেজর মোশতাকের বাড়ির দিকে গমন করে।

খোন্দকার মোশতাক এই তিন মেজরকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করেন এবং দোতলায় তার বেডরুমে নিয়ে যান। নূর ও শাহরিয়ার মোশতাকের আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়। ওখানে তারা সৌজন্যমূলক আলোচনা শেষ করেন। পথিমধ্যে নূর ও শাহরিয়ার যে-কোন সময়, যে-কোন দিন যে-কোন পরিস্থিতিতে তাদেরকে পাওয়া যাবে বলে মেজর রশিদের কাছে অঙ্গিকার করে। রশিদ তখনই নূর ও শাহরিয়ারকে আজ রাত ১০টায় নিউ এয়ারপোর্ট প্রশিক্ষণ মহড়া কেন্দ্রে তার ও মেজর ফারুকের সাথে সাক্ষাৎ করার প্রস্তাব দেয়। রশিদ সেখানে তাদের সামরিক প্রস্তুতি দেখার ও বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলাপ-আলোচনার জন্যে আমন্ত্রণ জানায়।

বিভীষিকাময় ১৫ আগস্ট : বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড

ক. প্রশিক্ষণ মহড়ার নামে সৈন্যদের একত্রিকরণ

পূর্ব নির্ধারিত রুটিন অনুযায়ী ১৪ আগস্ট রাত ১০টায় ১ম বেঙ্গল লান্সার ও ২য় ফিল্ড আর্টিলারী যৌথ মহড়ার নিমিত্তে ৬০০ সৈন্যকে নির্মিয়মান নতুন এয়ারপোর্টে জড়ো করা হলো। তখনও সৈন্যরা জানে না তাদের কমান্ডারদের মনে কী আছে। ফারুক-রশিদ অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করছিল যাতে সাধারণ সৈন্যরা ঘাবড়ে গিয়ে সব আয়োজন পণ্ড করে না দেয়। অন্যান্য সময়ের মতো এটাকে গতানুগতিক মহড়া ভেবেছিল সৈন্যরা। তবে অদ্যকার মহড়ার মধ্যে যে নানান অস্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে তা সাধারণ সিপাহী ও তাদের ননকমিশনড অফিসাররাও টের পেল না। যেমন একটি অস্বাভাবিক বিষয় ছিল, আর্টিলারী রেজিমেন্টের তিন কোম্পানী ব্যাটারীকে মেজর রশিদ নির্দেশ দেয় তারা যেন রাইফেলসহ ১২টি ট্রাকে মহড়ার স্থানে চলে যায়। এহেন অসংগতিপূর্ণ অবস্থাতেও সৈন্যদের মনে কোনরূপ ভাবান্তর হলো না। কারণ মেজর রশিদ প্রায়শই এ ধরনের রুটিনবিরোধী কার্যকলাপ করে থাকেন যার ফলে এটিকেও তারা স্বাভাবিক ধরে নেয়।

রশিদ ৬টি ১০৫ মি. মি. ইয়াগোশ্লাভ হাউটজার এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ গোলাবারুদ সংগ্রহ করে আনে। এর ক্রুরা ঘূর্ণাক্ষরেও বুঝতে পারলো না যে তাদের কামানের লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে শেরেবাংলা নগরস্থ রক্ষিবাহিনীর হেডকোয়ার্টারের দিকে। ১১টি ফিল্ড মেশিনগান আনা হলো ইউনিট হেডকোয়ার্টারে। ১৮তম কামানটি ক্রুসহ নেয়া হলো কোয়ার্টার মাইল দূরবর্তী লান্সার গ্যারেজের কাছে, যেখানে মেজর ফারুকের বেঙ্গল লান্সারের ২৮টি টি-৫৪ ট্যাংক মোতায়েন রয়েছে। উল্লেখ্য যে তখন ঢাকায় সর্বমোট ৩০টি ট্যাংক ছিল। যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে দুটি ট্যাংক পরিত্যক্ত হয়। উক্ত মহড়াস্থলে কমান্ডিং অফিসার ছাড়াও প্রত্যেক ইউনিটের ৪ জন করে ১৩ সামরিক অফিসার সেখানে উপস্থিত ছিল। আর বাকি অফিসারদের অদ্যকার মহড়া থেকে বাদ দেয়া হয় যাদের ওপর ফারুক-রশিদের আস্থা ছিল না। যে ৬০০ সৈন্যকে ব্যবহার করা হবে তাদের ওপর ফারুক-রশিদের পরম আস্থা ছিল। প্রথম কারণ, ফারুক-রশিদ তাদের কমান্ডিং অফিসার। কমান্ডিং

অফিসারের যে কোন কমান্ড মানতে নীতিগতভাবে সাধারণ সৈন্যদের কোন আপত্তি চলে না।

দ্বিতীয়তঃ বহুদিন পূর্ব থেকে তারা তাদের অধীনস্থ সৈন্যদের মগজ কৌশলে বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে উত্তপ্ত করে রেখেছিল।

তৃতীয়তঃ ফারুক-রশিদ সাধারণ সৈন্যদের জন্যে এমন একটা বক্তব্য তৈরি করে রেখেছে যার মর্মার্থ হলো : আগামীকাল ১৫ আগস্ট শেখ মুজিব সামরিক বাহিনীকে বাতিল করে দিচ্ছেন। এ জাতীয় চাকরিভীতি সৈন্যদেরকে যে-কোন পদক্ষেপ বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।

চতুর্থতঃ সৈন্যদেরকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে লোভনীয় অর্থপ্রদানসহ শাসনক্ষমতা দখল করে তাদের প্রভাবপ্রতিপত্তি সংরক্ষণ করা। এভাবেই আস্থাসৃষ্টির সকল পরিপ্রেক্ষিত অত্যন্ত সুকৌশলে সম্পন্ন করেই ফারুক-রশিদ তাদের সামরিক এ্যাকশনে প্রবৃত্ত হয়।

মেজর রশিদ এই ক্যু-কে সামরিক অভ্যুত্থানে পরিণত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ইউনিটকে সংশ্লিষ্ট করতে প্রচেষ্টা চালায়। সে পদাতিক বাহিনীকে এই ক্যু-তে অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে জয়দেবপুরস্থ ১৬তম পদাতিক ইউনিটকে অদ্যকার মহড়ায় অংশ নিতে আমন্ত্রণ জানায়। রশিদের বন্ধু মেজর শাহজাহান তাতে রাজিও হয় কিন্তু তাকে প্রকৃত উদ্দেশ্য জানান হলো না। তারা এলেই অবস্থার প্রভাবে তারাও অংশ নিতে বাধ্য হবে। এটা একটা সাইকোলজি, রশিদ জানতো।

মেজর রশিদ অতি উদ্বিগ্নের সাথে অপেক্ষা করছিল কখন আসবে মেজর শাহজাহান তার ইউনিট নিয়ে! আসছে না কেন মেজর ডালিম, নূর ও শাহরিয়ার!

রাত সাড়ে ১০টার দিকেও মেজর শাহজাহান এলো না, এলো তার ফোন। সে জানায় যে, তার ইউনিটের সৈন্যরা খুবই ক্লান্ত, যৌথমহড়ায় তারা অংশ নিতে পারবে না। এ সংবাদ শুনে রশিদ ঘাবড়ে গেল।

রাত ১১টার পর মেজর ডালিম, নূর, শাহরিয়ার, আজিজ পাশা ও মেজর বজলুল হুদাকে নিয়ে রশিদের কাছে এলো। মেজর হুদা মিলিটারী ইনটেলিজেন্সের একজন কর্মরত অফিসার। ডালিমের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এদেরকে নিয়ে রশিদ তার ১২ ট্রাক বোঝাই সৈন্য নিয়ে অনতিদূরে অবস্থানরত ট্যাংক গ্যারেজে মেজর ফারুকের সাথে যোগ দিল। সামরিক অপারেশনের প্রধান নেতা মেজর ফারুক তার সহযোগী অন্যান্য অফিসারদের উদ্দেশে পরিকল্পনা

পেশ করে নিজেদের মধ্যে ব্যাপকভাবে আলাপ-আলোচনা সেরে নিলেন এবং তারা প্রতিটি বিষয়ে ঐকমত্য প্রকাশ করলেন। উক্ত সময়ে উপস্থিত সামরিক কর্মকর্তাদের সর্বশেষ পদবীভিত্তিক তালিকা প্রদত্ত হলো, যথাঃ

(১) লেঃ কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমান
(২) লেঃ কর্নেল খন্দকার আব্দুর রশিদ
(৩) লেঃ কর্নেল শরীফুল হক ডালিম
(৪) লেঃ কর্নেল আজিজ পাশা
(৫) মেজর মহিউদ্দিন
(৬) মেজর শাহরিয়ার
(৭) মেজর বজলুল হুদা
(৮) মেজর নূর
(৯) মেজর রশিদ চৌধুরী
(১০) মেজর শরিফুল হোসেন
(১১) ক্যাপটেন কিসমত হোসেন
(১২) লেঃ খায়রুজ্জামান
(১৩) লেঃ আব্দুল মজিদ

হাবিলদার জহুরুল হক আরো বলেন, মেজর ফারুকের সহযোগী অফিসাররা যখন বৈঠক শেষে যে যার জায়গায় চলে যান ঠিক তখনই একটা টেলিফোন আসে। আমিই রিসিভার তুলি। অপর প্রান্ত থেকে একটা ভারী কণ্ঠস্বর ভেসে এলো : মেজর ফারুককে দাও। আমি তার নাম-পরিচয় জিজ্ঞেস করতেই তিনি আমাকে ধমক দেন, ফারুককে দাও! আমি কণ্ঠস্বর চিনে ফেললাম। তিনি জেনারেল জিয়া।

আমার থেকে ১৫ হাত দূরে মেজর ফারুক একজনকে কী যেন নির্দেশ দিচ্ছিলেন। ফোনের আওয়াজ পেয়ে তিনি প্রায় দৌড়ে আসেন। রিসিভার তুলেই বললেন, মেজর ফারুক, মেজর ফারুক স্যার। .... স্যার.... স্যার.... ইয়েস স্যার.... এভরিথিং ইজ কোয়াইট অলরাইট স্যার.... নো প্রোব্লেম স্যার .... ও-কে স্যার.... দ্যাটস গুড স্যার.... ইয়েস স্যার.... । এভাবেই মেজর ফারুক ফোনে তাঁর সাথে আলাপ করলেন।

খ. হত্যাযজ্ঞে অর্থের প্রলোভন ও ফারুকের উস্কানিমূলক বক্তৃতা

একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায় যে, "বঙ্গবন্ধুকে হত্যা ও আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাচ্যুত করার লক্ষ্যে তৎকালে ৫ কোটি মার্কিন ডলারের একটি আন্তর্জাতিক তহবিল গঠন করা হয়। এই তহবিলের টাকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কারো নির্দেশে নাকি ইরানের ক্ষমতাচ্যুত প্রয়াত সম্রাট রেজাশাহ পাহলভী তৎকালে তেহরানে নিযুক্ত একজন বাংলাদেশী কূটনীতিকের কাছে হস্তান্তর করেন। নির্দেশ মোতাবেক সেই অর্থ বাংলাদেশের একটি প্রভাবশালী পত্রিকার মালিকের কাছে পৌঁছে দেয়া হয় রাজনৈতিক ও সামরিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে। সেই অর্থের একটি অংশ বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে নেতৃত্ব প্রদান ও অংশগ্রহণকারী সামরিক কর্মকর্তা ও সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। কিছু অর্থ মোশতাকচক্রকে প্রদান করা হয় রাজনৈতিক-সামাজিক পরিস্থিতি সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণের জন্যে। বাকি সিংহভাগ অর্থ ঐ পত্রিকার মালিক একাই আত্মসাৎ করেন। জেনারেল জিয়া ক্ষমতা গ্রহণ করে অল্প কিছুদিনের মধ্যে সেই পত্রিকার মালিককে গ্রেপ্তার করেন এবং তার সাথে সমঝোতায় আসেন ও কিছুদিন পর তাকে ছেড়ে দেন।

১৫ আগস্ট হত্যাযজ্ঞে অংশগ্রহণকারী ৬০০ সৈন্যকে প্রত্যেককে ২ লক্ষ টাকা পুরস্কারস্বরূপ প্রদানের অঙ্গিকার করা হয় এবং তাৎক্ষণিকভাবে প্রত্যেককে ৫০ হাজার নগদ টাকা প্রদান করা হয় বলে ঐ হত্যাযজ্ঞে অংশগ্রহণকারী লান্সার হাবিলদার (অবঃ) জহুরুল হক এ তথ্য জানিয়েছে। হাবিলদার হক আরো বলেছে, "সৈন্যদেরকে রাত্রিকালীন প্রশিক্ষণ মহড়ার নামে বর্তমান জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে (তৎকালে নির্মিয়মান) জড়ো করে। ... সেখানে লান্সার অধিনায়ক ফারুক খুবই উত্তপ্ত ও আবেগঘনকণ্ঠে বলেন, আগামীকাল ইসলামের দুশমন, ভারতের দালাল, ফেরাউন শেখ মুজিব সামরিক বাহিনী ভেঙে দেবেন, ভারতীয় বাহিনী সেনাবাহিনীর দায়িত্ব পাবে! ... বাংলাদেশকে ভারতের অঙ্গরাজ্য ঘোষণা করে শেখ মুজিব এখানকার বাদশা হবেন এবং আজীবন অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপাল হবেন!..., শেখ মুজিবের ভাগ্নে শেখ মনি হবেন এখানকার মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর ভগ্নিপতি আব্দুর রব সেরনিয়াবাত হবেন একজন আজীবন মন্ত্রী, তাঁর অপর ভগ্নিপতি সৈয়দ হোসেন হবেন অঙ্গরাজ্যের চীফ সেক্রেটারী! রক্ষিবাহিনীকে বিশেষ রিজার্ভ ফোর্স হিসেবে রাখা হবে!.... আমরা সম্মিলিত সামরিক বাহিনী এ অবস্থায় দেশকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছি।... জেনারেল ওসমানী,

জেনারেল শফিউল্লাহ, জেনারেল জিয়া ও অন্যান্য ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তাসহ বিমান, নৌ ও বিডিআর বাহিনী একত্রে এ দায়িত্ব পালন করছে!.... আমাদের লান্সার ও ফিল্ড আর্টিলারীর ওপর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে যে, আমরা শেখ মুজিব, শেখ মনি ও আব্দুর রব সেরনিয়াবাতকে আটক করে জিম্মী করবো। কোনো অবস্থাতেই তাদেরকে হত্যা করা হবে না, তবে তোমাদের কমান্ডাররা পরিস্থিতি বুঝে ব্যবস্থা নেবেন।... ভারত যাতে প্রতিআক্রমণ করতে না পারে, এবং আমাদের ভয়েরও কোনো কারণ নেই, আমরা আমাদের এ্যাকশন শুরু করার সাথে সাথেই সমুদ্র ও বিমান পথে আমেরিকা, স্থলপথে চীন ও পাকিস্তান একযোগে ভারতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে! .... আমরা আমাদের মুসলমানদের পবিত্র মাতৃভূমি রক্ষা করতে যাচ্ছি এবং সাথে সাথে আমাদের সামরিক বাহিনীর নিরাপত্তা বিধান করতে যাচ্ছি এবং সাথে সাথে আমাদের জন্যে রয়েছে একটি পুরস্কার। প্রত্যেকে এ কাজে ২ লক্ষ করে টাকা পাবে।... এ ব্যতীত শেখ মুজিবের বাড়িতে রয়েছে শত শত কোটি নগদ টাকা ও সোনাদানা যা তারা লুটপাট করেছে। ওই টাকা সোনাদানাও আমাদের তোমাদের সকলের।... আর আজকে এ মুহূর্তে প্রত্যেকেই অগ্রিম হিসেবে পাবে ৫০ হাজার টাকা। টাকাটা এক্ষণি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাকিটা কাজ সমাধা করার পর দেয়া হবে।.... এ কথা শোনার পর সৈন্যদের মধ্যে চিত্তচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ..... ।

এরই মধ্যে মদ্যপ রিসালদার মোসলেহউদ্দিন উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, আমরা কেন ওদের আটক করবো, মেরে ফেললেই তো হয়।

মেজর ফারুক বলেন, এটা আমাদের ইচ্ছাধীন নয়, উপরের নির্দেশ।... আমরা সৈন্য, কমান্ড আমাদের শিরোধার্য।.... দোহাই পীর-পয়গম্বর নবী-রাসূল! দোহাই আল্লাহ! আমরা আমাদের দেশ জাতি ও নিজেদেরকে রক্ষা করতে যাচ্ছি। তোমাদের ওপর যে কমান্ড দেয়া হয় তোমরা সে-মতে পালন করবে। ... এসো আমরা সকলে পবিত্র কোরআন শপথ করি।

মেজর ফারুক ও অন্যান্য অফিসাররা একটা ট্যাংকের ওপর কাপড় মোড়ানো কোরআনসাদৃশ বস্তুটিতে হাত রাখে এবং চুমো খায়। আমরা তাদেরকে অনুসরণ করি....."

হাবিলদার জহুর বলেন, "মুজিব হত্যাকাণ্ডের পর আস্তে আস্তে আমাদের কাছে ফারুকচক্রের জঘন্য মিথ্যাচার ও চক্রান্তের চেহারা পরিষ্কার হয়ে যায়।

ততদিনে আমরাও মনোবল হারিয়ে ফেলেছি। মুজিব ছিলেন ফেরেশতাতুল্য নির্মল হৃদয়ের এক মহামানব। তাঁর জন্যেই আমরা পাকিস্তান থেকে জীবন নিয়ে বেঁচে এসেছি, চাকরি পেয়েছি। বড় ভুল হয়ে গেল তাঁকে হত্যা করে। দ্বিধা নেই, আমিও ঘাতকবাহিনীর একজন সদস্য। আমার আজ শান্তি নেই। ধীরে ধীরে আমি যেন অবশ হয়ে যাচ্ছি। আমি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছি।....

গ. বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড

হাবিলদার জহুরুল হকের মতে, বেঙ্গল লান্সারের লেঃ মজিদের তত্ত্বাবধানে রিসালদার মোসলেহউদ্দিন ও হাবিলদার শামসুল আলম সৈন্যদের মাঝে ৫০ হাজার করে টাকা হস্তান্তর করে, সৈন্যরা লাইন বেঁধে একে একে তা গ্রহণ করে। টাকা পেয়েই সৈন্যরা আরো উল্লসিত হয়ে পড়ে.... তাদের মধ্যে একটা সাজ সাজ রব পড়ে যায়।....

অপরদিকে লান্সার অধিনায়ক মেজর ফারুক তার সহযোগী ঘাতক অফিসারদের নিয়ে তার ইউনিট অফিসে প্রবেশ করে। তখন রাত ১-৩০ মিনিট। ফারুক তার টেবিলের ওপর একখানা ঢাকার পর্যটন মানচিত্র রাখে। অন্যান্যরা টেবিলের চারপাশে ঘিরে দাঁড়ায়। কোন কোন জায়গা প্রথমে ব্লক করতে হবে, কোথায় কোথায় অবস্থান নিতে হবে, কোথায় কোথায় অপারেশন করতে হবে সেসব স্থানে দাগ দেয় ফারুক। সেসব স্থানগুলো হলো–

(১) বঙ্গভবন
(২) রক্ষিবাহিনী হেডকোয়ার্টার
(৩) বাংলাদেশ বেতার ভবন
(৪) টেলিভিশন কেন্দ্র
(৫) পিলখানা বিডিআর হেডকোয়ার্টার
(৬) মিরপুর ব্রীজ
(৭) তেজগাঁও এয়ারপোর্ট
(৮) ঢাকা সেনানিবাস দক্ষিণ গেইট
(৯) মহাখালী রেলক্রসিং
(১০) যাত্রাবাড়ী মোড়
(১১) শেখ ফজলুল হক মনির বাসভবন

(১২) আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাসভবন

(১৩) রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবের বাসভবন

কোথায় কোথায় কতটি ট্যাংক কামান এবং কত করে সৈন্য কার কার নেতৃত্বে অবস্থান নেবে তারও ছক আঁকলো ফারুক। ৭৫ থেকে ১৫০ জনের বড় দল তিনটিকে প্রধান তিন টার্গেট শেখ মুজিব, রব সেরনিয়াবাত ও শেখ মনির দায়িত্ব দেয়া হলো।

মেজর নূর, মেজর মহিউদ্দিন ও মেজর বজলুল হুদাকে বঙ্গবন্ধু মুজিবকে, মেজর ডালিমের নেতৃত্বে আব্দুর রব সেরনিয়াবাতকে ও রিসালদার মোসলেহউদ্দিনকে শেখ মনির বাসভবন আক্রমণ ও তাদের উৎখাতের দায়িত্ব দেয়া হলো। সাধারণ সৈন্যদের উদ্দেশে তাঁদের হত্যা করা হবে না বলা হলেও ঘাতক নেতা ফারুক সকলকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়।

মেজর রশিদের দায়িত্ব ছিল মূলতঃ রাজনৈতিক। অপারেশন শুরু হওয়ার সাথে সাথে সে বিমান বাহিনীর স্কোয়ার্ডন লীডার লিয়াকতকে তার মিগগুলো নিয়ে প্রস্তুত থাকতে বলবে যাতে বাইরে থেকে সেনাবাহিনীর কোন ইউনিট ঢাকায় আসার চেষ্টা না করে। দ্বিতীয়তঃ সে খোন্দকার মোশতাককে রেডিও স্টেশনে নিয়ে আসবে, মুজিব উৎখাতের ঘোষণা দেবে এবং তৃতীয়তঃ সেনাসদরে গিয়ে সিনিয়র অফিসারদেরসহ বিমান ও নৌবাহিনী প্রধানকে রেডিও স্টেশনে এনে মোশতাককে রাষ্ট্রপতি মেনে নিয়ে নতুন সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের ব্যবস্থা করবে।

আর অপারেশনের সবচেয়ে জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জাতীয় রক্ষিবাহিনীকে ট্যাকেল করার দায়িত্ব নিল স্বয়ং মেজর ফারুক।

১৫ আগস্ট ভোর ৪-৩০ মিনিটের মধ্যেই ফারুক-রশিদ ঘাতকবাহিনী সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে গেল এবং যাত্রার জন্যে তৈরি হলো।

আর্টিলারীর ক্রুরা নতুন বিমান বন্দরের কাছে তাদের কামান নিয়ে পজিশন নিল। লান্সার গ্যারেজে লাইন ধরে দাঁড়ানো আছে ২৮টি ট্যাংক ও ১২টি ট্রাক, ৩টি জিপ এবং একটি ১০৫ মি. মি. হাউটজারসহ ৬০০ সৈন্য। এদের মধ্যে ৪০০ সৈন্য ছিল ফারুকের বেঙ্গল লান্সারের কালো পোশাকধারী।

আশ্চর্য হলেও সত্য এই যে, যে বিপুল সামরিক আয়োজন যে স্থানটিতে চলছে তার মাত্র কয়েক গজ দূরে ফিল্ড ইনটেলিজেন্সের কার্যালয়। যেখানে প্রথানুযায়ী দিন-রাত কাজ করার কথা। লান্সার ইউনিট ও এই ফিল্ড ইনটেলিজেন্স-এর মাঝখানে ছিল শুধু মাত্র তারকাটার বেড়া। ফারুক এখানে

পাহারাদার নিযুক্ত করে রেখেছিল যে এদিকে কেউ এসে খোঁজখবর নিতে এলেই যেন তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে যে, সবাই এটাকে স্বাভাবিক প্রচলিত প্রশিক্ষণ মহড়া বলে ধরে নিয়েছিল। সাধারণ্যে এ মনঃস্তাত্ত্বিক বিষয়টিকেই ঘাতকচক্র পূর্ণভাবে কাজে লাগায়।

ঠিক ভোর ৫টায় ঘাতকবাহিনী বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে যার যার গন্তব্যস্থলের দিকে যাত্রা শুরু করে। তখন পূর্বাকাশ ফর্সা হয়ে উঠছে।

হাবিলদার জহুর বলেছে, আমরা যখনই চলতে শুরু করেছি তখনই অবাক হলাম, একটা ঘূর্ণিবায়ু যেন চারদিক থেকে আমাদের উপর আছড়ে পড়ল, গাছপালা দুমড়ে-মুছড়ে উঠল, নানান পাখপাখালি ডেকে উঠল। দূর থেকে শেয়াল ও কুকুরের বিলাপধ্বনি উঠল। আর তখনি ভেসে আসছিল আযানের ধ্বনি।

ঘাতকবাহিনী বঙ্গবন্ধুভবন চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে। বাসভবনে পাহারারত লান্সার ইউনিট তাদের অফিসার ও জোয়ানদের দেখেই পথ করে দেয়। তারা পুলিশের কতিপয় সদস্যকে আটক করে। বাকি কয়েকজন অস্ত্র ফেলে পালিয়ে যায়।

বঙ্গবন্ধুর দেহরক্ষির বাসভবন ভর্তি নতুন লোক দেখামাত্র পজিশন নেয়। ঘাতকবাহিনী এসময় এলোপাথারী গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে গোটা বাসভবন ঘিরে ফেলে। তাদের ধারণা প্রতিরোধ আসছে। মূলত ঘাতকবাহিনীর সদস্যরা যে গুলি ছুঁড়ছে এটা তাদের মনেই হয়নি। একথা বলেছে হাবিলদার জহুর। তাদেরই বিক্ষিপ্ত গুলিতে প্রাণ হারায় ঘাতকবাহিনীর সদস্য হাবিলদার শামসুল আলম। তার মাথার খুলি উড়ে যায়। লান্সারের আরেক সৈন্য নায়েক মোস্তফা গুলিবিদ্ধ হয়।

অবশ্য কয়েক মিনিটের মধ্যেই বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত দেহরক্ষিদের গুলি করে ঘাতকবাহিনী এবার পুরো বাসভবনে তল্লাসী চালায়।

ওদিকে প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ শুনে ৩২ নং সড়কের প্রবেশ পথে স্থাপিত হাউটজার ক্রুরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে গুলি ছুঁড়ল। তারা ভাবল যে প্রেসিডেন্টের বাসভবন থেকে বুঝি প্রবল প্রতিরোধ আসছে। ভীতসন্ত্রস্ত ক্রুদের নিক্ষিপ্ত পর পর দুটি গোলা গিয়ে পড়ল ধানমন্ডি লেকের ভেতর। এরপর তারা কামানের নল উঁচু করে এলোপাথারী গোলা ছুঁড়তে লাগল, প্রতিটিই লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। এর একটা গোলা লক্ষ্যহীন অবস্থায় গিয়ে পড়ল তিন মাইল উত্তরে মোহাম্মদপুরে। সেখানে জেনেভা ক্যাম্পে বিহারী পল্লীতে ২ জন নিহত ও কয়েকজন আহত হলো।

এদিকে প্রচণ্ড গুলির শব্দে বঙ্গবন্ধুপুত্র শেখ কামাল আকস্মিকতার উত্তেজনায় দোতলা থেকে দৌড়ে নিচে নেমে আসে। তার ধারণা হয়েছিল বুঝি সর্বহারা পার্টি আক্রমণ চালিয়েছে, লাস্সার বাহিনী প্রতিরোধ করছে। হাবিলদার জহুর এ প্রসঙ্গে বলেছে, শেখ কামাল নির্ভয়ে সৈন্যদের মধ্যে এসে দাঁড়ায় এবং উত্তেজনায় হাঁপাতে হাঁপাতে বলে ওঠে, কারা গোলাগুলি করছে! .... মেজর বজলুল হুদা স্টেনগান দিয়ে শেখ কামালের মাথার পিছনে গুলি করে। কামাল মুখ থুবড়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়।

প্রচণ্ড গুলির আওয়াজে বঙ্গবন্ধু জেগে উঠলেন। প্রথমেই তিনি ফোন করলেন সেনাবাহিনী প্রধান শফিউল্লাহর কাছে। তাকে ফোনে পেয়েই বঙ্গবন্ধু বলেন, এ সব কী হচ্ছে শফিউল্লা! কারা এখানে গোলাগুলি করছে?

জবাবে জেনারেল শফিউল্লাহ কম্পিত কণ্ঠে বললেন, বঙ্গবন্ধু, আপনি কি কোনোভাবে বাইরে সরে পড়তে পারেন। আমি কিছু একটা করার চেষ্টা করছি।...

বঙ্গবন্ধু শফিউল্লাহকে রেখে তাঁর সামরিক সচিব ব্রিগেডিয়ার মাশহারুল হককে ফোনে সৈন্য পাঠাতে নির্দেশ দিলেন। বাইরে তখনও প্রচণ্ড গোলাগুলি চলছে। এবার তিনি ফোন করলেন রক্ষিবাহিনী প্রধানের অফিসে। রক্ষিবাহিনী প্রধান ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামান ও উপপ্রধান কর্নেল সফিউদ্দিনের অনুপস্থিতিতে তিনি আর কোনো কর্মকর্তাকে পেলেন না। শেষ ফোনটি করলেন মিলিটারী ইনটেলিজেন্স প্রধান কর্নেল জামিলকে।

কর্নেল জামিল বঙ্গবন্ধুর টেলিফোন পেয়ে স্লিপিং গাউন পরেই নিজের ব্যক্তিগত লাল ভক্সওয়াগান ড্রাইভ করে দ্রুত ছুটে এলেন। মিরপুর রোড থেকে ৩২ নং রোডে প্রবেশ মাত্রই সেনাবাহিনী তাকে থামায়। তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে দ্রুত গাড়ি ছাড়তেই সৈন্যরা তাঁকে গুলি করে। গাড়িটি হুমড়ি খেয়ে পাশের দেয়ালে আছড়ে পড়ে। কর্নেল জামিল মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

ওদিকে ঘাতকবাহিনী শেখ কামালকে গুলি করে মারার পরপরই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

মেজর নূর, মহিউদ্দিন, বজলুল হুদাসহ আততায়ীরা এক কক্ষ থেকে অপর কক্ষে ছুটোছুটি করতে থাকে।

মেজর মহিউদ্দিন দোতলার সিঁড়ির প্রথম বাঁক উঠতেই অপ্রত্যাশিতভাবে বঙ্গবন্ধুকে পেয়ে গেল। সে দেখলো, বঙ্গবন্ধু দোতলার সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পরনে চেক লুঙ্গি ও পাঞ্জাবী। বাঁ হাতের মুঠিতে চিরাচরিত সিগার পাইপ।

নির্দেশ ছিল যে, প্রেসিডেন্টকে দেখামাত্র গুলি করে হত্যা করা হবে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর মুখোমুখি হতেই মেজর মহিউদ্দিনের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। বিহ্বল বিচলিত মহিউদ্দিন গুলি না করেই আমতা আমতা কণ্ঠে বললো, স্যার!

প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বঙ্গবন্ধু মেজর মহিউদ্দিনকে কড়া ভাষায় ধমক দিলেন, কী চাও তোমরা?

স্যার! স্যার, আপনি আসুন! তেমনি বিপর্যস্তকণ্ঠে বলে মেজর মহিউদ্দিন, স্যা-র!

বঙ্গবন্ধু আবার ধমকে বললেন, তোমরা কি আমাকে হত্যা করতে চাও!

মেজর মহিউদ্দিন পুনরায় কিছু বলতেই বঙ্গবন্ধু কড়া ভাষায় বললেন, পাকবাহিনীও পারেনি, তোমরা নিজেদের কী মনে করো? বলেই তিনি দৃঢ় পদক্ষেপে সিঁড়ির দু'ধাপ নিচে নামলেন।

বিচলিত ভীরু মহিউদ্দিন থরথর করে কাঁপতে থাকে। তার হাতের স্টেনগানটি নিচে পড়ে যায়। ভ্যাবাচেকা খেয়ে মহিউদ্দিন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে, একটা ঢোক গিলে আবার বলে, ব-ঙ্গ-! তারপর বিপর্যস্ত কণ্ঠে টেনে টেনে বললো, আপনি আমাদের সঙ্গে আসুন। আপনাকে নিয়ে যেতে বলা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু ধমকের স্বরে বললেন, কে নিয়ে যেতে বলেছে, কে সে?

মহিউদ্দিন বললো, জেনারেল জিয়া, স্যার।

বঙ্গবন্ধু আরেক ধাপ নিচে নামতেই কার যেন কান্নাচিৎকার শুনতে পান, ওরা কামাল ভাইকে মেরে ফেলেছে!

বঙ্গবন্ধু চিৎকার করে উঠলেন, কোথায় কামাল!

মেজর মহিউদ্দিন দু'পা পিছিয়ে গেল। বঙ্গবন্ধু নামছেন, ঠিক তখনই মেজর নূর ছুটে এসে এক হাতে মেজর মহিউদ্দিনকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল।

বঙ্গবন্ধু তখনও দৃঢ়পায়ে নিচে নামছেন।

ঘাতকবাহিনীর আরো কতিপয় সদস্য এসময় মেজর নূরের পেছনে এসে দাঁড়ায়।

তোমরা শেখ কামালকে কেন মেরেছো। এখন আমাকেও মারবে নাকি? এ পরিকল্পনা বাদ দাও। ... তোমরাও রেহাই পবে না! বঙ্গবন্ধু গর্জে উঠলেন।

সহসা মেজর নূর গুলি চালালো বঙ্গবন্ধুর বুকে। একনাগাড়ে গুলি চালালো ট্যা-ট্যা-ট্যা... চোঁ!

বঙ্গবন্ধু ডানহাতে বুক চেপে ধরে ধনুকের মতো বেঁকে পেছনে পড়ে গেলেন। তারপর গড়াতে গড়াতে নিচে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন। রক্তের বন্যা সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলো।..... তখনো তাঁর প্রিয় সিগার পাইপটা বাঁ-হাতের মুঠিতে শক্ত করে ধরা। এরপর ঘাতকদল সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতেই বেগম মুজিব ছুটে এলেন। স্বামী শেখ মুজিবকে ওভাবে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে বিকট চিৎকার দিয়ে বঙ্গবন্ধুর দেহকে সাপটে ধরলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে রিসালদার মোসলেহউদ্দিন বেগম মুজিবের বুকে স্টেনগানের গুলি ছোঁড়ে। বেগম মুজিব বঙ্গবন্ধুকে সাপটে ধরা অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

এবার খুনী সৈন্যরা দোতলার প্রতিটি কক্ষ তল্লাসী শুরু করল। গুলির আঘাতে দরজা জানালাগুলো খান খান করে ভেঙে পড়ল।

সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট বঙ্গবন্ধুর ২য় পুত্র শেখ জামাল পরিবারের অন্যান্য সদস্য-সদস্যাদের বঙ্গবন্ধুর বেডরুমে জড়ো করে অপেক্ষা করছিল। সুলতানা কামাল, রোজী জামাল এবং বঙ্গবন্ধুর ৮ বছরের কনিষ্ঠপুত্র শেখ রাসেল একে অপরের গলা ধরে জড়োসড়ো হয়ে ছিল।

মেজর নূর ও মোসলেহউদ্দিনসহ আরো কতিপয় সৈন্য বুটের আঘাতে দরজা ভেঙে সেই কক্ষে প্রবেশ করে। মেজর নূর অতি নিকট থেকে শেখ জামালকে গুলি করে মারলো। মোসলেহউদ্দিন ও বজলুল হুদা সুলতানা-রোজীকে চুলের ঝুঁটি ধরে পৃথক করলো। রাসেল দৌড়ে গিয়ে ওয়ারড্রবের পেছনে লুকায়। বজলুল হুদা ব্রাশ ফায়ার করে দুই অন্তসত্ত্বা গৃহবধূ সুলতানা ও রোজীকে হত্যা করলো। একজন সৈন্য পাশের দরজা লাথি মেরে খুলে ফেলে। বাথরুমের ভেতর বঙ্গবন্ধু ভ্রাতা পঙ্গু শেখ নাসেরকে ঘাতক সৈন্যটি গুলি করে মারল। এরপর সৈন্যরা একে একে বাড়ির দুজন লোককে হত্যা করে। অপর কাজের ছেলে রমা ও বুড়ির মা কোনো প্রকারে প্রাণ নিয়ে ছুটে পালিয়ে জীবন বাঁচাল।

এরপর শুরু হলো অফিসারসহ সৈন্যদের লুটপাট। কাচের আলমারি ভেঙে তারা কতিপয় সোনার নৌকা ও সোনার একখানি তরবারি নিয়ে রীতিমতো নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি শুরু করলো। কেউ কেউ বালিশ তোষক জাজিম উল্টেপাল্টে খোঁজাখুঁজি শুরু করল। প্রতিটি ঘাতক সদস্যই কিছু না কিছু হস্তগত করে নিচে নামতে লাগল।

মেজর নূর তখনও শিশু রাসেলকে খুঁজছিল। সহসা তার সন্ধান পাওয়া গেল। বড় বেডরুমের আসবাবপত্র ও ওয়ারড্রবের পেছনে শিশু রাসেল ভয়ে থরথর করে কাঁপছিল। মেজর নূর এগিয়ে আসতেই সে আর্তনাদ করে ওঠে, আমাকে মেরো না! শিশু রাসেলের করুণ চাউনি আর বুকফাটা আর্তনাদ দেখে খুনী নূর হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠে।

হাবিলদার জহুর দৌড়ে এসে রাসেলকে আড়াল করে বাঁচাতে আসতেই নূর ধাক্কা মেরে তাকে সরিয়ে দিয়ে উদ্যত বেয়নেট সজোরে আমূল বসিয়ে দেয় শিশু রাসেলের ছোট্ট বুকের মাঝে। রাসেলের মরদেহ ঢলে পড়ে জামালের লাশের ওপর।

এবার ঘাতকবাহিনী নিচে নেমে এসে জড়ো হলো। লাইন ধরে দাঁড়ালো। প্রত্যেকের পরনের কাপড়ে ছোপ ছোপ রক্তের দাগ। দু'হাতে ও দু'বগলে নানান লুটপাটের মালামাল। মেজর বজলুল হুদা চিৎকার করে বলে উঠলো, সব ক'টিকে শেষ করা হয়েছে।

মেজর নূর সহসা বলে ওঠে, মেয়ে দুটি কোথায়?

মেজর মহিউদ্দিন আস্তে জবাব দেয়, ওরা বিদেশে।

শেখ হাসিনা। শেখ রেহানা। বঙ্গবন্ধুর দু'কন্যা। মাত্র কিছুদিন পূর্বে তারা ডঃ ওয়াজেদের কর্মস্থল জার্মানিতে গিয়েছে। বেঁচে গেলেন তারা নির্মম নিষ্ঠুর ঘাতকদের থাবা থেকে এই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের ভেতর দিয়ে আপনজনদের স্মৃতি সারাজীবন বুকে ধরে ধুকে ধুকে বহন করার জন্যে!

ঘাতকবাহিনী যখন বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড সমাপ্ত করল তখন ভোর ৫-৫০ মিনিট।

একইভাবে ঘাতক মেজর ডালিম ও মোসলেহউদ্দিনের নেতৃত্বে সৈন্যরা রব সেরনিয়াবাত ও শেখ মনির বাসায় আক্রমণ চালায়। রব সেরনিয়াবাত তার কতিপয় পুত্র-কন্যাসহ নিহত হলেন। অপরদিকে শেখ মনি ও তার স্ত্রী অন্তসত্ত্বা আরজু মনি ঘাতকের বুলেটে একসঙ্গে নিহত হলেন। শেখ মনির ৪ ও ৬ বছরের শিশুপুত্র পরশ ও তাপস আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে গেল।

শেখ মনির হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করেই মোসলেহউদ্দিন তার দলবল নিয়ে ছুটে গেল ৩২ নং সড়কে এবং সেখানে তারাও হত্যাকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মেজর ডালিম চলে গেল ঢাকা বেতার কেন্দ্রে।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই মেজর রশিদ তার মামা বাণিজ্যমন্ত্রী খোন্দকার মোশতাককে বাংলাদেশ বেতারে নিয়ে এলো।

সেখানে এসে হাজির হলো তথ্য প্রতিমন্ত্রী তাহেরউদ্দিন ঠাকুর ও মোশতাকের এককালীন সচিব মাহবুবুল আলম চাষী। তারা সেখানে বসে নতুন রাষ্ট্রপতি খোন্দকার মোশতাকের ভাষণ লিখতে শুরু করল, অপরদিকে মোশতাকের নির্দেশে মেজর রশিদ ছুটে গেল ঢাকা সেনানিবাসে।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে তিন বাহিনী প্রধান, সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল কে এম শফিউল্লাহ, উপপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার এডমিরাল মোশাররফ হোসেন খান, বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার কমোডোর এ কে খন্দকারসহ বিডিআরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান ও পুলিশের আইজি আব্দুর রহিম নতুন অবৈধ রাষ্ট্রপতি খোন্দকার মোশতাকের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করলেন।

এবার খোন্দকার মোশতাকের রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ ও জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবার পালা। কিন্তু ভীরু কাপুরুষ মোশতাক বেঁকে বসলেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর লাশ দেখতে চান। 'তিনি নিহত হয়েছেন' এ খবর বারবার প্রচার করা হলেও তিনি যেন আদৌ বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে বঙ্গবন্ধু নিহত হয়েছেন। তিনি নিজ চোখে দেখে নিশ্চিত হতে চান।

অগত্যা খুনী মেজর খন্দকার রশিদসহ সৈন্যরা মোশতাককে নিয়ে গেলেন বঙ্গবন্ধুভবনে। খোন্দকার মোশতাক কম্পিত হাতে বঙ্গবন্ধুর লাশ পরীক্ষা করলেন এবং থরথর পায়ে গাড়িতে উঠে বসলেন।

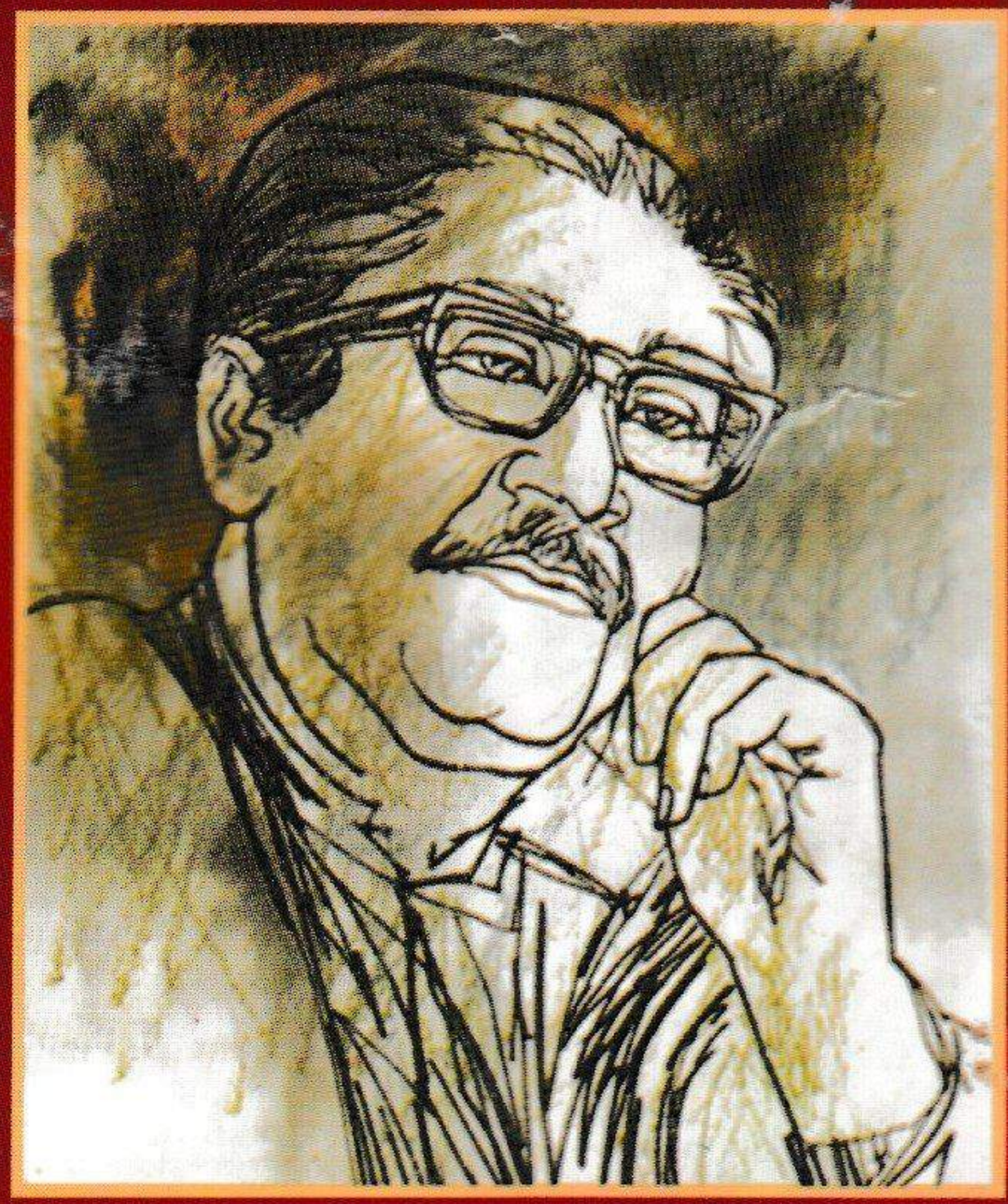
১৫ আগস্ট সকাল সোয়া ১১টায় খুনী মোশতাক স্বঘোষিত রাষ্ট্রপতি হিসেবে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। ঐদিনই তিনি বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিপরিষদ বাতিল করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করলেন।

সংসদ ও সংবিধান বহাল রাখলেন।

খোন্দকার মোশতাক ২৪ আগস্ট সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল কে এম শফিউল্লাহকে অবসর দিয়ে উপপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে নতুন প্রধান নিযুক্ত করলেন এবং ২০ আগস্ট থেকে দেশব্যাপী সামরিক আইন জারি করলেন। এক সামরিক অধ্যাদেশ বলে খোন্দকার মোশতাক ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের খুনী মেজরচক্রকে 'সূর্যসন্তান' হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি প্রদান করে তাদেরকে এ হত্যাকাণ্ড থেকে রেহাই দেয়ার উদ্দেশ্যে একটি ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করেন যা পরবর্তীতে মোশতাকের সেনাপতি ও পরবর্তী রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান কর্তৃক সাংবিধানিক আইনে পরিণত হয়।

এভাবেই দেশী-বিদেশী চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ও নৃশংসতার মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হন, পরিসমাপ্তি ঘটে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মাত্র সাড়ে তিন বছরের শাসন এবং তারপর বাংলাদেশের রাজনীতির গতি-প্রকৃতি স্বৈরতান্ত্রিক সামরিক শাসনের জগদ্দল পাথরে নিষ্পেষিত হয়েছে কীভাবে সে-বিষয় বিজ্ঞ পাঠক সমাজও ভাল করে জানেন।

—o—



মহাসমরের বিভিন্ন রণাঙ্গনে তার দুঃসাহসী ঐতিহাসিক কার্যক্রম কিংবদন্তী হয়ে রয়েছে।

স্কুলজীবন থেকেই তিনি ছড়া-কবিতাসহ লেখালেখিতে লিপ্ত হন। ১৯৭৫ সাল থেকে সাংবাদিকতা পেশার সঙ্গে তিনি জড়িত। ১৯৮২ সালে তার সম্পাদনায় বের হয় সাপ্তাহিক বঙ্গকণ্ঠ। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিনে প্রচুর কলাম লিখেছেন। বর্তমানে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের ওপর গভীর গবেষণায় লিপ্ত। তিনি একজন সৌখিন রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী। বঙ্গবন্ধুর অত্যন্ত স্নেহধন্য আবীর আহাদ বিভিন্নস্তরের ব্যক্তিত্বদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় লালিত মানুষদের ঐক্যবদ্ধকরণের প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত মুক্তিযোদ্ধা সমন্বয় পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হিসেবে নিরলস কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক এগারোটি ঐতিহাসিক গ্রন্থের সফল লেখক হিসেবে অত্র অঙ্গনের শীর্ষে অবস্থান করছেন। ১৯৯৩ সালে একুশে বইমেলায় তার রচিত 'বঙ্গবন্ধুবিরোধী মিথ্যাচার : বাংলাদেশের রাজনীতি' গ্রন্থটি বাংলা একাডেমীর জরিপে বেস্টসেলারের মর্যাদা লাভ করেছিল।

আবীর আহাদ বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ গবেষণায় বঙ্গবন্ধু পুরস্কার, রবীন্দ্র স্মারক পদক, নেতাজী পদক, মাওলানা তর্কবাগীশ স্বর্ণপদক, গ্রামীণ সাংবাদিক স্বর্ণপদক, নির্ণয় স্বর্ণপদক–ফরিদপুর প্রভৃতি লাভ করেছেন।